আয়ুর্বেদ সম্মত পদার্থ তত্ত্ব : একটি দার্শনিক সমীক্ষা

গবেষক

প্রতিমা ঢালী

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রে
পি-এইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য
প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ড. রত্না দত্ত শর্মা

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২১

Certified that the Thesis entitled

"আয়ুর্বেদ সম্মত পদার্থ তত্ত্ব : একটি দার্শনিক সমীক্ষা" submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Ratna Dutta Sharma, Professor (Retired), Department of Philosophy, Jadavpur University and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Counter signed by the

Dr. Ratna Dutta Sharma
Supervisor :
Dated :
Professor (Retired)
Department of Philosophy
Jadavpur University

Pratima Dhali
Candidate :
Dated :
Department of Philosophy
Jadavpur University

মুখবন্ধ

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্বেদ নামে পরিচিত, তা সত্ত্বেও আয়ুর্বেদে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত। এতে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত স্থল বিশেষে গৃহীত হলেও আয়ুর্বেদের নিজস্বতা উপেক্ষণীয় নয়। আমার এই প্রবন্ধটির নাম হল "আয়ুর্বেদ সম্মত পদার্থ তত্ত্ব : একটি দার্শনিক সমীক্ষা।" এম.ফিল.-এর প্রথম বর্ষে আমাদের চরক সংহিতার যুক্তিবিদ্যার কিছু অংশ পড়ানো হয় তখন থেকেই এই আয়ুর্বেদের দার্শনিক দিকগুলি জানার আগ্রহ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় বর্ষের আমি চরক সংহিতার পদার্থ তত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করি ফলে আয়ুর্বেদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রবন্ধে আমার আলোচনা কেবলমাত্র চরক সংহিতার পদার্থ তত্ত্বের মধ্যেই নয়। আয়ুর্বেদের অন্যান্য গ্রন্থ যেমন সুশ্রুত সংহিতা, আয়ুর্বেদ সংগ্রহ, অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ভেল সংহিতা এ সকল গ্রন্থে আলোচিত পদার্থ তত্ত্ব ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থের আলোচনায় মিল ও অমিল অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পদার্থ সম্পর্কিত মতবাদগুলি পাশাপাশি রেখে আয়ুর্বেদের সাথে তাদের মতের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই অংশে আয়ুর্বেদের নিজস্বতা কোথায় এবং তার হেতুও অনুসন্ধান করেছি।

"আয়ুর্বেদ সম্মত পদার্থ তত্ত্ব : একটি দার্শনিক সমীক্ষা" নামক এই প্রবন্ধটি রচনা করতে গিয়ে আমি বহু জনের কাছে নানাভাবে ঋণী কারণ তাদের সাহায্য না পেলে আমি এই প্রবন্ধটি রচনা করতে পারতাম না। সেই সকল পণ্ডিতগণ, গ্রন্থকার

প্রত্যেকের কাছে আমি চিরঋণী থাকব যাদের রচিত গ্রন্থ পাঠ করে আমি এই প্রবন্ধটি রচনা করতে সমর্থ হয়েছি।

কিন্তু এই সকল গ্রন্থ পাঠ করলেও যার সাহায্য ছাড়া আমি এই গবেষণা গ্রন্থটি রচনা করতে পারতাম না তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ড. রত্না দত্ত শর্মা। তিনি অজস্র দায়িত্ব ও কর্মে ব্যস্ত থেকেও অসীম ধৈর্যের সাথে প্রবন্ধ রচনায় আমাকে পরিচালিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি তার অত্যন্ত মূল্যবান সময় দান করেছেন আমার এই গবেষণার কাজের জন্য এবং যথেষ্ট সময় ব্যয় করে এই গবেষণার উপযোগী গ্রন্থ গুলি আমাকে পড়িয়েছেন। তিনি যত্নের সাথে আমার এই প্রবন্ধটি সংশোধন করে দিয়েছেন এবং সব সময় আমাকে কাজ শেষ করার উৎসাহ দিয়ে গেছেন তাই তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমি তার কাছে চিরঋণী।

এই প্রবন্ধটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমার বাড়িতে আমার বাবা রামপ্রসাদ ঢালী, মা কবিতা ঢালী এবং আমার বোন মৌমিতা ঢালী আমাকে এই কাজে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আমার বিয়ের পর আমার স্বামী ড: ভাস্কর সাহা বিভিন্ন ভাবে তার পক্ষে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করেছেন। তার উৎসাহ না পেলে আমার কাজটি হয়তো অসম্পূর্ণই থেকে যেত। তাই ওনাদের সকলের কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। ড: মৃত্যুঞ্জয় হালদার এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কারণ লকডাউন এর সময় যখন আমি ঘরে বন্দি সেসময় আমার শিক্ষিকার সাথে আমি

তার মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছি। তিনি দায়িত্ব নিয়ে আমার সমস্ত লেখাগুলি পৌঁছে দিয়েছেন এবং সংশোধনের পর সেগুলি আমাকে আবার এনে দিয়েছেন।

প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি আমাকে একান্ত ভাবে সাহায্য করেছে। এই গবেষণামূলক পত্রটি মুদ্রণের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন প্রবীর গুহঠাকুরতা। খুব অল্পদিনের মধ্যেই দায়িত্ব সহকারে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে প্রবন্ধটি মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত করেছেন তাই তাকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তবে এই সকল প্রয়াস সত্ত্বেও যদি প্রবন্ধ রচনা ও মুদ্রণের কোথাও কোনো প্রমাদ থাকে তবে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমার। আমি সেই কারণে ক্ষমাপ্রার্থী।

বিনীতা

(প্রতিমা ঢালী)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২
তারিখঃ

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ভূমিকা... ১-৩৪

প্রথম অধ্যায় ৩৫-৬৪
(আয়ুর্বেদ সম্মত সামান্য ও বিশেষ পদার্থ)

দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৫-১০৬
(আয়ুর্বেদশাস্ত্রে প্রতিপাদিত গুণ পদার্থ)

তৃতীয় অধ্যায় ১০৭-১৬৫
(আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রদত্ত দ্রব্য পদার্থ)

চতুর্থ অধ্যায় ১৬৬-১৮৪
(আয়ুর্বেদে স্বীকৃত কর্ম পদার্থ)

পঞ্চম অধ্যায় ১৮৫-২০০
(আয়ুর্বেদে আলোচিত সমবায় ও অভাব পদার্থ)

ষষ্ঠ অধ্যায় ২০১-২৩৭
(আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পর্যালোচিত অন্যান্য পদার্থ)

উপসংহার ২৩৮

গ্রন্থপঞ্জী... ২৩৯-২৪৫

ভূমিকা

আমি যে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছি সেটি হল—'আয়ুর্বেদ সম্মত পদার্থতত্ত্ব; একটি দার্শনিক সমীক্ষা।' এই গবেষণায় মূলত আমি আয়ুর্বেদে যে পদার্থের কথা বলা হয়েছে সেই 'পদার্থ' নিয়ে আলোচনা করব। সেক্ষেত্রে 'পদার্থ' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে, তা দর্শনে ব্যবহৃত 'পদার্থ' শব্দের অর্থের সঙ্গে সংগতি পূর্ণ কিনা, পদার্থের বিভাগ এবং বিভক্ত পদার্থ যে ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে দর্শনে উল্লিখিত পদার্থের ক্রমের ভিন্নতা এবং এই ভিন্নতার কারণ তা অনুসন্ধান করব। আয়ুর্বেদে পদার্থ সমূহের বৈশিষ্ট্য ও বিভাগ তাদের গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিশেষ দর্শনে ঐ নাম যুক্ত পদার্থ সমূহের লক্ষণ, বিভাগ যেভাবে করা হয়েছে তা পাশাপাশি আলোচনা করব। পদার্থের আলোচনা প্রসঙ্গে এটাও দেখা উদ্দেশ্য যে এই পদার্থ গুলির কি কেবল নামের মিল আছে নাকি স্বরূপেও মিল আছে। এই অলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বক্তব্যের সঙ্গে আয়ুর্বেদের বক্তব্যের মিল ও অমিল অনুসন্ধান করব। অবশ্যই আয়ুর্বেদের সঙ্গে দার্শনিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃত পদার্থ স্বরূপ বিষয়ে কোন সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে কিনা তাও অনুসন্ধানের বিষয় হবে। যদি এই বিষয়ে আয়ুর্বেদের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তবে তার হেতু অনুসন্ধানের অবকাশ থেকে যায়। আলোচনার প্রথমেই আমরা 'আয়ুর্বেদ' ও 'পদার্থ' শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করব।

আয়ুর্বেদ শব্দটি দুটি শব্দের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে। একটি হল 'আয়ু' অন্যটি হল 'বেদ'। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা এদের সংযুক্ত অবস্থাকে আয়ু বলা হয়।[১] এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আয়ুর্বেদে ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা, শরীর এদের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে যে সকল সম্প্রদায় দেহ, মন অথবা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মাকে অভিন্ন বলে মনে করেন তাদের মতের সঙ্গে আয়ুর্বেদের মতের পার্থক্য বর্তমান।

'আয়ু' শব্দ গতিশীলতা অর্থেও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ অভিপ্রায় এই যে যতক্ষণ শরীর গতিযুক্ত সেটি আয়ু। আয়ু হল জীবনকাল।[২] ধারি, জীবিত, নিত্যগ, অনুবন্ধ এই কয়টি শব্দ আয়ুর পর্যায়বাচী শব্দ।[৩]

'বেদ' শব্দটি বিদ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বিদ্ ধাতুর অর্থ হল জ্ঞান, আখ্যান, সত্ত্বা বা বিচার ইত্যাদি। কিন্তু আয়ুর্বেদের অন্তর্গত 'বেদ' শব্দটি জ্ঞান অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।[৪]

এই প্রকার যে শাস্ত্র পাঠ করলে আয়ু সম্পর্কে জ্ঞান হয় অর্থাৎ আয়ুর স্বরূপ, আয়ু হিতকর না অহিতকর এই সম্বন্ধে জ্ঞান হয় সেই শাস্ত্রকে আয়ুর্বেদ বলা হয়। আয়ুর্বেদ হল আয়ু বিষয়ক জ্ঞান।

সাধারণত আয়ুর্বেদ বলতে একটি বিশিষ্ট চিকিৎসা প্রণালীর কথা বোঝায়। কিন্তু চরকসংহিতায় 'আয়ুর্বেদ' শব্দটিকে এক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

আয়ু বিষয়ক আলোচনা বলতে ঠিক কি বোঝায়? এই প্রশ্নের উত্তরে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে—"হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্ মানঞ্চতচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্বেদঃস উচ্যতে।" অর্থাৎ যে শাস্ত্রে হিতায়ু অহিতায়ু, সুখায়ু, দুঃখায়ু এবং এই চার প্রকার আয়ুর বর্ণনা করা হয় তাকে আয়ুর্বেদ বলা হয়।[৫] এখন প্রশ্ন হল হিতায়ু, অহিতায়ু, সুখায়ু, দুঃখায়ু বলতে কি বোঝায়? এর উত্তরে বলা হয় যে মনুষ্য সকল প্রাণী মাত্রের হিতকর্তা, অপরের ধনের ইচ্ছা রাখে না, সত্যবাদী, শান্তি-প্রধান, বিচার পূর্বক কার্য করে থাকে, সাবধান পূর্বক ধর্ম, অর্থ, কামের পালন করে, পুজ্যব্যক্তির পূজা করে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, তপজ্ঞান এবং শান্তিতে সদা নিয়োজিত থাকে, যার আধ্যাত্ম বিদ্যার জ্ঞান আছে এবং সেগুলির অনুষ্ঠান করে, যা কিছু কার্য করে সেগুলি মর্তলোক ও পরলোকের কল্যানার্থে করে, এমন মানুষের আয়ু অর্থাৎ যে আয়ু জগতের হিতসাধন করে তাকে হিতায়ু বলা হয়।[৬] এর বিপরীত আয়ু অর্থাৎ যে আয়ু জগতের অহিত সাধন করে তাকে অহিতায়ু বলে।[৭] যে মানুষ শারীরিক, মানসিক, রোগ শূন্য, যে বিশেষত যুবা, যার শরীরে বলবীর্য আছে, যে পুরুষ পরাক্রমী, জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন, যার ইন্দ্রিয় নিজে নিজেই বিষয় গ্রহণে সমর্থ, যে সমস্ত প্রকার ধন সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত, ইচ্ছা অনুসারে প্রত্যেক কার্য সম্পন্ন করে থাকে তার আয়ুকে সুখায়ু বলা হয়। অর্থাৎ যে আয়ু সুখের সঙ্গে ভোগ করা যায় তাকে সুখায়ু বলা হয়। সংক্ষেপে রোগ শূন্য আয়ু হল সুখায়ু।[৮] এর বিপরীত আয়ু অর্থাৎ যে আয়ু দুঃখের সঙ্গে ভোগ করা হয় তাকে দুঃখায়ু বলে। আয়ুর্বেদে বিকার ও রোগকে যেহেতু দুঃখ বলা হয়েছে তাই রোগ যুক্ত আয়ুকে দুঃখায়ু বলা হয়।[৯]

ত্রিদন্ডের সংযোগে ত্রিদন্ডী তৈরী করলে তাতে কিছু রাখলে যেমন তার পতন রোধ করা যায় তেমনি মন, আত্মা, শরীর ত্রিদন্ডের মতো। এদের সংযোগে সকলে জীবিত থাকে। এই সংযোগের উপরে কর্মফল, বিষয় বাসনা, সুখ, দুঃখ, জ্ঞানাজ্ঞান প্রভৃতি নির্ভর করে। মন, আত্মা, শরীর সংযুক্ত অবস্থাকে পুরুষ বল হয়। এই পুরুষই চেতন। এই পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ। এই পুরুষ সুখ দুঃখের আধার। এই পুরুষের আরোগ্যের জন্যই আয়ুর্বেদ রচিত হয়েছে। এই পুরুষের সঙ্গে আমরা সংখ্যদর্শনের পুরুষের কিছু অংশে মিল লক্ষ্য করি। এই বিষয়ক আলোচনা আমরা যখন পুরুষ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সেখানে আলোচিত হবে। [“সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ....। .... বেদস্যাস্য তদর্থংহি বেদোহয়ং সম্প্রকাশিতঃ।[১০]

রোগশূন্য আয়ু সুখায়ু। কিন্তু রোগ কাকে বলে এবং রোগ কতপ্রকার ও কী কী? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আয়ুর্বেদে তিন প্রকার রোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল নিজ, আগন্তুক ও মানস।[১১] এই তিন প্রকার রোগের মধ্যে যে সকল রোগ শরীর স্থিত বায়ু, পিত্ত ও কফের সাম্যাবস্থা বিঘ্ন হওয়ার জন্য উৎপন্ন হয় তাকে নিজ রোগ বলে। আর ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও কফের জন্য যে রোগ উৎপন্ন হয় তাকে আগন্তুক রোগ বলা হয়। যে রোগ প্রিয় বস্তুর অলাভ ও অপ্রিয় বস্তুর সমাগম থেকে উৎপন্ন হয় তাকে মানস রোগ বলে। যা রজ এবং তম গুণের বিকারের দ্বারা উৎপন্ন হয়।[১২]

কাল, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ এই তিনটি ব্যাপার শরীর ও মানসিক উভয় প্রকার ব্যাধিরই হেতু। এখন প্রশ্ন হল মিথ্যাযোগ, অযোগ, অতিযোগ বলতে কি বোঝায়? উদাহরণের সাহায্যে এদের স্বরূপ বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন কালের হীনযোগ বলতে বোঝায় শীতকালে সম্যক শীত না পরা। কালের অতিযোগ বলতে বোঝায় শীতকালে অতিরিক্ত শীত পরা, গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরম পরা, কালের মিথ্যাযোগ বলতে বোঝায় শীতকালে একেবারেই শীত না পরা বা গ্রীষ্মকালে একেবারেই গরম না পরা। শরীর এবং মন এই দুটিকে কেন্দ্র করে রোগ উৎপন্ন হয়। কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থের সমযোগ হল আরোগ্যের হেতু।[১৩]

প্রশ্ন হচ্ছে আয়ুর্বেদে যে তিন প্রকার রোগের কথা বলা হয়েছে তার প্রতিকারার্থে কীরূপ চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে? তার উত্তরে বলা হয় তিন প্রকার রোগের নিরাময়ের জন্য তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসার কথাও বলা হয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে দৈবব্যাপাশ্রয়, যুক্তিব্যাপাশ্রয় ও সত্ত্বাবজায় নামে পরিচিত। মন্ত্র, ঔষধ, রত্নধারণ, মঙ্গলাচরণ, হোম, পূজা, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, নিয়ম, প্রণিপাত এবং তীর্থগমন প্রভৃতিকে দৈব্যব্যাপাশ্রয় ঔষধ বলে। যুক্তি পূর্বক ঔষধ ও পথ্যাদির প্রয়োগ করার নাম যুক্তিব্যাপাশ্রয়। অহিতকর বিষয় বস্তু থেকে মনকে নিবৃত্ত করার নামই সত্ত্বাবজায়।[১৪]

এখানে প্রশ্ন হল আয়ুর্বেদের প্রয়োজন কি? যে বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্তি হয়ে থাকে তাকে প্রয়োজন বলা হয়। অর্থাৎ যা সম্পাদনের জন্য ক্রিয়া আরম্ভ করা হয় তাকে প্রয়োজন বলা হয়। চরকসংহিতায় আয়ুর্বেদের প্রয়োজনের বিষয় নির্দিষ্ট করতে গিয়ে দুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। "প্রয়োজনং চাস্য স্বাস্থস্য স্বাস্থরক্ষণমাতুরস্য বিকারপ্রশণম্।"[১৫] আয়ুর্বেদের প্রয়োজন সুস্থ পুরুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করা আর রোগী ব্যাক্তির রোগ দূর করা। এখানে প্রথমে স্বাস্থ্য রক্ষা এবং দ্বিতীয়ত রোগ প্রশমনকেই আয়ুর্বেদের প্রয়োজন বলা হয়েছে। চরকসংহিতায় আবার বলা হয়েছে যে "ধাতুসাম্যক্রিয়া, চোক্তা তন্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনম্"[১৬] অর্থাৎ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রয়োজন ধাতুর সাম্য রক্ষা করা। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে ধাতু বলতে কি বোঝায়? তার উত্তরে বলা হয়েছে বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষ যখন বিকৃত না হয়ে সমতায় থাকে তখন তাকে ধাতু বলা হয়।[১৭]

আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য বিকৃত ধাতুকে সাম্যাবস্থায় আনা এবং ধাতুর সাম্যাবস্থা বজায় রাখা। ধাতুর সাম্যাবস্থায় সুস্থাবস্থা। সাম্যাবস্থা বলতে বোঝায় বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে একটি কম নয় আর একটি বেশিও নয় সমান সমান সুশ্রুত সংহিতায় আয়ুর্বেদের প্রয়োজন বিষয়ে বলা হয়েছে। রোগে আক্রান্ত মানুষকে রোগ থেকে মুক্তি তথা সুস্থের স্বাস্থ্য রক্ষা এই দুই আয়ুর্বেদের মুখ্য প্রয়োজন।[১৮] রোগ যাতে না হয় তার চেষ্টা করা উচিত। কারণ রোগ হলে চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ যাতে না হয় সে চেষ্টা করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে আয়ুর্বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুশ্রুতসংহিতায় দীর্ঘ জীবনের জন্য দুটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেটা হল স্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোগ প্রশমন। সুস্থ পুরুষের স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ কিভাবে হবে তার উপদেশ সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। আয়ুর্বেদে সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য বিস্তৃত উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুস্থাবস্থার যে নিয়মের কথা বলা হয়েছে সেগুলি পালন করলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ থাকা উচিত। এই প্রসঙ্গে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে নগরী নগরের রক্ষায় তথা রথী রথের রক্ষায় সদা সাবধান থাকে, তেমনি বুদ্ধিমান মানুষের উচিত নিজের রক্ষা করার মতন ক্রিয়া করা।[১৯]

শরীর যদি না থাকে অথবা শরীর যদি সুস্থ না থাকে তাহলে কোনও কার্য সম্পন্ন করা যাবে না। তাই শরীরের রক্ষার কথা বলা হয়েছে। চরকসংহিতার নিদান স্থানে বলা হয়েছে সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে শরীর রক্ষা করা উচিত। কারণ শরীর না থাকলে সকল বস্তু থাকা বা না থাকা সমান হয়ে যাবে। শরীর থাকার কারণে সকল পদার্থ উপযোগী হতে পারে। শরীর না থাকলে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্তির অবকাশ নেই। এই কারণে শরীর রক্ষা করার সর্বপ্রথম বা মুখ্য কর্তব্য।[২০] এই প্রসঙ্গে চক্রপাণী দত্ত বলেছেন 'সর্বভাব ইতি ধর্মাদি চতুর্বর্গাভাব ইত্যর্থ'[২১] উক্ত বক্তব্যর তাৎপর্য হল শরীরের অভাব হওয়ার কারণে ধর্মাদি চারটি পুরুষার্থের অভাব হবে। অর্থাৎ শরীর না থাকার কারণে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ লাভ করা সম্ভব নয়। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব।

যেকোন শাস্ত্রেরই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় আছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র হওয়ায় আয়ুর্বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল চিকিৎসা, স্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোগীর রোগ নিরাময়। কিন্তু আয়ুর্বেদে ধনৈষণা, প্রাণৈষণা এবং পরলোকৈষণার কথা বলা হয়েছে।[২২]

প্রাণ অর্থাৎ জীবন। দীর্ঘ নিরোগ জীবন লাভ করার এষণাকে প্রাণৈষণা বলা হয়। এই তিনটি এষণার মধ্যে প্রানৈষণা প্রধান। কারণ যাতে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় সেই চেষ্টা করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। কেননা প্রাণ ত্যাগেই সর্বত্যাগ হয়। প্রাণানুপালন করাই অবশ্য কর্তব্য। সুস্থ অবস্থায় স্বাস্থ্য রক্ষার দ্বারা এবং আরোগ্যের দ্বারাই প্রাণানুপালন করা হয়।

প্রাণৈষণার পর ধনৈষণার কথা বলা হয়েছে। প্রাণ রক্ষার পর ধন অন্বেষণ করা কর্তব্য। কেননা উপকরণহীন নির্ধনের দীর্ঘায়ু লাভ ব্যর্থ। চরকের মতে উপকরণহীন নির্ধন অপেক্ষা পাপী আর কেউ নেই। অতএব উপকরণ সকল অন্বেষণ অর্থাৎ ধন উপার্জন করতে বিশেষ ভাবে যত্নবান হতে হবে। যে যে উপায়ে অবলম্বন করে ধন উপার্জন হয় সেগুলি হল কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, রাজসেবা প্রভৃতি।

তৃতীয় যে এষণার কথা বলা হয় তা হল পরলোকৈষণা। পরলোকৈষণা অনুসরণ করা কর্তব্য। কিন্তু মৃত্যুর পর আবার জন্ম আছে কিনা তা নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেন। এই সংশয় প্রকাশ করার কারণ হল পরলোক প্রত্যক্ষ যোগ্য

নয় কিন্তু চরকের মতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি নাস্তিক্য বুদ্ধি পরিত্যাগ করবেন কারণ এই সংসারে প্রত্যক্ষের চেয়ে অপ্রত্যক্ষের বিষয়ই অধিক। এই সকল অপ্রত্যক্ষের বিষয় শাস্ত্র, অনুমান ও যুক্তির দ্বারা উপলব্ধ হয়।

ভারতীয় দর্শনে চারটি পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। এখন প্রশ্ন হল এই চারটি পুরুষার্থকে কিভাবে লাভ করা সম্ভব? ধর্ম বলতে মহর্ষি চরক বুঝিয়েছেন, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচার্যকে। প্রশ্ন হতে পারে কোথা থেকে জানা গেছে এই ধর্মকে? তার উত্তর হতে পারে শাস্ত্র অবিরোধী কর্তব্যকে ধর্ম বলা হয়েছে। শাস্ত্র বলতে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে? শাস্ত্র বলতে শ্রুতি এবং যা শ্রুতির অবিরুদ্ধ তাকেই বোঝানো হয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গে চরকের মতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও গুরুজনের রোগের আরোগ্য বিষয়ে যথাযোগ্য যত্ন, আয়ুর্বেদোক্ত আধ্যাত্ম বিষয়ে নিয়ত অনুধ্যান ও উপদেশ দান এই সমুদয় কার্য দ্বারা আয়ুর্বেদ থেকে ধর্ম লাভ হয়। চরকের মতে কোন রাজা বা ধনী লোকের কাছ থেকে চিকিৎসার দ্বারা যা কিছু সুখোপহার বা অর্থ প্রাপ্ত হয় এবং আশ্রিত প্রাণীগণকে চিকিৎসার দ্বারা রক্ষা করতে সমর্থ হওয়া যায় তাই আয়ুর্বেদ জনিত অর্থ লাভ। চিকিৎসার দ্বারা পণ্ডিতগণের কাছ থেকে যে সমাদর লাভ করা যায়, যশ লাভ করা যায়, লোকের শরণ্য হওয়া যায়, তাই আয়ুর্বেদ জনিত কাম লাভ। এখন প্রশ্ন হল মোক্ষ বলতে কি বোঝানো হয়েছে? চরকসংহিতাকে অনুসরণ করে মোক্ষের স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করবো।

প্রবৃত্তি হল দুঃখের কারণ এবং নিবৃত্তি হল সুখের কারণ "তস্য মূলং সর্বোপপ্লবানাং চ প্রবৃত্তিঃ, নিবৃত্তিরূপরমঃ, প্রবৃত্তি প্রবৃত্তির্দুখং, নিবৃত্তিঃ সুখমিতি।"[২৩] চরকসংহিতায় নিবৃত্তিকে মোক্ষের পর্যায়ভূক্ত করা হয়েছে। নিবৃত্তি হচ্ছে অপবর্গ এবং এটি পরমপুরুষার্থ। এই অপবর্গই হচ্ছে চরম প্রাপ্তি। এটি প্রাপ্তির কোন ক্ষয় নেই তাই একে অক্ষয় বলা হয়েছে। "নিবৃত্তিরপবর্গস্ততপরং তত্ প্রশান্তং তদক্ষরং তদ্ ব্রহ্ম স্ব মোক্ষঃ"[২৪] ন্যায় দর্শনে বাৎসায়ন ভাষ্যে এই মোক্ষবস্থাকে অভয় অজড়, অমৃত্যু পদ ব্রহ্ম প্রাপ্তি, মোক্ষ প্রাপ্তি বলা হয়েছে।

পাপরোহিত, রজগুণ রোহিত শান্ত অবস্থা হল মোক্ষের স্বরূপ। একে শ্রেষ্ঠ, অক্ষয়, অমৃত ব্রহ্ম নিদান এবং শান্তি এই সকল পর্যায় শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। "বিপাপং বিরজঃ শান্তং পরমক্ষরমব্যয়ম্। অমৃতং ব্রহ্ম নির্বাণং পর্যায়ৈঃ শান্তিরুচ্যতে।"[২৫] মোক্ষ হচ্ছে চরম ফল, একে লাভ করার জন্য যোগ সাধন করতে হয় এবং মোক্ষাবস্থায় সমস্ত বেদনার নিবৃত্তি হয়। যোগ হল মোক্ষের প্রবর্তক। যোগাবস্থায় এবং মোক্ষাবস্থায় সকল অনুভূতির নিবৃত্তি হয়ে যায়। "যোগে মোক্ষে চ সর্বাসাং বেদনানামবর্তনম্। মোক্ষে নিবৃত্তির্নিঃশেষা যোগো মোক্ষ প্রবর্তকঃ।"[২৬]

এখানে আমরা চরক সম্মত মোক্ষের বক্তব্যের ধারণার সাথে যোগ দর্শণের বক্তব্যের মিল লক্ষ্য করতে পারি। কারণ আমরা দেখি চরকসংহিতায় যোগকে মোক্ষের প্রবর্তক বলা হয়েছে। মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য যোগ দর্শনসম্মত

অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলা হয়েছে। এই অষ্টাঙ্গযোগ হল যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধ্যান ধারণা এবং সমাধি। আবার তত্ত্ব জ্ঞান লাভ মোক্ষের সহায়ক যারা বলেছেন তারাও যোগের ভূমিকা অস্বীকার করেননি। যেমন ন্যায় দর্শন। যমের মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য অপরিগ্রহের কথা বলা হয়েছে। এবং নিয়মের মধ্যে শৌচ, তপঃ, ঈশ্বরপ্রণিধান ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। তাদেরকে তত্ত্বজ্ঞানের সাধক বলা হয়েছে। আয়ুর্বেদেও মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে যম নিয়মের কথা স্বীকার করা হয়েছে। মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে মোক্ষলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি মোক্ষের উপায় জানার জন্য প্রথমে আচার্যের কাছে গমন করেন এবং আপ্তোপদেশ গ্রহণ করেন। নিয়মিত অগ্নি সেবা করেন, শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলন করেন, ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন। ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত অর্থ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান লাভ করেন। সেই জ্ঞানের দ্বারা চিত্তের সংযম হয়। ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত ক্রিয়া কর্তব্য যা আছে তা পালন করেন। সৎ পুরুষের সঙ্গ লাভ করেন। অসৎ পুরুষের সংসর্গ ত্যাগ করেন। সত্যবাক্য বলা সকল ভূতে হিতকর, যথাকালে বিবেচনা করে বাক্য বলা, সকল প্রাণীকে নিজের মত করে দেখা, ব্রহ্মচর্য পালন করা, আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্র পরিধান করা, শৌচ ক্রিয়ার জন্য জল ব্যবহার করা, দন্ড ধারণ করা, ভিক্ষার জন্য ভিক্ষা পাত্র গ্রহণ করা, জীবন ধারণের জন্য দিনে একবার ভক্ষণ করা। ধ্যানের জন্য বন্ধ যোগাসন করা, তন্দ্রা, নিদ্রা ও অলস্য প্রভৃতি কর্মের পরিত্যাগ করা, শোক, দ্বেষ, মদ, মান, লোভ, রূপ, রাগ, ঈর্ষা, ভয়, ক্রোধ

প্রভৃতি দ্বারা বিচলিত হয় না। জগত ও পুরুষের সৃষ্টি বিষয়ে সমদৃষ্টি রাখা যোগ আরম্ভের সময় মনে কোন খেদ না রাখা। এই সবই বিষয়কে মুক্তি লাভের উপায় হিসাবে চরকসংহিতায় গন্য করা হয়েছে। এছাড়াও মনের দ্বারা বাহ্য ইন্দ্রিয় গুলিকে সংযত করা, সকল বিষয়ে প্রবৃত্তিতে দুঃখবোধ এবং নিবৃত্তিতে সুখ অনুভব করা এই গুলিকেও মোক্ষ লাভের উপায় বলা হয়েছে। আর এর বিপরীত গুলিকে বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে।[২৭]

চরক সংহিতাতে পৃথক ভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম কে ত্রিবর্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা প্রবৃত্তি মার্গকে অনুসরণ করেন তারা অর্থ, কাম তাদের কাছে আকাঙ্খিত। কিন্তু অর্থ ও কামকে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রনের কথা বলা হয়েছে। আস্তিক দর্শন গুলির বক্তব্যও তাই। নিবৃত্তি মার্গ অনুসরণকারীর নিকট মোক্ষই আদরণীয়। জীব যদি স্বাস্থ্যবান না হয় রুগ্ন হয় তাহলে পুরুষার্থ প্রাপ্তি বিঘ্নিত হয়। সুস্থ মানুষই নিজের উদ্যমে পুরুষার্থ প্রাপ্ত হতে পারে। অতএব স্বাস্থ্য রক্ষায় হেতু এবং রোগ প্রশমণ হেতু আয়ুর্বেদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়।

সুশ্রুতসংহিতার সূত্রস্থানে বলা হয়েছে 'দোষধাতু মল মুলংহি শরীর' অর্থাৎ দোষ, ধাতু এবং মল শরীরের মূল কারণ আর যদি তার মধ্যে বিষমতা হয়ে যায় তাহলে বিকার উৎপন্ন হয় যখন শরীরে ধাতু বিষমতা প্রাপ্ত হয় তখন সেই শরীর ক্লেশ বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ধাতুর বৈষম্যের তাৎপর্য হল ধাতু বৃদ্ধি বা হ্রাস,

ধাতুর এই বিষমতাকে বিকার বা রোগ বলা হয়। এই রোগের হাত থেকে রক্ষা করে পুরুষকে আরোগ্য দান করাই আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য।

আমরা শারীরিক অসুস্থতার মূল কারণ অনুসন্ধান করবো। কারণ আমরা এখানে মূলত শারীরিক অসুস্থতা ও তার উপশম কীভাবে করা যায় আয়ুর্বেদ নির্দেশিত পথে সেই আলোচনাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবো। সেই ক্ষেত্রে পদার্থ তত্ত্ব জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার চেষ্টা করবো। আয়ুর্বেদে পঞ্চমহাভূতের সাম্যাবস্থা বজায় রেখে শরীর সুস্থ রাখার কথা বলা হয়েছে। কারণ আয়ুর্বেদ অনুসারে শরীর পাঞ্চভৌতিক এবং এই বিশ্বের সকল বস্তুও পাঞ্চভৌতিক। তাই শরীরের কোন মহাভূতের পরিমাণ বৃদ্ধি হলে বা কমে গেলে সাম্যাবস্থার হানি হলে সেই মহাভূতের বিপরীত গুণ সম্পন্ন দ্রব্যের দ্বারা তার হ্রাস করা হয় এবং সমগুণ সম্পন্ন দ্রব্যের দ্বারা তা বৃদ্ধি করে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়।

আয়ুর্বেদের স্বরূপও তার মূল আলোচ্য বিষয়, তার প্রয়োজন ইত্যাদি আলোচনার পর আয়ুর্বেদে পদার্থ বলতে কি বোঝানো হয়েছে সেই সব পদার্থের স্বরূপই বা কেমন সেই আলোচনায় প্রবেশ করা প্রয়োজন। পদার্থ আলোচনার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদে কী নির্দিষ্ট কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে? এই প্রশ্ন ওঠে, কারণ আমরা দেখি বাৎস্যায়ন ভাষ্যে দার্শনিক আলোচনার ক্রম নির্দেশ করা হয়েছে তা হল—উদ্দেশ্য, লক্ষণ, বিভাগ এবং পরীক্ষা। আয়ুর্বেদে পদার্থ গুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, লক্ষণ এবং বিভাগ করা হয়েছে কিন্তু এখানে পদার্থ গুলির

পরীক্ষা বা বিচার করা হয়নি। চরকসংহিতার সূত্র স্থানে ২২ নং অধ্যায়ের ৩৮ নং শ্লোক, ৪০ নং ৪১ নং শ্লোক আমরা লক্ষণ শব্দের ব্যবহার লক্ষ করতে পারি।

৩৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে—"বলং পুষ্ট্যুপলম্ভশ্চ কার্শ্যদোষ বিবর্জ্জনম্। লক্ষণং বৃংহিতে স্থৌল্যমতি চাত্যর্থবৃংহিতে। অর্থাৎ যে দ্রব্যাদি যথা মাত্রায় সেবন করলে দেহের বল পুষ্টি উৎপন্ন হয় এবং কৃশ্যা নাশ হয়।

কিন্তু যদি সেই দ্রব্য অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করা হয় তাহলে দেহ স্থুল হয়, তাকে বৃংহণ অর্থাৎ বলকারক দ্রব্য বলা হয়।

৪০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে "শ্যাবতাস্তবদ্ধগাত্রত্বমুদ্বেগো হণুসংগ্রহঃ। হৃদবর্চ্চোনিগ্রহশ্চ স্যাদতিস্তম্ভিতলক্ষণম্।" অর্থাৎ স্তম্ভনের অতিযোগের ফলে রোগীর শ্যাববণতা, স্তব্ধ গাত্রতা উদ্বেগ, হনুস্তম্ভ, হৃদয়োপরোধ এবং মলের বদ্ধতা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৪১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে—"লক্ষণঞ্চাকৃতানাং স্যাৎ ষণ্ণামেষাং সমাসতঃ। তদৌষধানাং ব্যাধীনামশমো বৃদ্ধিরেব চ।।"

অর্থাৎ রোগ প্রশমেপোয় লঙ্ঘনাদি ছয় প্রকার প্রযুক্ত হলে যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে উক্ত শ্লোকে। উল্লিখিত তিনটি শ্লোক থেকে আমরা দেখতে পাই যে লক্ষণ শব্দটি বৈশিষ্ট্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।[২৮]

আবার শরীর স্থানে মন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—“লক্ষণং মনসো জ্ঞানস্যাভাবো ভাব এব চ।”[২৯]

অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব ও ভাবই মনের লক্ষণ। এখানে লক্ষণ শব্দটিকে স্বধর্ম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব আমরা দেখছি চরকসংহিতায় লক্ষণ শব্দটিকে বৈশিষ্ট্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে আবার স্বধর্ম অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে।

দর্শনে কোন একটি পদার্থের সেরূপ বৈশিষ্ট্য যা তাকে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থ থেকে ভিন্ন করে তাকে বলা হয় তার লক্ষণ ধর্ম। অতএব দর্শনে লক্ষণ শব্দটি সে অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তার সঙ্গে আয়ুর্বেদে ব্যবহৃত লক্ষণ শব্দের অর্থের কোনও বিরোধ দৃষ্ট হয় না।

চরকসংহিতায় পদার্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে “অর্থঃ পদস্য”। অর্থাৎ পদের বিষয়কে পদার্থ বলা হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে টীকাকার চক্রপাণি দত্ত বলেছেন ‘পদস্য’ অর্থাৎ একপদ, ‘পদয়োঃ’ অর্থাৎ দুটিপদ, ‘পদানাম’ বহু পদের অর্থ হল পদার্থ। “পদার্থো নাম পদস্য পদয়োঃ পদানাম বা অর্থঃ।”[৩০] ‘পদার্থ’ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি শব্দ পাই সেগুলি হল—‘পদ’ এবং ‘অর্থ’। ‘পদ’ বলতে বোঝায় অর্থ যুক্ত একাক্ষর বা অক্ষর সমূহ। একাক্ষর ‘ড’ বলা হলে তার কোন বিষয় নেই অতএব এটিকে পদ বলা যায় না। কিন্তু যদি একাক্ষর ‘খ’ বলা হয় তাহলে তার অর্থ হল ‘আকাশ’। অতএব ‘খ’ এখানে পদ তেমনি ‘অক’, ‘কগ’

অক্ষর সমূহ উচ্চারণ করলে যেহেতু, এদের কোন বিষয় নেই অর্থাৎ এরা কোন বিশেষ বিষয়কে নির্দেশ করে না। তাই এইগুলি পদ নয়। কিন্তু যদি বলা হয় 'ঘর' তাহলে এটি কোন বাসস্থানকে বোঝায় অতএব এটি পদ।

'অর্থ' প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধকে অর্থ বলা হয়েছে।[৩১] এই প্রসঙ্গে চক্রপাণি দত্ত বলছেন—"অর্থ শব্দেণ শব্দাদয়ো আভধীয়ন্তে তে স্থুলখাদি রূপা এব জ্ঞেয়াঃ" এখানে শব্দাদিকে অর্থ বলে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে 'এব জ্ঞেয়াঃ' অর্থাৎ যা জানার যোগ্য তাহল অর্থ। সুতরাং বল যায় যে, আয়ুর্বেদের পদার্থ শব্দের সঙ্গে দর্শনে যে অর্থে পদার্থ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে তার কোন বিরোধ নেই। কারণ আমরা দেখি বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের যে লক্ষণ পাওয়া যায় তাহল 'পদস্য অর্থঃ পদার্থ'।[৩২] অর্থাৎ পদ শ্রবনের দ্বারা যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে পদার্থ। অর্থাৎ যে বস্তু পদ জন্য নির্দিষ্ট হয় তাকে পদার্থ বলা হয়। যেমন টেবিল, চেয়ার, বই, খাতা ইত্যাদি শব্দকে পদ বলা হয়। এই পদ যে বস্তুকে বোঝায় তাই হল তার অর্থ। কাজেই টেবিল, চেয়ার, বই, খাতা ইত্যাদি বস্তুই পদার্থ। যা জ্ঞেয় তাই পদার্থ। ন্যায় মতে বস্তু মাত্রই কোন দিন না কোন দিন কোন পুরুষের জ্ঞানের বিষয় অন্ততঃ ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ পদার্থ হলেই তাতে জ্ঞেয়ত্ব অবশ্যই থাকবে। পদার্থ বলতে পদনির্দিষ্ট অর্থ যা কোনও শাস্ত্রের বিশেষ আলোচ্য বিষয় তাকেও বোঝায়। আয়ুর্বেদে যে সমস্ত পদার্থের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে তাদের মধ্যে সামান্য, বিশেষ, গুণ, দ্রব্য, কর্ম, সমবায় অন্তর্ভুক্ত।

এখন প্রশ্ন হল ‘তত্ত্ব’ কাকে বলে? উত্তরে বলা হয় ‘স্বরূপ’ অর্থে ‘তত্ত্ব’ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে আমি মূলত আয়ুর্বেদের পদার্থ স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করব।

আমরা পূর্বেই যে প্রশ্নের উত্থাপন করেছি যে পদার্থের স্বরূপজ্ঞানের সঙ্গে আয়ুর্বেদের সম্পর্ক কী? অর্থাৎ আয়ুর্বেদে মূল প্রয়োজনের সঙ্গে এই পদার্থ সমূহের তত্ত্ব জ্ঞান কীরূপে সম্বন্ধ যুক্ত আমরা এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করবো। পদার্থ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান যে কেবল শাস্ত্রপাঠ করলেই হবে তা নয়, তত্ত্ব আলোচনাও আবশ্যক। মহর্ষি চরক চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসকের আয়ুর্বেদ বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহন করার কথা বলেছেন। তত্ত্ব আলোচনায় অংশগ্রহন করার জন্য পদার্থের জ্ঞান প্রয়োজন। আবার বলা হয়—আয়ুর্বেদের লক্ষ্য হল ধাতু সাম্য বজায় রাখা। এই ধাতু সাম্যের কারণে পদার্থের জ্ঞান কেবল উপযোগীই নয়, অত্যাবশ্যক। কেননা বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধাতু বা দোষকে বিশেষ গুণ, কর্ম, দ্রব্যের দ্বারা সাম্যাবস্থায় আনা হয় এবং ক্ষীণ ধাতুকে সামান্য দ্রব্য, সামান্য গুণ এবং সামান্য কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি করে সাম্যাবস্থায় আনা। দ্রব্যে গুণ এবং কর্ম, সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং ধাতুর সাম্য হেতু দ্রব্য প্রয়োগ সামান্য বা বিশেষের জ্ঞানকে বিশেষ ভাবে অপেক্ষা করে। আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সমস্ত পদার্থের জ্ঞান প্রয়োজন। অতএব আয়ুর্বেদের সাথে পদার্থতত্ত্বের প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদকের সম্বন্ধ বর্তমান।

এই পদার্থ মূলত ছয় প্রকার। যে ক্রমে এই পদার্থগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হল—সামান্য, বিশেষ, গুণ, দ্রব্য, কর্ম, সমবায়। আমরা জানি বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত পদার্থ গুলিও এই নাম যুক্ত। এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে বৈশেষিক দর্শনে যে ক্রমে পদার্থ গুলির উল্লেখ করা হয়েছে তার থেকে পদার্থের এই ক্রম কিন্তু পৃথক। কারণ বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের যে ক্রমের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহল দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ সমবায়।[৩৩]

প্রশ্ন থেকে যায় চরকসংহিতায় এই রূপে পদার্থ গুলির নির্দিষ্ট ক্রমে উল্লেখের কী কোনও বিশেষ কারণ আছে। প্রথমে দেখা যাক বৈশেষিক দর্শনে যে ক্রমে পদার্থ গুলির উল্লেখ আছে তার কোন বিশেষ কারণ আছে কিনা। জন্য পদার্থ মাত্রই দ্রব্যে উৎপন্ন হয়ে দ্রব্যে স্থিত হয় বলে জন্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতির কারণ দ্রব্য। জন্য দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের আশ্রয় দ্রব্য। এই জন্য প্রথমে দ্রব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কর্ম কেবল সংযোগ ও বিভাগ রূপ গুণের কারণ হলেও অন্য গুণের কারণ নয়। অথচ কর্ম মাত্রের প্রতি অদৃষ্ট, প্রযত্ন প্রভৃতি গুণ কারণ হয়ে থাকে। গুণ কর্মের কারণ বলে দ্রব্যের পর গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর দ্রব্য ও গুণ কর্মের কারণ বলে দ্রব্য ও গুণের পর কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। দ্রব্য, গুণ, কর্মে সামান্য আশ্রিত বলে দ্রব্য, গুণ, কর্মের পর সামান্যের উল্লেখ করা হয়েছে। সামান্য হল অনেকে অনুগত। অতএব অনেকের সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করার পরে অননুগত বা

বিশেষ ধর্মের কথা উল্লেখ প্রয়োজন। এই জন্য সামান্যের পর বিশেষের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ হল ব্যাবর্তক। এরপর সমবায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এই জন্য যে উক্ত পাঁচটি পদার্থের প্রত্যেকটি সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী বা প্রতিযোগী।

চরকসংহিতায় মূল পাঁচটি পদার্থের বিস্তৃত আলোচনা সূত্রস্থানে করা হয়েছে, সেখানে প্রথমে সামান্য, বিশেষ, গুণ, দ্রব্য, কর্ম, সমবায় ঐ ক্রমানুসারে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৪] এখন আমরা দেখব আয়ুর্বেদে যে ক্রমে দ্রব্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ কি? আয়ুর্বেদ একটি চিকিৎসা শাস্ত্র তাই এর উদ্দেশ্য বিকৃত ধাতুকে সাম্যাবস্থায় আনা এবং ধাতু সাম্যাবস্থা বজায় রাখা। ধাতু সাম্যাবস্থা সুস্থাবস্থা। পিত্ত, বায়ু, কফের বিকৃতি সমস্ত শারীরিক অসুস্থতার মূল। এই সাম্যাবস্থা রক্ষা করাই স্বাস্থ্য রক্ষা। সাম্যাবস্থা কিভাবে বিঘ্ন হয় সেটা আমরা এইভাবে ভাবতে পারি, ধরা যাক বায়ু, পিত্ত, কফ এদের তিনটির মধ্যে একটি বেড়ে গেল বা একটি কমে গেল তাহলে সাম্যাবস্থার হানি হবে। এই সাম্যাবস্থাকে আমরা কিভাবে আবার ফিরিয়ে আনতে পারব? যার হ্রাসের কারণে সাম্যাবস্থার হানি হয়েছে সেটাকে বৃদ্ধি করে বা যার বৃদ্ধি হয়েছে তাকে হ্রাস করে। এই হ্রাস বা বৃদ্ধি কিভাবে হয়? সমগুণ সম্পন্ন দ্রব্যাদি যোগে দ্রব্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেমন আকাশ, বায়ু জাত দ্রব্য দ্বারা বায়ু বৃদ্ধি হয়। আগ্নেয় দ্রব্যে পিত্ত বৃদ্ধি হয় এবং পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়। অতএব কোন দ্রব্যের ক্রিয়া কিরূপ তার জ্ঞান না থাকলে অসুস্থতায় কার গ্রহণ সুস্থতার জন্য প্রয়োজন তা নির্ণয় সম্ভব নয়। বলা

হয় আগ্নেয় দ্রব্যের বিরোধী গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়া হচ্ছে পিত্ত হ্রাস করা। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন গুণ ও ক্রিয়া বিশেষ কোন দ্রব্যের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত তার জ্ঞান অপেক্ষিত। কোন দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সঙ্গে সমানতা বিশিষ্ট তা জানার জন্য সামান্য নামক পদার্থ অপরিহার্য। এরপর ভেদ বুদ্ধির হেতু রূপে বিশেষ নামক পদার্থের জ্ঞান অপরিহার্য। এই কারণে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সামান্য, উল্লেখ পূর্বে করে তারপর বিশেষ এর উল্লেখ করা হয়েছে। সামান্য বিশেষের পর দ্রব্যের কথা না বলে গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ আয়ুর্বেদে দ্রব্যের থেকে তার গুণগুলি নিয়েই বিশেষ ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হয়েছে বলে গুণের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ দ্রব্যের স্বরূপ এক্ষেত্রে তার গুণ ও কর্মের দ্বারা নিরূপিত হয়। গুণের গুরুত্ব স্বীকার করে গুণের উল্লেখ এর পরেই দ্রব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে কর্ম যেহেতু দ্রব্যকে আশ্রয় করেই থাকে। গুণ, দ্রব্য, কর্মের উল্লেখের পর সমবায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। বৈশেষিক শাস্ত্রে স্বীকৃত পদার্থ গুলির সঙ্গে চরক উল্লিখিত পদার্থ গুলির স্বরূপের দিক দিয়ে মিল ও অমিল আছে কিনা তা আলোচনা সাপেক্ষ। এই পদার্থ গুলি চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল প্রয়োজন স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ ও রোগের বিনাশের জন্য প্রয়োজন এমন কী রোগের কারণানুসন্ধানের জন্যও বিশেষভাবে প্রয়োজন। এদের স্বরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্র পাঠ ছাড়াও চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসকের আলাপ আলোচনাকে আয়ুর্বেদে আলোচিত বিষয়ের জ্ঞান লাভের পক্ষে অপরিহার্য বলে স্বীকার করা

হয়েছে। এই আলোচনার বা বিচারে অংশগ্রহন করার জন্য কত গুলি পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানকে অপরিহার্য বলা হয়েছে। সেই আলাপ আলোচনার বা বিচারের স্বরূপ ও তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয় গুলির আলোচনাও চিকিৎসা শাস্ত্রে করা হয়েছে। সে গুলি হল—বাদ, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিস্থাপনা, হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয়, নিগমন উত্তর, সিদ্ধান্ত, শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য, ঔপম্য, সংশয়, প্রয়োজন, সব্যাভিচার, জিজ্ঞাসা, ব্যবসায়, অর্থাপত্তি, সম্ভব, অনুযোজ্য, অননুযোজ্য, অনুযোগ, প্রত্যনুযোগ, বাক্যদোষ, বাক্য প্রশংসা, ছল, অহেতু, অতীতকাল, উপালম্ভ, পরিহার, প্রতিজ্ঞাহানি, অভ্যনুজ্ঞা, হেত্বন্তর, অর্থান্তর ও নিগ্রহস্থান। এই পদার্থ গুলির আলোচনা করে দেখতে হবে এই অংশে কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের আলোচনার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে। এই পদার্থ গুলির আলোচনা ও সামান্য বিশেষ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা কী আয়ুর্বেদের পক্ষে একইভাবে প্রয়োজন? এই সমস্ত বিষয় গুলির আলোচনা পূর্বক আমাদের দেখতে হবে, আয়ুর্বেদের মূল উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এই পদার্থ গুলোর স্বরূপ আলোচনার সঙ্গে এই পদার্থ গুলির স্বরূপ আলোচনা কীরূপে সম্পর্ক যুক্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিনা। এই সম্পূর্ণ আলোচনাকে নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলিতে ভাগ করা হয়েছে আলোচনার সুবিধার্থে।

প্রথম অধ্যায়ে সামান্য ও বিশেষ পদার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে সামান্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। 'সামান্যম সর্ব্ববৃদ্ধিকারণম্' এই অর্থে সামান্যের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে,

সমতা বা সমান ধর্ম বিশিষ্টতা হচ্ছে বৃদ্ধির কারণ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম যতক্ষণ স্থিতি থাকে ততক্ষণ তাদের বৃদ্ধি সামান্যের দ্বারাই হয়ে থাকে। অর্থাৎ যখন শরীরে কোন বিশেষ ধাতু কম থাকে তখন সমদ্রব্য, সমগুণ, সমকর্মের প্রয়োগ করে তার বৃদ্ধি ঘটানো হয়। অর্থাৎ সর্বকালে সকল ভাব পদার্থের বৃদ্ধির কারণ রূপে সামান্যকে স্বীকার করা হয়েছে। যেমন স্নিগ্ধ বস্তু সেবন করলে মেদশক্তি বৃদ্ধি পায়। কারণ স্নিগ্ধ বস্তুর সঙ্গে মেদশক্তির গুণগত সমানতা রয়েছে।

এছাড়াও সামান্যের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৈশিষ্ট্যর কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল 'একত্বকরম্' এবং 'তুল্যার্থতাহি সামান্যম্' এই অধ্যায়ে সামান্যের এই যে তিনটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এটাও দেখা হয়েছে যে এই তিনটি লক্ষণ আদৌও তিনটি পৃথক লক্ষণ কিনা। সামান্যের লক্ষণ আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখি যে সামান্যের তিনটি লক্ষণই পৃথক পৃথক লক্ষণ, কিন্তু তার মানে এটা নয় যে একটা লক্ষণের মধ্যে কোন দোষ থাকার জন্য দ্বিতীয় লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কারণ লক্ষণের দোষ গুণ বিচারের আলোচনা আমরা চরকসংহিতায় পাই না।

সামান্যের লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেই লক্ষণের আলোচনাও পাশাপাশি করা হয়েছে এবং দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে আয়ুর্বেদে সামান্যের যে তিনটি লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তার

মধ্যে কোন লক্ষণটি দর্শনসম্মত সামান্যের লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যদি পার্থক্য থেকে থাকে সেই পার্থক্যর হেতু কী? তাও আলোচনা করা হবে। এরপর সামান্যের বিভাগের আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখি ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের যে তিনটি বিভাগে স্বীকার করা হয়েছে অর্থাৎ পর, অপর এবং পরাপর এই তিনটির কোন বিভাগই আয়ুর্বেদে স্বীকার করা হয়নি। এবং চক্রপাণি দত্ত সামান্যের অন্য তিনপ্রকার ভেদের কথা স্বীকার করেছেন। সে গুলি হল দ্রব্য সামান্য, গুণ সামান্য, ও কর্ম সামান্য। সামান্যের এই বিভাগের আলোচনাও বিস্তারিত ভাবে করা হয়েছে। সামান্যের এই বিভাগ ছাড়াও আয়ুর্বেদে সামান্যের অন্যান্য যেসকল বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে তার আলোচনাও করা হয়েছে।

সামান্যের আলোচনার পর এই অধ্যায়ের অপর অংশে সামান্যের বিপরীত পদার্থ বিশেষের আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষের লক্ষণ প্রসঙ্গে চরকসংহিতায় সূত্র স্থানে বলা হয়েছে “হ্রাসহেতু বিশেষশ্চন প্রবৃত্তিরুভয়স্যতু” অর্থাৎ যে ভাবপদার্থ হ্রাসের কারণ তাই হল বিশেষ। যদি কোন ব্যক্তির শরীরে কোন ধাতুর বৃদ্ধি হয় এবং তার কারণে কোন দোষ উৎপন্ন হয় তাহলে ঐ ধাতু হ্রাসের কারণ যে পদার্থ তার পক্ষে উপযোগী সেই পদার্থকে বিশেষ বলা হয়।

বিশেষেরও অপর আরও দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল ‘পৃথকত্বকৃত’ এবং ‘বিশেষস্তুবিপর্যয়’। ‘পৃথকত্ব’ শব্দের অর্থ হল এক পদার্থের থেকে অন্য পদার্থের এক দ্রব্যের থেকে অন্য দ্রব্যের ভেদ, এই ভেদের কারণকে

বিশেষ বলা হয়। যেমন—ঘট ও পট দুটি শব্দ একই সময় উচ্চারণ করলে তা ভিন্ন হওয়ার কারণে পৃথক বুদ্ধি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। উক্ত লক্ষণের সাথে ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের মিল লক্ষ্য করা যায়। কারণ দর্শনে বিশেষকে পৃথকত্বের হেতু রূপে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের মত আয়ুর্বেদে বিশেষকে নিত্য বা অন্ত বিশেষ বলা হয়নি। অতএব এ বিষয়ে দর্শনের সাথে আয়ুর্বেদের মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই মতপার্থক্য ও তার হেতু বিষয়ে আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। তৃতীয় যে লক্ষণের কথা স্বীকার করা হয়েছে তা হচ্ছে যা বৈধর্মের কারণ তাই বিশেষ। এই লক্ষণ বিষয়ে আলোচনাও এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। বিশেষের আলোচনার পর বিশেষের বিভাগ আলোচনার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এবং বিশেষের যে তিনটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে আয়ুর্বেদে তাদের উপযোগিতা অনুসন্ধান করাও প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গুণ। চরকসংহিতায় সামান্য ও বিশেষের পর গুণের আলোচনা করা হয়েছে। চরকসংহিতায় পদার্থ গুলির নামের উল্লেখের সঙ্গে ন্যায় বৈশেষিক পদার্থের উল্লিখিত পদার্থক্রমের পার্থক্য দেখা যায়। চরকসংহিতার সামান্য বিশেষের পর দ্রব্যের কথা না বলে গুণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আবার গুণের লক্ষণ করতে দিয়ে গুণ যে দ্রব্যাশ্রিত তা স্বীকার করা হয়েছে। আগে আশ্রয়ের উল্লেখ না করে আশ্রিত গুণের কথা বলা হয়েছে। দর্শনশাস্ত্রে দ্রব্যের কথা আগে বলাটাই যুক্তি যুক্ত কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দ্রব্যের থেকে তার

গুণগুলি নিয়েই বিশেষ ব্যবহার ও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। গুণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের আগে গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই গুরুত্বের হেতু কী তাও আলোচনা করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে আয়ুর্বেদসম্মত গুণের লক্ষণ, বিভাগ আলোচনা পূর্বক দর্শন শাস্ত্রে প্রদত্ত গুণের লক্ষণ ও বিভাগের সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। গুণের বিভাগ প্রসঙ্গে চরকসংহিতায় ৪১টি গুণের কথা বলা হয়েছে। সকল গুণের স্বীকারের কারণ, গুণের গুরুত্ব, ৪১টি গুণের কার্য প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে ২৪ প্রকার গুণের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ন্যায় বৈশেষিক স্বীকৃত ২৪ প্রকার গুণের মধ্যে আয়ুর্বেদে সম্মত ৪১ প্রকার গুণের সন্নিবেশ আদৌ সম্ভব কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে সেই গুণ গুলির পৃথক আলোচনা কেন আয়ুর্বেদে প্রয়োজন এই প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। আয়ুর্বেদে কেন ৪১ প্রকার গুণের পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে গুণগুলির গুরুত্ব নিরূপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আয়ুর্বেদ সম্মত দ্রব্য পদার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে দ্রব্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাহল “যত্রাশ্রিতাঃ কর্ম্মাগুণাঃ কারণং সমবায়ি যৎ তদ দ্রব্যম্” অর্থাৎ যা গুণ আর কর্মের আশ্রয় এবং সমবায়ি কারণ তাই হল দ্রব্য। সুশ্রুতসংহিতায় দ্রব্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাহল—“দ্রব্য

লক্ষণং তু ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণম্” আয়ুর্বেদে দ্রব্যের এই লক্ষণগুলি সঙ্গে ন্যায় বৈশেষিক সম্মত দ্রব্যের লক্ষণের মিল লক্ষ্য করা যায়। কারণ বৈশেষিক সূত্রে দ্রব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়ি কারণমিতি দ্রব্য লক্ষণম্।”[৩৫] অর্থাৎ বৈশেষিক মতেও কার্যের সমবায়িকারণ এবং গুণ ও কর্মের আশ্রয় ভূত পদার্থকে দ্রব্য বলা হয়েছে। এই লক্ষণটি ছাড়া বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যের আরো একটি লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সেটি হল যাতে দ্রব্যত্ব জাতি থাকে তাই দ্রব্য। আয়ুর্বেদে দ্রব্যের এই দ্বিতীয় লক্ষণ কেন মানা হয়নি তার কারণও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। দ্রব্যের আলোচনার পর দ্রব্যের বিভাগ বিষয়ক আলোচিত হয়েছে। আয়ুর্বেদ সম্মত দ্রব্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি কারণদ্রব্য অন্যটি কার্য দ্রব্য। কারণ দ্রব্য আবার নয়টি ভাগে বিভক্ত। যথা আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, আত্মা, মন, কাল, দিক। দ্রব্যের বিভাগের ক্ষেত্রে বৈশেষিক দর্শনেও এই দ্রব্য গুলির উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু তাদের উল্লেখের ক্রম পৃথক। যে ক্রমে দ্রব্য গুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হল পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল দিক, আত্মা, মন। এই বিভাগের আলোচনা প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদে কেন আকাশাদি দ্রব্যের দ্বারা দ্রব্যের ক্রম শুরু হল তা অনুধাবন করা হয়েছে। অর্থাৎ আয়ুর্বেদে আকাশে প্রাধান্য কেন স্বীকার করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয়োপনিষদের সঙ্গে আয়ুর্বেদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই অধ্যায়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আয়ুর্বেদে কার্যদ্রব্য বলতে কি বোঝায়? চেতন দ্রব্য এবং অচেতন

দ্রব্য বলতে কি বোঝায় এবং এই দ্রব্য গুলির শ্রেণীবিভাগ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত দ্রব্যকে কেন চেতন বলা হয়েছে, চেতন শব্দের অর্থই বা কি সঙ্গত ভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়ে কোনও ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গে আয়ুর্বেদের মতে মিল ও অমিল আছে কিনা তাও আলোচনা করা হয়েছে। কারণ দ্রব্য, কার্য দ্রব্য ছাড়াও আয়ুর্বেদে প্রভাব ভেদে, উৎপত্তি স্থান ভেদে দ্রব্যের আরও বিভাগ স্বীকৃত করা হয়েছে। সেগুলির আলোচনাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রত্যকটা দ্রব্যের স্বরূপ এবং আয়ুর্বেদে তাদের গুরুত্ব কী এই প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। উৎপত্তি স্থান ভেদ এবং প্রভাব গত দ্রব্যের ভেদ আয়ুর্বেদের পক্ষে কেন প্রয়োজন এই প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই উত্থাপিত হয়েছে। দ্রব্যের এই প্রকারভেদ কী আয়ুর্বেদের নিজস্ব প্রয়োজনে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ অধ্যায়ে আয়ুর্বেদসম্মত কর্মের আলোচনা করা হয়েছে এই প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদ কর্মের যে সকল লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তার আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে কর্মের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয় যা দ্রব্যাশ্রিত গুণরহিত সংযোগ তথা বিভাগের অনপেক্ষ কারণ তাই কর্ম। কর্মের এই লক্ষণের সাথে ন্যায় বৈশেষিক সম্মত কর্মের লক্ষণের মিল লক্ষ্য করা যায়। কারণ বৈশেষিক সূত্রে কর্মের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাহল "একদ্রব্যম্গুণং সংযোগ বিভাগেষ্বণপেক্ষ কারণমিতি কর্মলক্ষণম্"। চরকসংহিতায় কর্মের যে লক্ষণ দেওয়া

হয়েছে জল্পকল্পতরু টীকায় সেই লক্ষণের প্রত্যকটি পদের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত। এই লক্ষণটি ছাড়াও চরকসংহিতায় কর্মের আরো যে সকল লক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেই সকল লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া কর্মের পযার্য়বাচি যে সকল শব্দ আছে অর্থাৎ চেষ্টা, প্রযত্ন, ক্রিয়া, প্রবৃত্তি সেই গুলি কর্মের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কীত তার আলোচনাও এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। কর্মের বিভিন্ন লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেই সকল লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কী এবং তাদের মধ্যে কোন বিরোধ আছে কিনা তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে প্রদত্ত কর্মের লক্ষণ কী আয়ুর্দের বিশেষ স্বরূপ দ্বারা নির্ধারিত এই প্রশ্নের উত্তরও এই অধ্যায়ে অনুধাবন করা হবে।

কর্মের লক্ষণের আলোচনার অনন্তর কর্মের বিভাগও আলোচিত। বৈশেষিক দর্শনে পাঁচ প্রকার কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে সে গুলি হল—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। আয়ুর্বেদেও এই পাঁচ প্রকার ভেদ যথা সম্ভব উল্লেখ করে স্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোগ নিরূপনের হেতু বিভিন্ন কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। শারীরিক, মানসিক এবং বাচিক ভেদে কর্মের প্রকারভেদের কথা চরকসংহিতায় সূত্র স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে শাস্ত্রের উপযোগী পঞ্চকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। সে গুলি হল—বমন, বিরেচণ, আস্থাপন, অনুবাসন, শিরোবিরেচন এই পঞ্চকর্মের সবিস্তার আলোচনা এই অধ্যায়ের অন্তর্গত। এছাড়াও শুভ, অশুভ ভেদে কর্মের ভেদও স্বীকার করা হয়েছে। চরকসংহিতায় তিনপ্রকার

লৌকিক কর্মের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই লৌকিক কর্মের প্রত্যকটি কিভাবে আয়ুর্বেদের প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত তার আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। আয়ুর্বেদে আধ্যাত্মিক কর্মের কথাও বলা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে মূলত সমবায় এবং অভাব নামক পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদে সমবায়ের লক্ষণ এবং বৈশেষিক দর্শনে সমবায়ের লক্ষণ পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা সমবায়ের লক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করি বৈশেষিক দর্শনসম্মত সমবায়ের লক্ষণ এবং আয়ুর্বেদসম্মত সমবায়ের লক্ষণের তেমন কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ সমবায় বিষয়ে দর্শনে যা বলা হয়েছে আয়ুর্বেদেও তা স্বীকার করা হয়েছে। চরকসংহিতায় সমবায়ের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাহল "সমবায়ো অপৃথগভাবো ভূম্যাদীনাং গুনৈস্মতঃ স নিত্যে যত্র হি দ্রব্যং ণ তত্রানিয়তো গুণঃ"। বৈশেষিক দশর্নে বলা হয় অযুতসিদ্ধ পদার্থ গুলি যারা আধার আধেয় ভাবে রয়েছে তাদের পরস্পরের যে সম্বন্ধ তাকেই সমবায় বলা হয়েছে। অতএব আমরা দেখছি বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত সমবায় পদার্থের সঙ্গে আয়ুর্বেদ স্বীকৃত সমবায় পদার্থের সাম্য লক্ষ্য করা যায়।

আয়ুর্বেদ সম্মত সমবায়ের লক্ষণে যে 'অপৃথকভাব' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ নির্ণয়ও করা হয়েছে। লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখি চরকের টীকাকার চক্রপাণি দত্ত সমবায় পদার্থকে নিত্য ও অবিনাশী বলেছেন। ঠিক

একই বিষয় আমরা ন্যায় বৈশেষিক দর্শনেও লক্ষ্য করি। অতএব বলা যায় সমবায়ের যে লক্ষণ তা ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে প্রদত্ত সমবায় লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই অধ্যায়ে আয়ুর্বেদে সমবায় পদার্থের পৃথক স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর এই অধ্যায়েরই দ্বিতীয় অংশে অভাব নামক পদার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ পদার্থরূপে অভাবের সরাসরি উল্লেখ না থাকার কারণে প্রশ্ন উঠতে পারে আয়ুর্বেদে কী অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করা হয়নি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে চরক সংহিতায় জগতের সকল বস্তুকে সৎ এবং অসৎ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তার থেকে বোঝা যায় চরকসংহিতায় অভাব পদার্থ অস্বীকৃত হয়নি। ন্যায় ভাষ্যেও বস্তুর তত্ত্ব কি এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে সৎ ও অসৎ ভেদে জাগতিক সকল বস্তুকে ভাগ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আয়ুর্বেদে অভাব পদার্থের গুরুত্ব অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে ন্যায় বৈশেষিক সম্মত অভাব পদার্থের লক্ষণ ও বিভাগের আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে চরকসংহিতায় বিমান স্থানে সামান্যাদি অতিরিক্ত যে সকল পদার্থের কথা আলোচনা করা হয়েছে সেই সকল পদার্থ আলোচিত হয়েছে

পদার্থ বলতে যদি আমরা পদনির্দিষ্ট অর্থকে বুঝি তাহলে এরা সবাই

পদার্থ, আবার আলোচ্য বিষয় অর্থেও এরা পদার্থ শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট। এই দুই অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নেই কারণ পদনির্দিষ্ট অর্থ যা শাস্ত্রের বিশেষ প্রতিপাদ্য তা পদার্থ রূপে গণ্য হতে কোন অসুবিধা নেই তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রথম অর্থে পদার্থ শব্দটি ব্যবহৃত হলে তার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলেও এই সমস্ত বিষয়ই পদার্থের অন্তর্ভূক্ত হয়। এই পদার্থ গুলি হল— বাদ, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিস্থাপনা, হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয়, নিগমন, উত্তর, সিদ্ধান্ত, শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য, ঔপম্য, সংশয়, প্রয়োজন, সব্যাভিচার, জিজ্ঞাসা, ব্যবসায়, অর্থাপত্তি, সম্ভব, অনুযোজ্য, অননুযোজ্য, অনুযোগ, প্রত্যানুযোগ, বাক্যদোষ, বাক্য প্রশংসা, ছল, হেতু, অতীতকাল, উপালম্ভ, পরিহার, প্রতিজ্ঞাহানি অভ্যনুজ্ঞা, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিগ্রহস্থান। এই সকলের মধ্যে কিছু পদার্থ আছে সেগুলি ন্যায় দর্শন স্বীকৃত এবং কিছু পদার্থ আছে যা বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত। সামান্যাদি অতিরিক্ত অন্যান্য পদার্থ গুলির আলোচনা প্রসঙ্গে ন্যায় দর্শনে উল্লিখিত বিচারের আনুষঙ্গিক পদার্থ গুলির মিল আছে আবার অমিলও দৃষ্টি এড়াবার মত নয়। অতএব এই মিল বা অমিল আলোচনাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ন্যায় দর্শনের এই বিষয় গুলির আলোচনা আন্বীক্ষীকির অন্তর্গত। ন্যায় দর্শনে এই বিষয় গুলির আলোচনা অধিক সুশৃংখল ও বিস্তৃত ভাবে করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় সামান্যাদি পদার্থের আলোচনা এদের সকলের আলোচনা এবং বিচার ও বিচারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পদার্থ গুলির স্বরূপ আলোচনা কী আয়ুর্বেদের পক্ষে সমান গুরুত্বপূর্ণ? আলোচ্য গবেষণাপত্রে সেই প্রশ্নের উত্তরও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* পণ্ডিত তাঁরা দত্ত পাণ্ডে জয়কৃষ্ণ দাস, হরিদাস গ্রুপ, চৌখাম্বা সংস্কৃত পুস্তকালয়, বারাণসী সিটি, ১৯৩৭, পৃ. ৮।

২. মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* প্রথম ভাগ, ডঃ লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, চৌখাম্বা, কৃষ্ণদাস একদেমী, বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ২৪।

৩. "শরীরেন্দ্রিয়সংযোগ্যে ধারি জীবিতম্। নিত্যগশ্চানুবন্ধশ্চ পর্য্যায়েবায়ুরুচ্যতে।" তদেব।

৪. *পদার্থ বিজ্ঞানম্,* বি. কে. দ্বিবেদী, চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস একাডেমি, বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ২।

৫. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* টীকা ভাষ্য সহ, প্রথম খণ্ড বঙ্গানুবাদ কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০১০, পৃ. ৫।

৬. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* হিন্দি অনুবাদ, ব্যাখ্যাকার কাশীনাথ পাণ্ডে এবং গোরখনাথ চতুর্বেদী, সম্পাদক রাজেশ্বর দত্ত শাস্ত্রী, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ১৯৬১, পৃ. ১৩।

৭. তদেব।

৮. তদেব।

৯. তদেব।

১০. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ বজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, সম্পাদিত কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ৬।

১১. "ত্রয়োরোগা ইতি নিজাগন্তুমানাসাঃ" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* টীকা ভাষ্য সহ, প্রথম খণ্ড বঙ্গানুবাদ কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০১০, পৃ. ৯০।

১২. তদেব।

১৩. "শরীরং সত্ত্ব সংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়োমতঃ। তথা সুথানাং যোগস্তু সুখানাং কারণংসমঃ।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, সম্পাদিত, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ২০০৩, প্রথম খণ্ড পৃ. ৮।

১৪. তদেব, পৃ. ১১৪।

১৫. মহষি চরক, *চরকসংহিতা,* ইংরাজী অনুবাদ, প্রথম খণ্ড আর. কে. শর্মা, ভগবান দাস, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০২০, পৃ. ৬০০।

১৬. তদেব, পৃ. ৩৯।

১৭. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* টীকা, ভাষ্যসহ, প্রথম খণ্ড বঙ্গানুবাদ কবি যশোদানন্দন সরকার, সম্পাদিত বৈদ্যাচার্য কালিকিঙ্কর সেনশর্মা, আয়ুর্বেদাচার্য, সত্যশেখর ভট্টাচার্য, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র স্ট্রীট, প্রথম খণ্ড ২য় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৭১।

১৮. "ইহ খল্বায়ুর্বেদঃ - প্রয়োজনাং ব্যাধ্যুপসৃষ্টানাং ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বাস্থস্যরক্ষণা"। মহর্ষি সুশ্রুত, সুশ্রুতসংহিতা, অনুবাদ অত্রিদেব, মতিলাল বারাণসী দাস, বেনারস, ২০১৫, পৃ. ৪।

১৯. "নগরী নগরস্যেব স্থস্যের রথি যথা স্বশরীরস্য মেধাবী কৃত্যেস্ববহিতোভবেত।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী প্রদত্ত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা সহ এবং গঙ্গাধর প্রণীত জল্পকল্পতরুটীকা সহ হিন্দি অনুবাদ ডঃ লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস একাদেমী বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ১৫২।

২০. "সর্বমন্যতপরিত্যজ্য শিরিরমনু পাল্যেত্। তদভাবে হি ভাবানাং সর্বভাবঃ শরীরিণামিতি", মহর্ষি চরক, চরকসংহিতা, আচার্য শ্রী জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, মতিলাল বানারসী দাস, পূর্বভাগ, ২০১৮, পৃ. ৩০১।

২১. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* আয়ুর্বেদ দীপিকা ও জল্পকল্পতরু টীকা সহ, দ্বিতীয় ভাগ, লক্ষ্মীধর দ্বিদেবী, চৌখাম্বা, কৃষ্ণদাস একাদেমী, বারাণসী, ২০১৭, পৃ. ৭২৭।

২২. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* প্রথম ভাগ, লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, চৌখাম্বা, কৃষ্ণদাস একাদেমি, বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ২৪০।

২৩. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, মতিলাল বানারসী দাস, বারাণসী, ২০১৮, পূর্বভাগ, পৃ. ৪৩৭।

২৪. তদেব, পৃ. ৪৩৮।

২৫. তদেব, পৃ. ৪৪০।

২৬. তদেব, পৃ. ৪০৬।

২৭. তদেব, পৃ ৪৩৫।

২৮. *চরকসংহিতা,* সম্পাদক এবং ব্যাখ্যাকার ডঃ লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, সহ ব্যাখ্যাকার ডঃ বি. কে. দ্বিবেদী এবং ডঃ পি কে গোস্বামী, প্রথম ভাগ, সূত্রস্থান, চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস অকাদেমী, বারাণসী-২২২০০১, ২০১৩, পৃ. ৪১৯

২৯. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, সম্পাদিত, খণ্ড-২, কলিকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ১৯১

৩০. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকা সহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও সংশোধিত বারাণসী চৌখাম্বা অরিয়েন্টালিয়া ১৯৯১, প্রথম খণ্ড পৃ. ৩৮১৫।

৩১. অথাঃ শব্দাদয়ো জ্ঞেয়াগোচরঃ বিষয়া গুণাঃ চ/শ ১/৩১।

৩২. শ্রীমদন্নং ভট্ট বিরচিত *তর্কসংগ্রহঃ,* শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, পৃ. ৭৪।

৩৩. প্রশস্ত পাদভাষ্যম্, ভাষ্যনুবাদ বিবৃত্তি ন্যায়কন্দলী তদনুবাদ সাহিত্য, প্রথমভাগ অনুবাদকারক দণ্ডিস্বামী দামোদয়াশ্রম সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩য় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ১১২।

৩৪. "সামান্যঞ্চ বিশেষঞ্চ গুণান্ দ্রব্যাণিকর্মচ, সমবায়ঞ্চ ..." মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ সম্পাদিত, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯১৯, পৃ. ৮।

৩৫. "দ্রব্যং গুণকর্মালি" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* টীকা ভাষ্য সহ, প্রথম খণ্ড বঙ্গানুবাদ কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার, সম্পাদিত বৈদ্যাচার্য কালিকিঙ্কর সেন শর্মা, আয়ুর্বেদাচার্য, সত্য শেখর ভট্টাচার্য, দীপায়ন, ২০ সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ২১৫।

প্রথম অধ্যায়

আয়ুর্বেদ সম্মত সামান্য ও বিশেষ পদার্থ

সামান্য পদার্থ:

সামান্য পদার্থের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পূর্বক আয়ুর্বেদে তার স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। সামান্যের বৈশেষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "সর্বদা সর্বভাবানাং, সামানাং বৃদ্ধি কারণম্।"[১] উক্ত বক্তব্যে 'সর্বদা' শব্দের তাৎপর্য হল সকল কাল। 'সর্ব' শব্দটি সম্পূর্ণতা সূচক। সকল বা সমস্ত অর্থে 'সর্ব' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে এবং 'ভাব' শব্দের অর্থ যা অনুভব করা যায়। এই বক্তব্যে 'বৃদ্ধি' শব্দের তাৎপর্য হল আধিক্য বা অধিকতা। অতএব এই বক্তব্যটির তাৎপর্য হল যে সকল সময়, সকল অবস্থায়, সকল দ্রব্য গুণ ও কর্মের যে সমানতা সেটাই তার বৃদ্ধির কারণ এবং সেটাই হল সামান্য। সামান্য একত্বভাব উৎপন্ন করে। এই সামান্য সমতা বৃদ্ধি কারক দ্রব্যাদির সমানতাকে সূচিত করে। যেমন—মাংস সেবনের ফলে মাংসের বৃদ্ধি হয়। কারণ উভয় মাংসের মধ্যে সমানতা আছে। আচার্য চরকের মতে সকল সময় সকল ভাব পদার্থের বৃদ্ধির কারণকে সামান্য বলা হয়েছে। ভাব বলতে বোঝায় যা সত্তাবান অর্থাৎ সত্তাবান পদার্থের সকল সময় বৃদ্ধির কারণকে সামান্য বলা হয়। আবার চরকসংহিতার সূত্রস্থানে মহর্ষি চরক বলেছেন যে একত্ব বৃদ্ধির কারণ যা তাই সামান্য।[২] তার পরিপ্রেক্ষিতে আচার্য চক্রপাণি দত্ত বলেছেন ভিন্ন ভিন্ন দেশ এবং সময়ে অনেক গবাদি ব্যক্তিতে এটি গরু, এটা গরু এই প্রকার একত্ব বুদ্ধির

উৎপত্তির হেতুকে সামান্য বলা হয়। এখন প্রশ্ন হল একত্ব বুদ্ধি বলতে কি বোঝায়? এর উত্তরে চক্রপাণি দত্ত বলেছেন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে অভিন্ন, সামান্য তথা একরূপতা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভ্রমরহিত একত্ব বুদ্ধির উৎপত্তি হয় না। যেমন—দুজন ব্যক্তিকে আমরা পাচক বলি বা দুটি বস্তুকে সাদা বলি। এই প্রকার বিভিন্ন বস্তু বা বিভিন্ন ব্যক্তির যে বুদ্ধি সেটা ঐ বস্তুর গুণ বা কর্মের সামান্য অথবা সমানতার কারণে উৎপন্ন হয়। যদিও এই রকম নয় যে দুজন পাচক বা দুটি সাদা বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এই দুটি বস্তুর গুণ বা দুটি ব্যক্তির কর্মের সমানতা আছে। এই প্রকার গুণ এবং কর্মের সমানতার দ্বারা তারা সমানতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।[৩]

আয়ুর্বেদে সামান্য সম্পর্কে এই মতটির সাথে ন্যায় বৈশেষিক স্বীকৃত সামান্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা হল—যা অনুগত প্রতীতি বা একাকার প্রতীতির কারণ তাই হল সামান্য। এই সামান্য দ্রব্য, গুণ এবং কর্মে থাকে। অনেক ধর্মীতে এক ধর্ম প্রকারক একাকার প্রতীতিকেই অনুগত প্রতীতি বলে। এই অনুগত প্রতীতি অনুগত বিষয় ছাড়া সম্ভব নয়। দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম এরা পরস্পর বিলক্ষণ হওয়ায় অনুগত প্রতীতির কারণ হয় না। তাই দ্রব্যাদিত্রয়ের সত্তা নামক অনুগত ধর্মের স্বীকার করা হয়। যদিও সামান্যাদিতে সৎ সৎ প্রতীতি হয়ে থাকে তাহলেও সামান্যাদি গত অনুভব সমবায় সম্বন্ধে সামান্যাদিতে না থাকায় জাতি রূপে গণ্য হয় না। কিন্তু

দ্রব্যাদি পদার্থ ত্রয়ের সত্তা সমবায় সম্বন্ধে থাকায় জাতি রূপে গণ্য হয়। অনেক ঘট ব্যক্তিতে একটি ঘট, এটি ঘট, এটিও ঘট এইভাবে অনুগত প্রত্যয় অর্থাৎ একাকার জ্ঞানের যে কারণ তা হল সামান্য। বিভিন্নাকার ব্যক্তিতে একটি অনুগত ধর্ম স্বীকার না করলে অনুগত বা একাকার প্রতীতি হতে পারে না। বিভিন্নাকার ঘট ব্যক্তি সমূহে অনুগত ঘটত্বাদি সামান্যকে স্বীকার করতে হয়। অনুগত ব্যবহারের জন্য অনুগত প্রতীতি আবশ্যক। যেহেতু ব্যবহারের প্রতি জ্ঞান কারণ। অনুগত প্রতীতি বা জ্ঞান না হলে অনুগত ব্যবহার হয় না। আবার অনুগত বিষয় না হলে অনুগত প্রতীতি হয় না সুতরাং অনুগত ব্যবহারের সাধক যে অনুগত প্রতীতি সেই অনুগত প্রতীতির বিষয় রূপে যে অনুগত ধর্মকে স্বীকার করতে হয় সেই অনুগত ধর্মই সামান্য।[৪]

মহর্ষি চরক সামান্যকে 'তুল্য' অর্থের দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ যখন দুটি বিষয়ে সাদৃশ্য জ্ঞান হয় তখন তাকে সামান্য বলা হয়। সামান্যের তাৎপর্য "সমানাং ভাবাং সামান্যম্"। অর্থাৎ যখন একই ভাব অনেক দ্রব্য অথবা পদার্থে পাওয়া যায়, সেই এক রূপতা বা সমভাবতাকে সামান্য বলা হয়। সমান ভাবের দ্বারা সমান ভাবের বৃদ্ধি হয়। যেমন একজন বিদ্যার্থীর উপস্থিতিতে অন্য আর একজন বিদ্যার্থী উপস্থিত হলে বিদ্যার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি বিদ্যার্থীর স্থানে কোন নর্ত্তক সেখানে উপস্থিত হয়, নর্ত্তক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হবে না। যদি বিদ্যা অধ্যয়ন কর্মরত অন্য বিদ্যার্থী আসে তখনই বিদ্যার্থীর বৃদ্ধি হয়। কারণ নর্ত্তকের কর্ম ভিন্ন। অতএব ভিন্ন কর্মযুক্ত নর্ত্তকের আসায় বিদ্যার্থীর বৃদ্ধি হবে

না। সামান্যকে একত্বকারী বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে একই গুণ বা কর্ম যখন অনেক দ্রব্যে পাওয়া যায় তাহলে ঐ সমান গুণ, কর্মাদি যুক্ত দ্রব্যের বুদ্ধি একত্বের স্থাপনা করে। যেমন—আম অম্ল, ডালিম অম্ল এবং আমলকিও অম্ল তাহলে এদের একত্ব স্থাপন করে বলা হয় যে এই দ্রব্য অম্ল বর্গের। এর তাৎপর্য এই যে অম্ল বর্গের যত দ্রব্য আছে তাদের স্বরূপাদির মধ্যে ভিন্নতা হলেও অম্লতা সকলের মধ্যে বিদ্যমান। এই প্রকার যখন এক, দুই, তিন অথবা অধিক দ্রব্য পৃথিবী মহাভূতের লক্ষণ প্রাপ্ত হয় ঐ সমস্ত দ্রব্যে একত্ব স্থাপিত করে বলা হয় যে এগুলি পৃথিবী দ্রব্য। লবণ, অম্ল বা কটু এই তিনটি মহাভূতে অগ্নি মহাভূত পাওয়া যায়, তাই এই তিনটি রসে একত্ব স্থাপন করে বলা হয় যে এরা আগ্নেয় রস।

বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। “নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম্।”[৫] অর্থাৎ নিত্যত্বের সমানধিকারণ অনেক সমবেতত্ব ধর্মই সামান্যের লক্ষণ। ‘নিত্যত্বে সতি’ এই শব্দের দ্বারা সংযোগাদিতে সামান্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারিত হয়। কারণ সংযোগাদি সম্বন্ধ সংযুক্ত দ্রব্যে থাকে, সংযোগে অনেকে সমবেতত্ব থাকে। কিন্তু তাতে নিত্যত্ব না থাকায় নিত্যত্ব সমানাধিকরণ অনেক সমবেতত্ব সংযোগাদিতে থাকে না। উক্ত লক্ষণে অনেক শব্দের অনেক পদ ব্যবহারের দ্বারা সামান্যের লক্ষণ থেকে আকাশাদির অতিব্যাপ্তি বারিত হয়। কারণ আকাশত্ব নিত্য এবং আকাশ সমবেত, তাই আকাশে নিত্যত্ব সমানাধিকরণ সমবেতত্ব আছে কিন্তু আকাশের পরিমাণ এক হওয়ায় তাতে এক সমবেতত্ব আছে। অনেক

সমবেতত্ব নেই। তাই আকাশে সামান্যের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য ‘অনেক’ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব নিত্যত্বেসতি অনেক সমবেতত্ব এটি সামান্যের লক্ষণ। সামান্যের আশ্রয় দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম এই তিনটি পদার্থই হয়ে থাকে। অন্য পদার্থে সামান্যের আশ্রয় হয় না। বিশেষ, সমবায় আর অভাব এই পদার্থে সামান্য থাকে না। সামান্যেও সামান্য থাকে না। বৃক্ষত্ব এবং ঘটত্ব সামান্য তাই তাতে অন্য সামান্যও থাকে না। কারণ যদি সামান্যে সামান্য স্বীকার করা হয় তাহলে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। অতএব বলা যায় সামান্য দ্রব্য, গুণ এবং কর্মে আশ্রিত হয় সমবায় সম্বন্ধে।

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে ‘নিত্যত্বেসতি অনেকসমবেতত্বম্ সামান্য।’ সামান্যর এই যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে যার অর্থ যা নিজে নিত্য হয়ে অনেকের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাকে সামান্য বলা হয়।[৬] এই লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ করলে কতগুলি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। সেগুলি হল—সামান্য হল অনেকানুগত পদার্থ। অনেকানুগত বলতে বোঝায় যা এক হয়েও অনেকের মধ্যে একই সময়ে বিদ্যমান। যেমন—একই মনুষ্যত্ব একই সময়ে সব মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। সামান্যের এই যে অনেকের মধ্যে থাকা বা অনেক বৃত্তিত্ব তা সমবায় সম্বন্ধে হয়ে থাকে। সমবায় সম্বন্ধ বলতে বোঝায় এমন সম্বন্ধ যা যে দুটি পদার্থের সম্বন্ধ তারা পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। যেমন মনুষ্যত্ব সমবায় সম্বন্ধে বিভিন্ন মানুষে থাকে। ঘটত্ব সমবায় সম্বন্ধে সকল ঘটে থাকে। সামান্য পদার্থটি নিত্য অর্থাৎ এর উৎপত্তি নেই

বিনাশও নেই, বিশেষ বিশেষ মানুষের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের উৎপত্তিও নেই বিনাশও নেই কারণ বিশেষ কোন মানুষের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষের মনুষ্যত্বের উৎপত্তি হয় না। আবার বিশেষ কোন মানুষের বিনাশেও মনুষ্যত্বের বিনাশ হয় না। ন্যায় বৈশেষিকগণ বলেন যে যদি সব মানুষ বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলেও মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হয় না। অবশ্য সেই অবস্থায় মনুষ্যত্বের প্রকাশ হবে না। কেননা ব্যক্তির মধ্যেই জাতির প্রকাশ। যে জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে সেই জাতি অপ্রকাশিত অবস্থায় কালকে আশ্রয় করে থাকে। কাল জগতের আধার অতএব যে জাতির আশ্রয় ব্যক্তি নেই তার আশ্রয় কাল হতে সমস্যা নেই। আবার ঐ জাতীয় কোন ব্যক্তি উৎপন্ন হলে তার মধ্যে ঐ জাতিই প্রকাশ পায়। ব্যক্তি থাকুক বা না থাকুক জাতি সত্ত্বার কোন হানি হয় না। জাতি সত্ত্বা ব্যক্তি নিরপেক্ষ। কিন্তু জাতি ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। একটি মানুষ মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট হয়েই উৎপন্ন হয় এবং যতকাল থাকে মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট হয়েই থাকে।

ন্যায় বৈশেষিক সামান্য শব্দটিকে জাতি অর্থে প্রয়োগ করলেও সামান্য এবং জাতির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। জাতি হলে তা সামান্য হবে। কিন্তু সামান্য হলেও তা জাতি হবে এমন নয়, ন্যায় বৈশেষিক মতে সমান ধর্ম রূপে পদার্থটি যখন নিত্য হয় এবং বিভিন্ন ধর্মীদের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে থাকে কেবল তখনই তাকে জাতি বলা যাবে। কাজেই জাতি হতে গেলে সমান ধর্মকে নিত্য হতে হবে। ধর্মীতে সমবায় সম্বন্ধে থাকতে হবে। যেমন মনুষ্যত্ব সামান্যকে জাতি বলা যাবে

কেননা, মনুষ্যত্ব পদটি নিত্য এবং তা সকল মানুষে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু ঘটাভাব, পটাভাব ইত্যাদি রূপে অভাব বললেও এবং সেইসব বিভিন্ন অভাবে সমান ধর্মরূপে যে অভাবত্ব তাকে সামান্য বললেও জাতি বলা যাবে না। কেননা সমান ধর্মরূপে অভাবত্ব পদটি বিভিন্ন অভাবে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না।

জাতিরূপ সামান্য হল এক এবং অনেকানুগত ধর্ম। কিন্তু এমন অনেক ধর্ম আছে যাদের আপাত দৃষ্টিতে জাতি বলে মনে হলেও আসলে তারা জাতি নয়। যে যে কারণে কোনও সামান্য ধর্ম জাতি বলে পরিগণিত হতে পারে না তাদের জাতিবাধক বলা হয়। উদয়ানাচার্য তাঁর 'দ্রব্য কিরণাবলী' গ্রন্থে ৬টি জাতি বাধকের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—ব্যক্তিঅভেদ, তুল্যত্ব, সঙ্কর, অনবস্থা, রূপহানি এবং অসম্বন্ধ।

আচার্য চরক সামান্যের যে দ্বিতীয় লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন সেটি হল—"সামান্যমেকত্বকরম্" এই লক্ষণের ব্যবহার আয়ুর্বেদে কেবলমাত্র চিকিৎসার্থে নয় অন্য প্রয়োজনও সাধন করে। চিকিৎসায় ধাতুসাম্য ধাতুর বৃদ্ধি বা ক্ষয়ের দ্বারা করা হয় অর্থাৎ প্রথম লক্ষণটি বৃদ্ধির কারণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় লক্ষণের দ্বারা আয়ুর্বেদের বিষয়বস্তু অর্থাৎ দ্রব্যাদির বর্গীকরণের হেতু করা হয়েছে। দ্রব্যাদির বর্গীকরণ দ্রব্য, গুণ এবং কর্মের দ্বারা করা হয়। দ্রব্যের বর্গীকরণ আয়ুর্বেদে সামান্যের একত্ব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা করা হয়। যেমন,—সমস্ত জন্তুর আধারে মাংস বর্গীকরণ, আবার অনেক প্রাণীর দুগ্ধের দ্বারা দুগ্ধবর্গ, অন্নের

দ্বারা অন্নবর্গ, শাকের দ্বারা শাকবর্গ ইত্যাদি দ্রব্য একত্বকারী সামান্যের উদাহরণ। এই প্রকার সমান্য কর্মযুক্ত বিভিন্ন দ্রব্যের একত্ব এক কর্মের দ্বারা করা হয়েছে। গুণ সামান্যাদি রসের দ্বারা মধুরাদি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার দ্রব্যাধার অর্থাৎ আত্মা, ইন্দ্রিয় এদের দ্বারা জড় ও চেতনের বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ চরকসংহিতায় বলা হয় যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত তাই চেতন, এবং যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত নয় তা অচেতন বা জড়। এইভাবে আচার্য চরক সামান্যকে একত্বকারী বলে বর্ণনা করেছেন। এইরকম ব্যবহারের দ্বারা মহর্ষি চরকের অভিপ্রায় স্পষ্ট হয় যে তিনি একত্ব স্থাপনের মাধ্যমে দ্রব্য, গুণ এবং কর্মের বর্গীকরণ করেছেন।

'তুল্যর্থতাহি সামান্য' সামান্যের এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা আয়ুর্বেদের কর্ম পুরুষবাদ, ত্রিদোষবাদ ইত্যাদি স্থাপনা করা হয়েছে। চরকসংহিতার শরীরস্থানে পুরুষ বিষয় অধ্যায়ে 'তুল্যর্থতাহি' সামান্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আয়ুর্বেদে ত্রিদোষবাদও এই লক্ষণের দ্বারা করা হয়েছে। যেমন—এই সৃষ্টির ধারণ সূর্য, চন্দ্র এবং বায়ু নিজ আদান বিসর্গ এবং বিক্ষেপ ক্রিয়ার দ্বারা করে থাকে তেমনিই শরীরে বাত, পিত্ত এবং কফ নিজ বিক্ষেপ, আদান এবং বিসর্গ কর্মের দ্বারা শরীর ধারণ করে থাকে।

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের দুটি প্রকার-ভেদের কথা স্বীকার করা হয়েছে। সেগুলি হল পর এবং অপর। কোন কোন দার্শনিক আবার পরাপর সামান্যের কথাও মেনেছেন। যে জাতি তার আশ্রয় ব্যাক্তি সমূহের কেবলমাত্র অনুবৃত্তি প্রত্যয় উৎপন্ন করে তাকে পর সামান্য বলে। যেমন সত্তা। সত্তা থাকে দ্রব্য,

গুণ এবং কর্মে। এই পদার্থ গুলি পরস্পর ভিন্ন হলেও সত্তা জাতি থাকাতে আমাদের সকল দ্রব্য, গুণ, কর্মে সৎ সৎ বলে অনুগত প্রতীতি হয়। কাজেই সত্তা কেবল অনুবৃত্তি জ্ঞানের জনক হয়, ব্যাবৃত্তি বুদ্ধির জনক হয় না। আবার অন্যভাবে বলা যায় যে জাতি অন্য কোন জাতির ব্যাপ্য নয় সকল জাতির ব্যাপক তাকে পর জাতি বলে। যে জাতি তার আশ্রয় ব্যক্তি সমূহের অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি এই উভয় বুদ্ধির জনক হয় তাকে অপরা জাতি বলে। যেমন—ঘটত্ব। ঘটত্ব জাতি সকল ঘটে অনুবৃত্তি জ্ঞানের জনক হয় আবার বিজাতীয় পট ইত্যাদি পদার্থ থেকে তাদের ব্যাবৃত্তিও উৎপন্ন করে। অন্যভাবে বলা যায় যে জাতি সকল জাতির ব্যাপ্য তা হল অপর জাতি। যে জাতি কোন জাতির ব্যাপক আবার অপর কোন জাতির ব্যাপ্য তা হল পরাপর জাতি যেমন—দ্রব্যত্ব। দ্রব্যত্ব সত্তাজাতির ব্যাপ্য ও পৃথিবী জাতির ব্যাপক।[৭]

আয়ুর্বেদে সামান্যের তিনটি প্রকার ভেদের কথা স্বীকার করা হয়েছে। সেগুলি হল দ্রব্য সামান্য, গুণ সামান্য এবং কর্ম সামান্য।[৮]

দ্রব্য সামান্যঃ

যখন সমান দ্রব্যের দ্বারা সমান দ্রব্যের বৃদ্ধি হয় তখন তাকে দ্রব্য সামান্য বলা হয়। যেমন—মাংস খেলে মাংসের বৃদ্ধি হয়। কারণ ছাগলের মাংসতে যে মাংসত্ব পাওয়া যায় মানুষের মাংসতেও তা পাওয়া যায়। তাই মাংস খেলে মাংসের বৃদ্ধি হয়। এই কারণে বলা হয় মাংস ভোজন করে, এমন জন্তুর মাংস খেলে বিশেষ

রূপে মাংসের বৃদ্ধি হয়। আবার যদি জীবের অধিক রক্তক্ষরণ হয় তাহলে রক্তদানের মাধ্যমেই সেই জীবের শরীরে রক্তের বৃদ্ধি ঘটানো হয়।[৯]

গুণ সামান্য:

যখন কোন সমগুণ যুক্ত দ্রব্যের দ্বারা অথবা সমগুণের দ্বারা গুণের বৃদ্ধি ঘটানো হয় তখন ঐ গুণের সাদৃশ্য জন্য বা দুটি গুণের একত্বের জন্য গুণ বৃদ্ধি হয় তাকে গুণ সামান্য বলা হয়। যেমন—দুধ বা ঘি সেবন করলে শুক্রের বৃদ্ধি হয়। গুণ একত্ব-করণ লক্ষণের দ্বারা গুণ সামান্যের কথা বলা হয়েছে। দুধ এবং ঘি উভয়ই মধুর, শীত বা স্নিগ্ধ গুণ যুক্ত। শুক্রও মধুর, শীত বা স্নিগ্ধ গুণ যুক্ত অতএব দুধ বা ঘি সেবনের ফলে দুটি গুণের সমানতা হওয়ায় শরীরে শুক্র বা শীতের বৃদ্ধি ঘটায়। এই প্রকার অন্য যে সকল দ্রব্য মধুর শীত বা স্নিগ্ধ গুণ যুক্ত সকলেই গুণ সামান্যের আধারে বৃদ্ধি কারক হয়ে থাকে। একইভাবে যে দ্রব্য লঘু, রুক্ষ, বিষাদ, খরাদি গুণ যুক্ত হয় তার দ্বারা বাতের বৃদ্ধি হয় এবং যে দ্রব্য উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, সর আদি গুণ যুক্ত তাতে পিত্তের বৃদ্ধি হয়। যে দ্রব্য গুরু, স্নিগ্ধ, শীত, সান্দ্র্য, পিচ্ছিল আদি গুণ যুক্ত তার দ্বারা কফের বৃদ্ধি হয়।[১০]

কর্ম সামান্য:

তদ্-তদ্ দোষের স্বরূপের অনুরূপ সামান্য কর্ম হওয়ার ফলে যা সামান্য লক্ষণ প্রাপ্ত হয় তাকে কর্ম সামান্য বলে। আয়ুর্বেদে কর্ম সামান্যে "তুল্যর্থতা হি সামান্যম্" এই লক্ষণ স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ সমান দ্রব্যে দ্রব্যের কর্মের সাদৃশ্য ক্রিয়া কারিত্ব

যুক্ত কর্মের দ্বারা যে সামান্য লক্ষণের উৎপত্তি হয় তাকে কর্ম সামান্য বলা হয়। যেমন—সুখ পূর্বক বিশ্রাম করলে কফের বৃদ্ধি হয়। কফ দোষের সমান না হলেও বিশ্রামের দ্বারা সুখ পূর্বক অন্নপানাদির সেবন কফের ক্রিয়াকারিত্ব লক্ষণের অনুরূপ হওয়ার ফলে কফ দোষের বৃদ্ধি হয়।[১১] বায়ুর কর্ম চলন তাই দৌড়লে বায়ুর বৃদ্ধি হয়। কফের কার্য স্থিরতা উৎপন্ন করা। এই কারণে শুয়ে থাকলে বা বসে থাকলে কফের বৃদ্ধি হয়।[১২]

কিছু কিছু আচার্য আবার উভয়বৃত্তি এবং একবৃত্তি এই প্রকার সামন্যের বিভাগের কথা স্বীকার করেছে।[১৩]

একবৃত্তি সামান্য:

যাতে পোষক সামান্যতা আছে তাকে একবৃত্তি সামান্য বলা হয়। যেমন—ঘি সেবনে অগ্নি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ঘি ও অগ্নিতে কিছুই সমানতা দেখা যায় না। প্রভাব বসত ঘি অগ্নির বৃদ্ধি করে। বৃদ্ধি কারক হওয়ায় একে সামান্যের অন্তর্গত করা হয়েছে। ঘি এ স্থিত ঘিত্বই অগ্নি বৃদ্ধির কারণ অথচ অগ্নির অগ্নিত্ব এবং ঘি এর ঘিত্ব সমান নয়। অর্থাৎ অগ্নিতে ঘিত্বের এবং ঘি এ অগ্নিত্বের অভাব আছে। অতএব একে একবৃত্তি সামান্য বলে। একবৃত্তি সামান্য কেবল একটি বস্তুতে থেকে বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। যেমন—ঘি অগ্নিকে বাড়িয়ে দেয় কিন্তু ঘি এর ঘিত্ব সামান্য এবং অগ্নির অগ্নিত্ব সামান্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ঘি এর গুণ স্নিগ্ধ শীতল। অগ্নির গুণ রুক্ষ এবং উষ্ণ। গুণের দিক থেকে এদের মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, কর্মের দিক

থেকেও এদের পার্থক্য আছে। কারণ ঘি এর কর্ম শীতল করা এবং অগ্নির কর্ম উষ্ণ করা। এই প্রকার ঘি এবং অগ্নি উভয়ের মধ্যে দ্রব্যগত, গুণগত ও কর্মগত কোন প্রকার সমানতা পাওয়া যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘি থেকে অগ্নির বৃদ্ধি হয়ে থাকে প্রভাব বসত। অতএব একে একবৃত্তি সামান্য বলা হয়।

এইভাবে সমান এবং অসমান দুই প্রকার বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এটা দেখেই কেউ বলতে পারে সামান্যং বৃদ্ধি কারণম্ এই লক্ষণটি নিরর্থক, এই সমস্যা সমাধানে বলা হয়েছে যেখানে যেখানে সামান্য থাকে সেখানে সেখানে বৃদ্ধি এবং যেখানে যেখানে বৃদ্ধি সেখানে সেখানে সামান্য এমন ব্যাপ্তির কথা বলা যায় না। কারণ সামান্যের অভাবেও বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এটা বলা আবশ্যক নয় যে যেখানে সামান্য সেখানেই বৃদ্ধি। এই কারণে অধিকাংশ দোষে আক্রান্ত সকল ধাতু কম হলেও সমান গুণ বিশিষ্ট ঔষধি সেবন করলেও ধাতুর বৃদ্ধি হয় না, তথা গরমের দিনে মধু, স্নিগ্ধ, গুরু দ্রব্যের যদি সেবন করা হয় তাহলে ঐ দ্রব্যের সমান গুণ বিশিষ্ট কফ বৃদ্ধি হয় না। এখানে অসমান বস্তুর বৃদ্ধি হওয়ার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু লোক এর সমাধানে বলে থাকেন যদি বাধক কারণ না থাকে তাহলে সামান্য বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। এখানে অধিক দোষ হওয়া শরীরের ধাতুর এবং কফের বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধক অতএব অসমান দ্রব্য, গুণ ও কর্ম বৃদ্ধির কারণ একথা বলা উচিত নয়। অতএব উক্ত বিচারে বোঝা যায় যে রোগ বিশেষের চিকিৎসায় যখন বিভিন্ন ভেষজের ব্যবহার করা হয় তখন কেবল দ্রব্য বা কেবল

গুণ বা কেবল কর্ম সামান্য অনুসারে চিকিৎসা সম্ভব হয় না। পরন্তু দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটেরই সমানতা যুক্ত ভেষজের আশ্রয় যদি না নেওয়া হয় তাহলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না।[১৪]

উভয় বৃত্তি সামান্যঃ

যখন বৃদ্ধি কারক এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত উভয় দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বা গুণের গুণত্বের মাধ্যমে সামানতা পাওয়া যায় তখন তাকে উভয়বৃত্তি সামান্য বলে। যেমন—মাংসের দ্বারা মাংস বৃদ্ধি অর্থাৎ বাহ্য মাংস সেবনে শরীরস্থিত মাংস বৃদ্ধি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাহ্য মাংস পোষক এবং শরীরস্থিত মাংস পোষ্য। পোষক এবং পোষ্য উভয়ের মধ্যে মাংসত্বের সমানতা থাকায় একে উভয়বৃত্তি সামান্য বলা হয়।

'প্রবৃত্তিরূভয়স্যতু' অর্থে সামান্যের দ্বারা বৃদ্ধি এবং বিশেষের দ্বারা হ্রাস বা পৃথকত্ব অথবা বিপর্যয় একই সঙ্গে হয় তা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সামান্য এবং বিশেষ উভয়ের প্রবৃত্তি একত্রে বৃদ্ধি এবং হ্রাসের কারণ। প্রবৃত্তি অর্থে নিজ বৃত্তি বা কর্মে নিযুক্ত হওয়ার স্বভাব। সুতরাং মাংস সেবন বিনা কখনই মাংসের বৃদ্ধি হয় না বা শরীরের মাংসের হ্রাস হয় না। এই কারণে ধাতু সাম্যের জন্য ধাতু সাম্যবত এবং বিশেষবত দ্রব্যের ব্যবহার করা হয়। কারণ আয়ুর্বেদে দ্রব্যাদির ব্যবহার আরোগ্য লাভের জন্য করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন কারণে দোষ বা ধাতুর বৃদ্ধি হলে দোষ বৈষম্য বা ধাতু বৈষম্য হয়। সেই সময়ে তাদের বিপরীত গুণ যুক্ত বিশেষ দ্রব্যের ব্যবহারে দোষ বা ধাতুর সাম্যতা বজায় রাখা হয়। কোন দোষ বা ধাতু কোন

কারণে ক্ষয় হলে সেই দোষ বা ধাতুর সমগুণ যুক্ত দ্রব্যের সেবনে বর্ধিত হলে দোষ সাম্য বা ধাতু সাম্য হয়। সম্যক প্রকারে প্রযোজ্য মান দ্রব্য বৃদ্ধি এবং হ্রাস যুগপৎ ঘটে। অর্থাৎ একদিকে অসমান দ্রব্যের গুণ ও কর্মের বৃদ্ধি করে অন্যদিকে সেই দ্রব্য নিজ বিরোধী বা বিপরীত দ্রব্য, গুণ ও কর্মের হানি করে ধাতু সাম্য বজায় রাখা হয়। এই কারণে আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্ত হল সম্যক প্রকারে প্রযুক্ত ভেষজ একই সাথে হ্রাস এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধাতুগুলির মধ্যে সাম্যাবস্থা আনে। কারণ তাদের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধাতুর হ্রাস এবং হ্রাসপ্রাপ্ত ধাতুর বৃদ্ধি হয়। এইভাবে সাধারণত সামান্য এবং বিশেষের দ্বারা বৃদ্ধি এবং হ্রাসের প্রবৃত্তি এক সঙ্গেই হয়। [১৫]

আচার্য ভট্টার হরিচন্দ্র সামান্যের তিনটি ভেদের কথা স্বীকার করেছে। যে সেগুলি হল—অত্যন্ত সামান্য, মধ্য সামান্য এবং একদেশ সামান্য। যদিও এই সামান্যের প্রকার ভেদের কথা চক্রপাণি দত্ত স্বীকার করেনি। কারণ তার মতে এই প্রকারভেদ আয়ুর্বেদের উপযোগী নয়।

সামান্যের ভেদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে ব্যাপকতার দৃষ্টিতে পর, অপর এবং পরাপর এই ভেদের কথা স্বীকার করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে আচার্য চক্রপাণি দত্ত দ্রব্য সামান্য, গুণ সামান্য এবং কর্ম সামান্য এই তিন প্রকার সামান্যের উল্লেখ করেছেন। আচার্য ভট্টার হরিচন্দ্র অত্যন্ত সামান্য, মধ্য সামান্য এবং একদেশ সামান্যের কথা স্বীকার করেছেন। আয়ুর্বেদীয় মূল সিদ্ধান্ত

এবং উপযোগীতার কথা মাথায় রেখে চক্রপাণি দত্ত কৃত দ্রব্য সামান্য, গুণ সামান্য এবং কর্ম সামান্যকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

চরকসংহিতায় সামান্যের তিনটি লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রথম লক্ষণে বলা হয়েছে 'সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণম্'। এই সামান্যের লক্ষণ চিকিৎসার সিদ্ধান্ত রূপে প্রথমে প্রতিপাদিত হয়েছে। কারণ আয়ুর্বেদের অন্যতম লক্ষ্য ধাতু সাম্য বজায় রাখা। এই কারণে সামান্য ও বিশেষ দুটি উপাদেয়। কিন্তু এখানে আমরা মূলত সামান্যের চর্চা করছি। সামান্যের দ্বারা ক্ষীণ ধাতুর বৃদ্ধি করা হয়। আচার্য চরক সামান্যের লক্ষণে 'সর্ব্বভাবানাং' এই শব্দের প্রয়োগের দ্বারা সকল ভাববস্তুর বৃদ্ধির কারণ যে সামান্য তা বুঝিয়েছেন। এখানে যদিও সর্বভাব পদার্থ বলতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম এই তিনটি ভাব পদার্থের গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে 'সর্ব্বভাবানাং এই শব্দের দ্বারা সামান্যের আশ্রয় তিনটি ভাবপদার্থ দ্রব্য, গুণ এবং কর্মকে বোঝানো হয়েছে। কারণ দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম এই তিনটি ধাতু বৃদ্ধিকারক ভাব পদার্থ। এই তিনটির লক্ষ্য ধাতুর বৃদ্ধি করা। ধাতু যদি দ্রব্য হয় তাহলে গুণ এবং কর্ম তাতে আশ্রিত থাকে এবং গুণ কর্মের যদি বৃদ্ধি হয় তো সমবায় সিদ্ধান্ত অনুসারে আশ্রয় ধাতুরও বৃদ্ধি হয়। গুণের দ্বারা গুণের, কর্মের দ্বারা কর্মের বৃদ্ধি হয়। অতএব 'সর্ব্বভাবানাং' শব্দের দ্বারা দ্রব্য, গুণ কর্মকে বোঝানো হয়েছে।

আয়ুর্বেদে সামান্যকে মূলত বৃদ্ধির কারণ বলা হয়েছে। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের এমন লক্ষণ কিন্তু স্বীকার করা হয় না। আয়ুর্বেদে সমানধর্মতা অর্থে

সামান্যকে স্বীকার করা হয়েছে। ন্যয়-বৈশেষিক দর্শনে সামান্যকে নিত্য, অনেকে সমবেত বলা হয়েছে এবং সমান ধর্ম অর্থে সামান্যের কথা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু আয়ুর্বেদে সমানধর্ম অর্থে সামান্যের কথা স্বীকার করলেও সামান্যকে কখনই নিত্য বলে স্বীকার করা হয়নি।

আয়ুর্বেদে সামান্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা মূলত আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনকে অবলম্বন করে। উক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখি আয়ুর্বেদে সামান্যের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের কথা স্বীকার করলেও ন্যায় বৈশেষিক সম্মত সামান্যের যে শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ পর, অপর এবং পরাপর এই শ্রেণী বিভাগের কথা কিন্তু আয়ুর্বেদে স্বীকৃত হয়নি। আয়ুর্বেদে সামান্যের যে শ্রেণী বিভাগের কথা স্বীকার করা হয়েছে তা মূলত চিকিৎসার জন্য উপযোগী।

বিশেষ পদার্থ:

আয়ুর্বেদে সামান্যের বিপরীত পদার্থরূপে বিশেষ পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে। সামান্য হল বৃদ্ধির কারণ এবং বিশেষ হল হ্রাসের কারণ। বৈশেষিক দর্শনে যে পদার্থের ক্রম উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষকে সেখানে পঞ্চম স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চরকসংহিতায় যে ক্রমে পদার্থ গুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে বিশেষের স্থান দ্বিতীয়। বিশেষের স্থান দ্বিতীয় কেন তার আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি।

সামান্যের বিপরীত যে পদার্থের কারণে অনেক পদার্থ বিষয়ে ভিন্নতার জ্ঞান হয় তাকে বিশেষ বলা হয়। বিশেষ ভেদ প্রকট করে। যে ধর্ম সংসারে এক

বস্তু থেকে অন্য বস্তুর ভেদ করে তাকে বিশেষ বলা হয়। যেমন কোন সভাস্থলে মানুষদের ডাকা হল এবং বলা হল এখানে উপস্থিত সকল ব্যক্তিই মানুষ। যেহেতু সকলের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যদি বলা হয় সকল উপস্থিত মানুষের মধ্যে নেহেরু, বিবেকানন্দ, ইকবাল এনারা আসুন তাহলে এই বিশেষ বাক্যের দ্বারা সভাস্থলের সমুদয় থেকে তাঁরা পৃথক হয়ে যাবে এবং কেবল অল্প মানুষই থেকে যাবে। যত মানুষ আছে সকল মানুষের থেকে তারা বিশিষ্ট হয়ে যাবে।

বিশেষের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে "হ্রাসহেতুর্বিশেষশ্চ" অর্থাৎ যে পদার্থ হ্রাসের কারণ তাই হল বিশেষ।[১৬] কিন্তু এই হ্রাস সংযোগ সাপেক্ষ, কারণ সমান ধর্মী দ্রব্যাদি যোগে দ্রব্যাদি যেমন বৃদ্ধি হয় তেমনি বিপরীত ধর্মী দ্রব্যাদি যোগে দ্রব্যাদির হ্রাস হয়।

মহর্ষি চরকের মতে যে গুরু পদার্থের সেবনে গুরু ধাতু বৃদ্ধি এবং লঘু ধাতুর হ্রাস হয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি দেখা গেছে যে যদি কোন ব্যক্তির শরীরে কোন ধাতুর বৃদ্ধি হয়, তার দ্বারা শরীরে কোন হানি হয় বা কোন দোষ উৎপন্ন হয় তাহলে তার বৃদ্ধির হেতু অপেক্ষা ওই পদার্থের হ্রাসের কারণ যে পদার্থ তার পক্ষে উপযোগী সেই পদার্থকে বিশেষ বলা হয়।[১৭]

আয়ুর্বেদে বিশেষের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেখানে—'প্রবৃত্তিরুভয়স্যতু' এই শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে—যদিও পদার্থের বর্ণনার দৃষ্টিতে প্রায়োগিক দিক

থেকে সামান্য এবং বিশেষ দুটি পৃথক সত্তা তথাপি এটিও স্পষ্ট যে দুটি পরস্পর বিপরীতধর্মী সামান্য ভাবের বৃদ্ধির কারণ। যদি কোন আহার বা ঔষধি অতি সেবন করার ফলে শরীরে কোন ধাতুর অতিবৃদ্ধি হয়ে থাকে তাহলে বিশেষ হ্রাসের কারণ হওয়ায় বিশেষের প্রয়োগের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধাতু পুনঃসমতায় আনা হয়। যেমন স্নেহের দ্বারা পিত্তের, তেলের দ্বার বাতের, মধুর দ্বারা কফের হ্রাস করে সমতা বজায় রাখা হয়।

বিশেষের যে দ্বিতীয় লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেটি হল "পৃথকত্বকৃৎ"[১৮] অর্থাৎ এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থের, এক দ্রব্য থেকে অন্য দ্রব্যের যে ভেদ, সেই ভেদের কারণকে বিশেষ বলা হয়। যেমন ঘট এবং পট দুটি শব্দ একই সময়ে উচ্চারণ করলেও তা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে পৃথক বুদ্ধি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

উক্ত লক্ষণ বিষয়ে আমরা মহর্ষি চরকের কথার সাথে ন্যায় দর্শনের বক্তব্যর মিল লক্ষ্য করতে পারি। ন্যায় দর্শনেও বিশেষকে ভেদক, ব্যবর্তক রূপে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এখানে বলে রাখা ভালো যে ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে যেমন বিশেষকে নিত্য বলা হয়েছে এবং অন্ত বিশেষ বলা হয়েছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কিন্তু বিশেষের এমন কোন বিশেষণের কথা স্বীকার করা হয়নি। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে বিশেষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বিশেষ নিজের আশ্রয়ভূত নিত্য পদার্থটিকে স্বজাতীয় অন্যান্য নিত্য দ্রব্য থেকে ব্যাবৃত্ত করে, সাথে সাথে অন্য নিত্য দ্রব্যে

অবস্থিত বিশেষ দ্রব্য থেকেও নিজেকে পৃথক করে। অতএব ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে বিশেষকে অন্ত বিশেষ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। 'অন্ত' অর্থে শেষ বা চরম। বিশেষকে অন্তিম ভেদক ধর্ম বলা হয়েছে। দুটি পদার্থের ভিন্নতায় তাদের জাতি, গুণ, ক্রিয়া, অবয়ব ইত্যাদির সাহায্যে নির্ণয় করা যায় না। যেমন সমগুণ সম্পন্ন পরমাণু। কেবল তখনই তাদের প্রত্যকের মধ্যে একচরম ভেদক ধর্ম অনুমান করতে হয় অন্যথা তাদের একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যায় না। বৈশেষিক মতে এই চরম ভেদক ধমই হল বিশেষ।[১৯] আয়ুর্বেদে পৃথকত্বকে বিশেষের লক্ষণ বললেও, ন্যায় বৈশেষিক দর্শন যেমন চরম ভেদক অর্থে বিশেষের কথা স্বীকার করা হয়েছে তেমন অর্থে আয়ুর্বেদে বিশেষকে স্বীকার করা হয়নি। কারণ অনিত্য বস্তুর ভেদকধর্মকেও আয়ুর্বেদে বিশেষ বলে স্বীকার করা হয়। মহর্ষি কণাদ বিশেষ প্রসঙ্গে বলেছেন—"নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়োহন্ত্যা বিশেষাঃ" অর্থাৎ যে পদার্থ নিত্য দ্রব্যে বর্তমান থেকে তাদের পারস্পরিক চরম ব্যাবৃত্তি বুদ্ধির জনক তাকে বিশেষ বলা হয়। পার্থিব চতুর্বিধ পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন হল নিত্য দ্রব্য, এই পদার্থগুলিতে বিশেষ সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং এদের পারস্পরিক ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন করে।[২০] উক্ত লক্ষণে 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তি' ও 'অন্ত্য' পদ দুটি বিশেষের স্বরূপ প্রকাশক এবং বহুবচনান্ত 'বিশেষাঃ' পদের দ্বারা বিশেষ যে অসংখ্য তার নির্দেশ করা হয়েছে। বিশেষ পদার্থ তার আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। প্রতিটি আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ পদার্থ থাকায় বিশেষ যে অসংখ্য তা স্বীকার করা হয়েছে। নিত্য দ্রব্যে

ভেদবুদ্ধির জনক হলেও অসংখ্য বিশেষ পদার্থ তাদের পারস্পরিক ভেদের জন্য অন্য কোন বিশেষের উপর নির্ভর করে না। কারণ প্রতিটি বিশেষ স্বতব্যাবর্তক। অর্থাৎ প্রতিটি বিশেষ নিজেই নিজের ব্যাবর্তক। বিশেষ পদার্থ যদি তার ভেদের জন্য অন্য কোন বিশেষের উপর নির্ভর করে তবে সেই বিশেষ ও তার ভেদের জন্য অন্য কোন বিশেষের উপর নির্ভর করবে। এইভাবে চলতে থাকলে অনবস্থাদোষ দেখা যাবে। এই জন্য বিশেষকে শেষ ব্যাবর্তক বলা হয়। এই কারণে বিশেষে আর বিশেষ স্বীকার করা হয় না।

বৈশেষিক দর্শনে 'অন্ত্য' শব্দটির অর্থ হল চরম। যার আর অন্য কোন ব্যাবর্তক হয় না তাই অন্ত্য ব্যাবর্তক। এই অন্ত্য ব্যাবর্তক কেবল ব্যাবৃত্তি প্রতীতিরই জনক হয়। কোন অনুগত প্রতীতির জনক নয়। বিশেষ পদার্থকে তাই অন্ত্যব্যাবর্তক বলা হয়েছে।

বিশেষের যে তৃতীয় লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেটা হল—'বিশেষস্তু বিপর্যয়'।[২১] এই লক্ষণের দ্বারা বোঝা যায় যে বিশেষ সামান্যের বিপরীত ধর্মী। কারণ একটা গোরুর সাথে অন্য গোরুর যে মিল তার কারণ রূপে সামান্যকে স্বীকার করা হয়েছে। তেমনি দুটি পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য এই পার্থক্যের কারণ হল বিশেষ। এই পার্থক্য গুণে দিক থেকে হতে পারে। আবার কর্মের দিক থেকে হতে পারে। অথবা আকৃতির দিক থেকে হতে পারে। জল্পকল্পতরু টীকাকার বলেছেন যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি পদার্থের হ্রাসের কারণ হল বিশেষ।[২২]

অতএব আমরা দেখছি বিশেষের মূলত তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে যে এই তিনটি কি বিশেষের পৃথক বৈশিষ্ট্য? এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সম্বন্ধ কীরূপ? আয়ুর্বেদে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের ব্যবহারিক গুরুত্ব কতটা?

উক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে কোন বৈশিষ্ট্য কোন প্রকার দোষ দেখানো হয়নি, তাহলে প্রশ্ন হল তিনটি বৈশিষ্ট্যই কি আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে উপযোগী? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে তিনটি বৈশিষ্ট্যের ব্যবহারিক উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

কিন্তু বিশেষের বিভাগ নিয়ে আলোচনা করার পরই আমরা বিশেষের লক্ষণের ব্যবহারিক উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করতে পারব। তার কারণ বিশেষকে যখন হ্রাসের কারণ বলা হল তখন মূলত বিশেষের তিনটি বিভাগের উপযোগিতা দেখিয়েই এই লক্ষণের উপযোগিতার কথা বলা হয়। আয়ুর্বেদে দ্রব্যবিশেষ, গুণবিশেষ এবং কর্মবিশেষ ভেদে বিশেষের তিনটি ভাগের কথা স্বীকার করা হয়েছে।[২৩]

দ্রব্যবিশেষ:

বৃদ্ধি প্রাপ্ত কোন দ্রব্যকে তার বিপরীতধর্মী দ্রব্যের প্রয়োগের দ্বারা হ্রাস করা হলে দ্রব্য বিশেষ বলা হয়। আয়ুর্বেদে হ্রাসের কারণকে বিশেষ বলা হয়েছে। এক দ্রব্যের

হ্রাস তার বিপরীত দ্রব্যের দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন গবেধুক এক প্রকার তৃণ বিশেষ। যাকে মাংসের প্রতি বিশেষ বলা হয়েছে। অতএব গবেধুক সেবনের ফলে মাংসের অপচয় হয়। মাংসের মধ্যে গবেধুকত্ব থাকে না, অতএব মাংসের প্রতি গবেধুক বিশেষ দ্রব্য। গবেধুকের কারণেই মাংসের হ্রাস হয়ে থাকে।

শরীরে ধাতুর বৃদ্ধি হলে তাকে ক্ষীণ করার জন্য বা হ্রাস করার জন্য যব এবং মধু প্রয়োগ করা হয়। পিত্ত ধাতু বৃদ্ধিতে আমলকির প্রয়োগ করা হয়। বাতের বৃদ্ধিতে তিলের তেল ব্যবহার করা হয়। কফ দোষের হ্রাসের জন্য পিত্ত, কটু, কষায় রস প্রয়োগ করা হয়। পঞ্চমহাভূতের আধারে ধাতু বিশেষের হ্রাস মূলত দ্রব্য বিশেষের দ্বারাই হয়ে থাকে।[২৪]

গুণবিশেষ:

দ্রব্য বিশেষের প্রয়োগে গুণের দ্বারা তার বিপরীত গুণেরও হ্রাস হয়ে থাকে, তাকে গুণবিশেষ বলা হয়। শরীরে বাতের বৃদ্ধিতে তেল প্রয়োগ করা হয়। স্নিগ্ধ এবং গুরু গুণের কারণেই তেল, বায়ু, শীত, রুক্ষ, লঘু গুণের হ্রাস করে থাকে এবং বায়ুর বিকারকে শান্ত করে। কফ, মধু, স্থির, গুরু এবং পিচ্ছিল গুণের বিপরীত কটু, পিত্ত, কষায় এবং উষ্ণগুণ যুক্ত দ্রব্যের হ্রাস হয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ধাতু বা দোষের ক্ষয় করার জন্য সর্বাধিক প্রচলিত আহারের কথা বলা হয়েছে যা গুণবিশেষ। আহারাদি প্রয়োগ মাধ্যমে চিকিৎসা এবং ঔষধি প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা দুটিই গুণ বিশেষের দ্বারা করা হয়। আয়ুর্বেদে ঔষধিকে বীর্য প্রধান বলা হয়েছে। বীর্য

অন্য পদার্থে থাকে না বরং তা দ্রব্যের উৎকৃষ্ট গুণ বিশেষ। যেমন স্থূল ব্যক্তিকে রুক্ষ্ম, লঘু গুণ যুক্ত দ্রব্যের দ্বারা এবং কৃশ ব্যক্তিকে স্নিগ্ধ, গুরু আদি গুণ যুক্ত দ্রব্যের দ্বারা চিকিৎসা করা হয়।[২৫]

কর্ম বিশেষ:

বিপরীত কর্মের দ্বারা শরীরের দোষ অথবা ধাতুর হ্রাস করানো হয়। যেমন—কফের স্থিরতা গুণকে দূর করার জন্য ভ্রমণ অথবা সাঁতার ইত্যাদি চলন কর্ম বিশেষের কথা বলা হয়েছে। বৃদ্ধি প্রাপ্ত কফ বা বাতের হ্রাসের জন্য যেমন যোগ ব্যায়াম করা হয় তেমনি মানসিক রোগের হ্রাসের জন্যেও যোগব্যায়ামের সাহায্য নেওয়া হয়।[২৬]

এখন আমরা আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে বিশেষের ব্যবহারিক দিকের আলোচনা করব। আমরা লক্ষ্য করি, আয়ুর্বেদে মূলত বিশেষের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যে বৈশিষ্ট্য গুলি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এখানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আয়ুর্বেদে বিশেষের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের ব্যবহারিক তাৎপর্য কি?

বিশেষের প্রথম যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তাহল—বিশেষ হল 'হ্রাসের কারণ' আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য হল ধাতুর সাম্যাবস্থার স্থীতি বজায় রাখা। স্বাস্থ্যরক্ষার হেতু আহার বিহার ইত্যাদি দ্বারা শরীরে ধাতুর সাম্যভাব বজায় রাখা তথা হ্রাস প্রাপ্ত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধাতুকে সাম্যাবস্থায় আনা।

বিশেষের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তার প্রথম বিভাগ হল দ্রব্য বিশেষ, এখন আমরা দেখব দ্রব্যবিশেষ কিভাবে হ্রাস করে। দ্রব্য বিশেষের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে গবেধুকের প্রয়োগের দ্বারা মাংস ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। শরীরে ধাতু বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য যেমন সামান্যের প্রয়োগ করা হয় তেমনি হ্রাসের জন্য বিশেষের ব্যবহার করা হয়। প্রকৃত পক্ষে সামান্য বা বিশেষের ব্যবহার ধাতুর সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্যই করা হয়।

আয়ুর্বেদে যেখানে দ্রব্য বিশেষের প্রয়োগ করা হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেখানে গুণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ এখানে এটা বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে দ্রব্যের মধ্যে অবস্থিত যে গুণ সেই গুণের কারণেই ওই দ্রব্যের প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু কখন কখন দ্রব্যের প্রয়োগ সরাসরি ধাতু হ্রাস করার জন্যেও করা হয়। যেমন গুগুল নামক দ্রব্যের প্রয়োগে মেদ ধাতুর হ্রাস হয়।

আয়ুর্বেদে রোগ উৎপত্তি প্রক্রিয়ার মুখ্য কারণ ধাতুর বৃদ্ধিকেই স্বীকার করা হয়েছে ক্ষীণতাকে নয়। সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসরাদি দোষ বৃদ্ধির কারণেই হয়ে থাকে। শোধন এবং শমন শব্দের দ্বারা এটাই ব্যক্ত হয় যে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে কেবল বৃদ্ধি প্রাপ্ত দোষকেই কারণ বলা হয়, ক্ষীণ দোষের চিকিৎসা বা ক্ষীণ ধাতুর বৃদ্ধিতে আহারাদির দ্বারাই চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধি প্রাপ্ত দোষের চিকিৎসায় ঔষধি চিকিৎসার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় যে বিভাগের কথা বলা হয়েছে তাহল গুণবিশেষ। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা মূলত গুণবিশেষের দ্বারাই হয়ে থাকে কারণ দোষ কোন গুণ সম্পন্ন সেটা জানার পরই তার বিপরীত গুণ যুক্ত দ্রব্যের দ্বারা সেই দোষকে প্রশমিত করা হয়ে থাকে। আয়ুর্বেদে যে ষড়বিধ চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে তা মূলত গুণের উপরই নির্ভর করে।

লংঘন চিকিৎসা লঘু, তীক্ষ্ণ, বিষাদ, রুক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, খর, সর, ইত্যাদি গুণ যুক্ত দ্রব্যের মাধ্যমে করা হয়। বৃংহণ চিকিৎসা গুরু, মৃদু, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, মন্দ, স্থূল, স্থির গুণ যুক্ত দ্রব্য দ্বারা করা হয়। রুক্ষ্ম চিকিৎসা লঘু, তীক্ষ্ণ, বিশাদ, খর, স্থির, কঠিন, গুণ যুক্ত দ্রব্যের দ্বারা করা হয়। স্নেহন চিকিৎসা গুরু, মৃদু, দ্রব্য, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, মন্দ, সর, গুণ যুক্ত দ্রব্যের দ্বারা করা হয়। সেদন চিকিৎসা গুরু, তীক্ষ্ণ, দ্রব, রুক্ষ্ম, স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম, সর গুণ যুক্ত দ্রব্যের দ্বারা এবং স্তম্ভণ চিকিৎসা লঘু, মৃদু, দ্রব, রুক্ষ্ম, মন্দ, সূক্ষ্ম, স্থির গুণ যুক্ত দ্রব্যের দ্বারা করা হয়।

এইভাবে স্পষ্ট বোঝা যায় যে দোষ শমন হেতু যে ছয় প্রকার চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে তা গুণের দ্বারাই করা হয়। এখানে গুণ সামান্যের ব্যবহার না হয়ে গুণ বিশেষেরই কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে কেন গুণ সামান্যের ব্যবহার না করে গুণ বিশেষের ব্যবহার করা হল। তার আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। যখন বলা হল বৃদ্ধিই রোগের অন্যতম কারণ সেই রোগকে নাশ করার

জন্য সামান্যের প্রয়োগ না করে বিশেষের প্রয়োগ করতে হবে। কারণ সামান্য বৃদ্ধির কারণ আর বিশেষ হ্রাসের কারণ।

আয়ুর্বেদে শল্য চিকিৎসা বা কাশ্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে কর্ম বিশেষের উল্লেখ করা হয়েছে। শল্য চিকিৎসায় বিভিন্ন প্রকারের চেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে কফের নাশ করা যায় তার জন্য ব্যায়াম তথা মৈথুন কর্মের কথাও বলা হয়েছে। অতএব আমরা দেখলাম বিশেষের যে প্রথম বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ বিশেষ হল হ্রাসের কারণ এটি দ্রব্য বিশেষ, গুণ বিশেষ এবং কর্ম বিশেষের ক্ষেত্রে যথার্থভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। বিশেষের যে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে দেওয়া হয়েছে এখন তার উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করব।

চরকসংহিতায় যেখানে একত্বকারী রূপে সামান্য প্রয়োগ বা ব্যবহার দেখানো হয়েছে সেখানে পৃথকত্বকারী রূপে বিশেষের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন— নিদান চিকিৎসাস্থলে এবং দ্রব্য প্রকরণ স্থলে। সামান্য দ্বারা মনুষ্যকে বাতল, পিওল, শ্লেষল করে বর্গীকৃত করা হয়েছে। সেখানে নৈদানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষের পৃথকত্বের ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যক পুরুষের পৃথক পৃথক পরীক্ষা করা উচিত। যেখানে বাত, পিত্ত, কফের বর্গীকরণ করা হয়েছে সেখানে তারতম্য ভেদে পৃথক পৃথক বিকল্পের নির্দেশের মাধ্যমে পৃথকত্বের ব্যবহার করা হয়েছে।

সামান্যের দ্বারা যেখানে একত্বের ব্যবহার হয় সেখানে বিশেষের দ্বারা পৃথকত্বের ব্যবহারও হয়। দুটি পরমানু স্বরূপ অবয়বকে পরমানুত্ব সামান্যের দ্বারা যেমন একত্বের কথা স্বীকার করা হয় তেমনি তাদের পৃথকত্বের কারণ রূপে বিশেষ পদার্থেরও স্বীকার করা হয়েছে। উক্ত আলোচনায় আমরা কিছুটা ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের মতের সঙ্গে সাম্য লক্ষ্য করি। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে যেমন বিশেষকে নিত্য অন্তবিশেষ বলা হয়েছে আয়ুর্বেদ কিন্তু সেই অর্থে বিশেষকে স্বীকার করা হয়নি।

বিশেষের যে তৃতীয় লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাহল 'বিপর্যয়'। সেখানে বৈষম্যের কথা স্বীকার করা হয়েছে। বিশেষকে বিপর্যয় রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। পুরুষ থেকে প্রকৃতির বিপর্যয়, পরমাত্মা থেকে জীবাত্মার বিপর্যয়। গুণের বিপর্যয় কর্মের থেকে। যখন আমরা গুণকে নিশ্চেষ্ট বলি তখন কিন্তু আমরা মূলত গুণের বিপর্যয়ের কথাই বলি। এই নিশ্চেষ্ট শব্দের দ্বারা কর্ম থেকে গুণের বিপর্যয়ে কথা বলে থাকি। কর্মের ক্ষেত্রেও বিপর্যয় হয়ে থাকে যেমন উৎক্ষেপণের বিপর্যয় অবক্ষেপণে, আকুঞ্চনের বিপর্যয় প্রসারণ থেকে। তেমনি গুরুর বিপর্যয় লঘু থেকে, শীতের বিপর্যয় উষ্ণ থেকে করা হয়ে থাকে।

সামান্য এবং বিশেষ পদার্থ চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বাধিক উপযোগী, আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য হল বিষম ধাতুগুলিকে সাম্যবস্থায় আনা। বায়ু পিত্ত এবং কফ এই গুলির কিছু বিশিষ্ট গুণ থাকে এই গুণ গুলি যদি শরীরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহলে এই ত্রিদোষের বৃদ্ধি হতে থাকে। এই দোষকে সাম্যবস্থায় আনা অর্থাৎ ক্ষয় অবস্থা প্রাপ্ত দোষের বৃদ্ধি এবং অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত দোষের ক্ষয় করে ধাতুর

সাম্য স্থাপিত করাই হল আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য। বৃদ্ধি প্রাপ্ত দোষের হ্রাসের জন্য বিপরীত গুণ যুক্ত ঔষধি আহারাদির সেবন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আয়ুর্বেদে বিশেষের যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে কোন অংশে বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত বিশেষের সাদৃশ্য থাকলেও বিশেষের যে শ্রেণী বিভাগের কথা বলা হয়েছে সেই বিষয়ে আয়ুর্বেদের বিশিষ্টতা বর্তমান। অতএব পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখলাম যে মূলতঃ চিকিৎসার কথা মাথায় রেখেই এই শ্রেণী বিভাগের কথা স্বীকার করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, প্রথম ভাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৬।

২. তদেব।

৩. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* প্রথম ভাগ সূত্রস্থান, ডঃ লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, সহব্যাখ্যাকার ডঃ বি. কে. দ্বিবেদী এবং ডঃ পি. কে. গোস্বামী, চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস একাদেমি, বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ২৮।

৪. শ্রী কেশব মিশ্র বিরচিত *তর্কভাষা,* বঙ্গানুবাদ-বিবৃতি সহিতা, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রী গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, স্টোর অফ অ্যাডভান্স স্টাডি অফ ফিলসফি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ. ৩৩৪।

৫. *ভাষা পরিচ্ছেদ* শ্রীমদ্ পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৯৫১।

৬. শ্রীমদন্নংভট্ট বিরচিত, *তর্ক সংগ্রহ* সটীকঃ অধ্যাপনা সহিত শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পৃ. ৪৩।

৭. অন্নংভট্ট বিরচিত *তর্কসংগ্রহ,* সটীকঃ অধ্যাপনা সহিতঃ শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, বঙ্গাব্দ-১৪১৩, পৃ. ৫৬।

৮. (ত্রিবিধং সামান্যম্ ... যথা—দ্রব্যগোচরো গুণগোচরঃ কর্মগোচরশ্চ; তত্র সর্ব্বদেত্যাদিনা দ্রব্যসামান্যমুচ্যতে, সামান্যমেকত্বকরমিত্যনেন গুণ সামান্যং, যথা—"পয়ঃশুক্রয়োর্ভিন্নজাতীয়য়োরপি মধুরত্বাদিগুণসামান্যং তত্রৈকতাং করোতি, ... তুল্যার্থতেত্যাদিনা তু কর্ম্মসামান্যং নিগদ্যন্তে, আস্যারূপং হি কর্ম্ম ন শ্লেষ্মণা সমানমপি তু পানীয়াদিকফসমানদ্রব্যার্থক্রিয়াকারিত্বাং কফবর্দ্ধকরূপতয়া আস্যাপি কফসমানেত্যুচ্যতে, এবং স্বপ্নাদাবপি কর্ম্মণি বোদ্ধব্যম্।" *চরকসংহিতা,* মহর্ষি চরক, চক্রপাণী দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকা সহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও সংশোধিত, বারাণসী চৌখাম্বা অরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪২।

৯. *চরকসংহিতা,* মহর্ষি চরক, হিন্দি অনুবাদ ব্যাখ্যাকার কাশীনাথ পান্ডে এবং গোরখনাথ চতুর্বেদী, সম্পাদক রাজেশ্বর দত্ত শাস্ত্রী চৌখাম্বা বিদ্যাভবন বারাণসী, ১৯৬১, পৃ. ১৫।

১০. তদেব।

১১. তদেব।

১২. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা* হিন্দু অনুবাদ, ব্যাখ্যাকার কাশীনাথ পান্ডে এবং গোরখনাথ চতুর্বেদী, রাজেশ্বর দত্ত শাস্ত্রী চৌখাম্বা বিদ্যাভবন বারাণসী, ১৯৬১, পৃ. ১৫।

১৩. কেচিং সামান্যং দ্বিবিধমিচ্ছন্তি, উভয়বৃত্তি তথৈকবৃত্তি চ। তত্র মাংসং মাংসবর্দ্ধকম্ উভয়বৃত্তিসামান্যাং, মাংসত্বং হি পোষ্যে পোষাকে চ গতত্বাৎ উভয়বৃত্তি, একবৃত্তি তু যথা ঘৃতমগ্নিকরং, তথা ধাবনাদিকর্ম্ম বাতকরং তথাহুহুস্যাদি কফকরম্ এতদ্ধি সর্ব্বং ন বর্দ্ধনীয়েন সমানং কিন্তু প্রভাবাদ্ধর্দ্ধকং, প্রভাবশ্চ ঘৃতত্বধাবনত্বাদিরেব, স চৈকাবৃত্তিসামান্যরূপঃ। *চরকসংহিতা* মহর্ষি চরক, চক্রপাণী দত্ত প্রণীত *আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা* এবং গঙ্গাধর বিরচিত *জল্পকল্পতরু টীকা* সহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও সংশোধিত, বারাণসী চৌখাম্বা অরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৩।

১৪. *চরকসংহিতা,* মহর্ষি চরক, হিন্দি ব্যাখ্যা আয়ুর্বেদাচার্য শ্রী জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, প্রথম খণ্ড, প্রকাশক মতিলাল বারাণসী দাস, সংস্কৃত হিন্দু পুস্তক বিক্রেতা, ১৯৫৪, পৃ. ৭।

১৫. তদেব ।

১৬. *চরকসংহিতা,* মহর্ষি চরক, আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীজয়দেব বিদ্যালঙ্কার পূর্ব ভাগ, মোতিলাল বারাণসী দাস, ৪ ক্যামাক স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০১৭, ২০১৮, পৃ. ৫।

১৭. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* প্রথম খণ্ড, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র, প্রকাশন, কলকাতা, ২০৩, পৃ. ৩৫৮।

১৮. তদেব, পৃ. ৬।

১৯. অন্নংভট্ট বিরচিত *তর্কসংগ্রহ*, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৭০০০০৬, বঙ্গাব্দ ১৪১৩, পৃ. ৬৮।

২০. শ্রীমদন্নং ভট্ট বিরচিত, *তর্কসংগ্রহ* সটীকঃ অধ্যাপনাসহিতঃ শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডর, ৩৮ বিধানসরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, বঙ্গাব্দ ১৪১৩, পৃ. ৬৭।

২১. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীজয়দেব বিদ্যালঙ্কার, মোতিলাল বানারসী দাস, ৪ ক্যামাক স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০১৭, ২০১৮, পৃ. ৬।

২২. "সর্ব্বেষাং ভাবানাং দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং, বিশেষো হ্রাসে হেতুঃ", *চরকসংহিতা* মহর্ষি চরক চক্রপানী দত্ত প্রণীত *আয়ুর্বেদদীপিকা টীকা* এবং গঙ্গাধর বিরচিত *জল্পকল্পতরু টীকা* সহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাই চন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও সংশোধিত বারাণসী চৌখাম্বা, অরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১, খন্ড - ১, পৃ.৩৫।

২৩. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা* হিন্দু অনুবাদ ব্যাখ্যাকার কাশীনাথ পাণ্ডে এবং গোরখনাথ চতুর্বেদী সম্পাদক রাজেশ্বর দত্ত শাস্ত্রী চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ১৯৬১, পৃ. ১৫।

২৪. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, কাশীনাথ পাণ্ডে, গোরখনাথ চতুর্বেদী চৌখাম্বা বিদ্যাভবান, বারাণসী, ১৯৬১, পৃ. ১৬।

২৫. তদেব।

২৬. তদেব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে প্রতিপাদিত গুণ পদার্থ

সুস্থ ও অসুস্থ ব্যক্তিকে তাদের ধাতুসাম্য বজায় রাখার জন্য যে আহার এবং ঔষধি দ্রব্যের প্রয়োগ করা হয় তার নিরূপণ তাদের গুণের নির্ণয়ের উপর নির্ভরশীল। দ্রব্যের অন্বেষণ, দ্রব্যের পরীক্ষা তথা উপযোগিতা ইত্যাদি দ্রব্যের গুণের উপরেই নির্ভরশীল। এই কারণে গুণের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আচার্যগণ সামান্য ও বিশেষের পর গুণের উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ পদার্থের ক্রমে গুণকে তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে কারণ বস্তুর মূল্যায়ণ গুণের দ্বারাই করা হয়ে থাকে। পঞ্চমহাভূতের ফলে শরীরে যে ক্রিয়া হয় তার কারণ হল গুণ। পঞ্চমহাভূতকে দোষের কারণ বললেও গুণের দ্বারাই পঞ্চমহাভূতের স্বভাবের বর্ণনা দেওয়া হয়ে থাকে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে দ্রব্যের পরেই গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। এই উল্লেখের যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে, গুণ দ্রব্যকে ছাড়া থাকতে পারে না, অর্থাৎ গুণ সবসময় দ্রব্যাশ্রিত হয়েই থাকে। তাই দ্রব্যের জ্ঞান না হলে গুণের জ্ঞান সম্ভব নয়। অর্থাৎ আশ্রয়ের জ্ঞান ছাড়া আশ্রিতের জ্ঞান হতে পারে না। তাই দ্রব্যের উল্লেখের পরেই গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু গুণকে যখন দ্রব্যের পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে বা তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে তখন কিন্তু আয়ুর্বেদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই তা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদের প্রয়োজনের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

চরকসংহিতার গুণের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাহল “সমবায়ী তু নিশ্চেষ্টঃ কারণং গুণঃ”[১] অর্থাৎ যা সমবায়ী অথচ নিশ্চেষ্ট এবং কারণ তাকে গুণ বলা হয়, এখন প্রশ্ন হল সমবায়ী শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? অর্থাৎ এটা প্রতিযোগী অর্থে ব্যবহৃত নাকি অনুযোগী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? এর উত্তরে বলা হয় যা সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগী বা সমবায়াধেয় হয় তাকে এখানে সমবায়ী শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে সমবায়ী শব্দটি সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগী অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। দ্রব্য এবং গুণের মধ্যে যে পরস্পর আধারাধেয় সম্বন্ধ তাকে সমবায় সম্বন্ধ বলা হয়, এই সম্বন্ধ নিত্য যা কখনই বিনষ্ট হয় না। এই সম্বন্ধে দ্রব্য আধার এবং গুণ আধেয়। আশ্রয়কে আধার বলে এবং আশ্রয়ীকে আধেয় বলে। আধেয় আধার ছাড়া থাকতে পারে না, এই প্রকার আধেয় স্বরূপ গুণ আধার রূপ দ্রব্য বিনা থাকতে পারে না। গুণ সর্বদাই দ্রব্যাশ্রিত থাকে। এই জন্য মহর্ষি চরক গুণের প্রথম লক্ষণ সমবায়ী বলেছেন। ‘সমবায়ী’ এই শব্দের প্রয়োগের দ্বারা আকাশাদি দ্রব্যে গুণের লক্ষণের অতিব্যক্তি বারিত হয়। কারণ আকাশাদি দ্রব্য নিশ্চেষ্ট এবং ব্যাপক হওয়ায় সকল স্থাবর এবং জঙ্গম পদার্থের কারণ অতএব যদি সমবায়ী এই শব্দের প্রয়োগ না করা হত তাহলে আকাশাদি দ্রব্যে গুণের লক্ষণ প্রযোজ্য হয়ে যেত। কিন্তু সমবায়ী এই শব্দের প্রয়োগের দ্বারা আকাশাদি দ্রব্যে গুণের লক্ষণ প্রযোজ্য হয় না। যেহেতু আকাশাদি নিশ্চেষ্ট হলেও সমবায়াধেয় নয়। আকাশ সমবায়াধেয় নয় কারণ আকাশ কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না।

এখন প্রশ্ন হল গুণের লক্ষণে যে 'নিশ্চেষ্ট' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ কি? এর উত্তরে চক্রপাণি দত্ত বলেছেন—"নির্গতশ্চেষ্টায়াঃ নিশ্চেষ্ট, চেষ্টানিগত্যা চেহ চেষ্টাশূন্যত্বং, তথা চেষ্টাব্যতিরিক্তত্বঞ্চোচ্যতে।"[২] 'নিশ্চেষ্ট' এই শব্দের অর্থ হল চেষ্টা শূন্যত্ব বা চেষ্টা রহিতত্ব। গুণের লক্ষণে 'নিশ্চেষ্ট' এই শব্দ প্রয়োগের দ্বারা গুণকে কর্ম থেকে পৃথক করা হয়েছে। কারণ কর্ম ও গুণের মতই দ্রব্যাশ্রিত। কিন্তু গুণ চেষ্টা রহিত হয়, এবং কর্ম চেষ্টা যুক্ত হয়। এখানে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে চেষ্টার সঙ্গে কর্মের কিরূপ সম্পর্ক? এর উত্তরে বলা হয় যে চেষ্টা ও কর্ম ক্ষেত্র বিশেষে অভিন্ন। কিন্তু যেকোন চেষ্টাকেই কর্ম বলা যায় না। কেবলমাত্র সেই চেষ্টাকেই কর্ম বলতে পারি যে চেষ্টা প্রযত্ন, জীবন যোনি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ হয়।[৩]

যা শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে ক্রিয়াকে সম্পন্ন করে তাকে প্রবৃত্তি বলা হয়। শরীরের সঙ্গে প্রবৃত্তির একটি নিবিড় সম্বন্ধ আছে, কারণ শরীর না থাকলে প্রবৃত্তি হতে পারে না। এই প্রবৃত্তিকে শারীরিক প্রবৃত্তি বলা হয়। প্রবৃত্তি মূলত দুই প্রকার—মানসিক প্রবৃত্তি ও শারীরিক প্রবৃত্তি।

গুণের লক্ষণটিতে 'কারণ' শব্দের ব্যবহার কার হয়েছে। প্রশ্ন হল এই শব্দের ব্যবহার লক্ষণে কেন করা হল? অর্থাৎ গুণকে কারণ বলা হলেও তাকে কেমন কারণ বলা হবে, তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। গুণকে 'কারণ' বলা হল কেননা যখন কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্যকে গ্রহণ করে তখন তিনি দ্রব্যের গুণ দেখেই

দ্রব্যের গ্রহণ করে থাকেন। তাই দ্রব্যের গ্রহণের হেতু রূপে গুণকে স্বীকার করা হয়েছে। যেমন যখন কোন ব্যক্তি কোন পুষ্পকে গ্রহণ করে তখন তিনি সেই পুষ্পের রূপ এবং গন্ধ দেখেই গ্রহণ করে থাকেন। রূপ ও গন্ধ উভয়ই গুণ। অতএব এই পুষ্পের গ্রহণের কারণ হল গুণ, ঔষধি দ্রব্য ও আহার দ্রব্য গ্রহণের সময়ও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ গুণ দ্রব্য গ্রহণের কারণ।

বৈশেষিক দর্শনে গুণের যে লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে তাহল দ্রব্যাশ্রয়ী, অগুণবান, সংযোগ ও বিভাগে অকারণ তথা অনপেক্ষ।[৪] উক্ত লক্ষণে 'দ্রব্যাশ্রয়ী' অর্থাৎ যা দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে এই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। গুণ গুণকে আশ্রয় করে থাকে না। এই একই মত আমরা চরক সংহিতাতে পেয়ে থাকি।[৫]

এখানে 'সমবায়ী' শব্দের অর্থ হল সমবায়াধেয়। এই শব্দের প্রয়োগের ফলে বিস্তৃত আর ব্যাপক আকাশাদিকে গুণের লক্ষণ থেকে পৃথক করা হয়েছে। কেননা আকাশাদি নিত্য দ্রব্য সমবায় সম্বন্ধে কোথাও থাকে না। 'কারণ' শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে অকারণ যে সকল পদার্থ অর্থাৎ সামান্য বিশেষ এবং সমবায় তাদেরকে গুণ থেকে পৃথক করা হয়েছে। যেহেতু তারা অকারণ। কিন্তু চরকসংহিতায় যখন সামান্য ও বিশেষের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তখন কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে সেখানে বলা হয়েছে যার দ্বারা বৃদ্ধি হয় তা সামান্য এবং যার দ্বারা হ্রাস হয় তা বিশেষ, অর্থাৎ এরা যথাক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাসের হেতু, চরক সংহিতায় কারণের লক্ষণ

প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যা কার্য মাত্রেই হেতু তা কারণ। এই অর্থে সামান্য ও বিশেষও কারণ। তাহলে 'কারণ' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা গুণের লক্ষণ থেকে এদের ব্যবৃত্তি কিভাবে সম্ভব হল এই প্রশ্ন ওঠে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বলা হয় এখানে বিশেষ অর্থে কারণকে স্বীকার করা হয়নি, গুণ দ্রব্য গ্রহণের কারণ এই অর্থে 'কারণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

গুণ দ্রব্যে আশ্রিত কিন্তু নির্গুণ। একটি গুণে অন্য গুণ থাকে না। কিন্তু আপত্তি হতে পারে যে মধুররসে তো স্নিগ্ধ, গুরু আদি গুণ থাকে, তাহলে বলতে হয় গুণের মধ্যে গুণ থাকে। এই আপত্তির উত্তরে বলা হয়—মধুররসে যে শীত, স্নিগ্ধ, গুরু আদি গুণ থাকে তার দ্বারা এটা বোঝা উচিত নয় যে গুণের মধ্যেই গুণ থাকে। প্রকৃত পক্ষে এই গুণ গুলি দ্রব্যেরই গুণ। কেননা গুণ দ্রব্যকেই আশ্রয় করে থাকে। যদি দ্রব্যের গুণকে মধুরাদি রসের গুণ বলা হয় তাহলে তার বিশেষ কোনও কারণ আছে। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে এই বিশেষ কারণটি কি? এর উত্তরে বলা যায় কোন দ্রব্যের সম্পর্কে যদি এইটুকুই জ্ঞান হয় যে সেটা মধুর গুণ বিশিষ্ট তাহলে তাতে যে স্নিগ্ধ, শীত আর গুরু গুণ আছে সেটা বলার অবকাশ থাকে না। অর্থাৎ কোন দ্রব্য মধুর রস বিশিষ্ট এই জ্ঞান হলেই সেই বস্তুটা যে স্নিগ্ধ, শীত এবং গুরু গুণ বিশিষ্ট হবে তার জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে যায়। এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে মধুররসের সঙ্গে অন্যান্য গুণ গুলির কি আবশ্যিক সম্বন্ধে আছে? উত্তরে বলা হয় হ্যাঁ। কারণ মধুর রস থাকার ফলে দ্রব্যে মধ্যে শীত, স্নিগ্ধ, গুরু ইত্যাদি গুণের

অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং যে দ্রব্যে মধুররস আছে তা আবশ্যিক ভাবে শীত, স্নিগ্ধ, গুরু গুণ যুক্ত।

গুণের বিভাগঃ

ন্যায় দর্শন ২৪ প্রকার গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে শরীর রচনা, ক্রিয়া তথা চিকিৎসার সুবিধা এবং উপযোগিতার কথা স্মরণ করে ৪১ প্রকার গুণের কথা স্বীকার করা হয়েছে।[৬]

আয়ুর্বেদে যে ৪১ প্রকার গুণের কথা স্বীকার করা হয়েছে সেগুলি হল— ইন্দ্রিয় গুণ—এরা সংখ্যায় পাঁচটি—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এই গুণ গুলিকে আবার বিশেষ গুণও বলা হয়। এখন প্রশ্ন হল এই গুণ গুলিকে কেন বিশেষ গুণ বলা হয়? তার উত্তরে বলা যায় এই গুণগুলি পঞ্চমহাভূতের গুণ। পঞ্চমহাভূতের মধ্যে প্রথম মহাভূত আকাশ। এই মহাভূত কেবল শব্দ গুণ বিশিষ্ট, বায়ু মহাভূত—শব্দ ও স্পর্শ উভয় গুণ বিশিষ্ট, অগ্নি মহাভূত—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিন গুণ বিশিষ্ট, জল মহাভূত—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই চারটি গুণ বিশিষ্ট এবং ক্ষিতি মহাভূত—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি গুণ বিশিষ্ট।[৭]

শারীরিক গুণঃ

গুরু, লঘু, মন্দ, তীক্ষ্ণ, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ, রুক্ষ, খর, সান্দ্র, দ্রব, মৃদু, কঠিন, স্থির, সর, সূক্ষ্ম, স্থুল, বিশদ, পিচ্ছিল। এই ২০ প্রকার গুণকে শারীরিক গুণ বলা

হয়। এই গুণকে আবার গুর্বাদি গুণও বলা হয়। এই গুণের প্রারম্ভ গুরু গুণ দিয়ে করা হয়, এই কারণে এই গুণ গুলিকে গুর্বাদি গুণ বলা হয়। পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতে এই গুণগুলি সামান্যত থাকে তাই চরক সংহিতার সূত্রস্থানে এই গুণ গুলিকে সামান্য গুণও বলা হয়েছে। কবিরাজ গঙ্গাধর এই গুণ গুলিকে শারীরিক চিকিৎসার জন্য সর্বাধিক আবশ্যক এবং উপযোগী বলেছেন। কারণ আমাদের শরীর পাঞ্চভৌতিক এবং ঔষধি দ্রব্য পাঞ্চভৌতিক। তাই এই গুণ গুলিকে শারীরিক গুণও বলা হয়।[৮]

পরাদি গুণ:

পর, অপর, যুক্তি, সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, পৃথকত্ব, পরিমাণ, সংস্কার এবং অভ্যাস এই গুণ গুলিকে পরাদি গুণ বলা হয়। পর গুণের বর্ণনা দিয়ে শুরু হওয়ার কারণে এই গুণের প্রকারকে পরাদি গুণ বলা হয়।[৯]

আধ্যাত্মিক গুণ:

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন এই ছয়টিকে আধ্যাত্মিক গুণ বলা হয়।[১০] প্রশ্ন হল আধ্যাত্মিক গুণ কাকে বলে? উত্তরে বলা যায় জীবাত্মাতে অনুভূত হয় যে গুণ তাকে আধ্যাত্মিক গুণ বলা হয়। বুদ্ধি আদি গুণ মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। আর এই অনুসারে ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান, দুঃখী, সুখী ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হল আয়ুর্বেদে ৪১ প্রকার গুণের কথা কেন স্বীকার করা হয়েছে? ন্যায়সম্মত ২৪ প্রকার গুণ স্বীকার করলেই কি হত না? আয়ুর্বেদীয় ৪১

প্রকার গুণকে কি ন্যায়সম্মত ২৪ প্রকার গুণে অন্তর্গত করা যায়? যদি করা যায় তাহলে কী কারণে আয়ুর্বেদে তাদের অতিরিক্ত গুণ বলে স্বীকার করা হয়েছে কেন?

আয়ুর্বেদে যে বিশেষ গুণকে স্বীকার করা হয়েছে ন্যায় দর্শনেও সেই বিশেষ গুণগুলিকে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু পরাদি যে গুণগুলি আয়ুর্বেদে স্বীকার করা হয়েছে তার মধ্যে যুক্তি নামক গুণটিকে ন্যায় দর্শনে পৃথক গুণ হিসাবে স্বীকার করা হয়নি। এই গুণটিকে সংযোগ নামক গুণের অন্তর্গত করা হয়েছে। এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যুক্তির তাৎপর্য হল যোজনা। যা যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সম্বন্ধিত। অতএব যুক্তি গুণটিকে সংযোগ গুণের অন্তর্গত করা যায়। পরাদি গুণের মধ্যে যে অভ্যাস নামক গুণের কথা স্বীকার করা হয়েছে ন্যায় দর্শনে এই অভ্যাস গুণকে সংস্কার গুণের অন্তর্গত করা হয়েছে। কারণ অভ্যাসের দ্বারা গুণাধান বা গুণ প্রাপ্তিকে বোঝানো হয়। সংস্কারের দ্বারা পরিবর্তিত গুণের প্রাপ্তিকে বোঝায় অতএব অভ্যাস গুণকে সংস্কার গুণের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই কারণ ন্যায় দর্শনে অভ্যাস নামক পৃথক গুণের কথা স্বীকার করা হয়নি। গুর্বাদি যে ২০ প্রকার গুণের কথা স্বীকার করা হয়েছে তার মধ্যে গুরু গুণকে ন্যায়সম্মত গুরুত্ব গুণে, দ্রব গুণকে দ্রব্যত্ব গুণে এবং স্নেহ গুণকে স্নেহত্ব গুণে অন্তর্গত করা হয়েছে। এছাড়া বাদ বাকি যে সকল শারীরিক গুণ আছে তাদেরকে ধর্ম এবং সংস্কার গুণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শারীরিক গুণ দুই প্রকার (১) স্বভাবসিদ্ধ, (২) নৈমিত্তিক কারণ যুক্ত

শারীরিক গুণ। স্বভাবসিদ্ধ গুণকে বস্তুর ধর্ম বলা হয় অর্থাৎ এই সকল গুণকে ন্যায় সম্মত ধর্ম নামক গুণে অন্তর্গত করা হয়েছে। এই গুণগুলি হল—লঘু, শীত ও উষ্ণ। অপরদিকে—নৈমিত্তিক কারণ যুক্ত শারীরিক গুণকে সংস্কার নামক গুণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গুণগুলি হল—সর, মৃদু, কঠিন, মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিশাদ, পিচ্ছিল, শ্লক্ষ্ম, খর, স্থূল, সুক্ষ্ম, সান্দ্র। অতএব আয়ুর্বেদে সকল প্রকার শারীরিক গুণকে ন্যায়সম্মত ধর্ম এবং সংস্কার নামক গুণে অন্তর্গত করা হয়েছে। এই ভাবে আয়ুর্বেদের ৪১ প্রকার গুণকে ন্যায়সম্মত ২৪ প্রকার গুণে অন্তর্গত করা হয়।

এখন প্রশ্ন হল আয়ুর্বেদসম্মত ৪১ প্রকার গুণকে ন্যায়সম্মত ২৪ প্রকার গুণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে আয়ুর্বেদে ৪১ প্রকার গুণ স্বীকার করার যৌক্তিকতা কোথায়? পূর্বে উত্থাপিত উক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে প্রত্যকটা গুণের স্বরূপ এবং গুরুত্ব, আয়ুর্বেদে তাদের উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। অতএব আমরা এখন প্রত্যকটা গুণের স্বরূপ ও উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করব।

শব্দ গুণ:

যা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং আকাশ মহাভূতের বিশেষ গুণ তাই হল শব্দ। কেবল শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারাই সরাসরি এই গুণ গ্রহণ সম্ভব।[১১] শব্দ দুই প্রকার ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক।[১২]

এখন প্রশ্ন হল কেন চিকিৎসাশাস্ত্রে শব্দকে গুণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। তার উত্তরে বলা হয় বর্ণ এবং ধ্বনি দুই প্রকার শব্দই চিকিৎসাবিজ্ঞানে

ব্যাপক ভাবে উপযোগী। রোগীর রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের প্রশ্নের উত্তর রোগী শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করে থাকে এখানে শব্দ প্রাকৃত এবং বিকৃত দুই প্রকারেই হতে পারে। বিকার যুক্ত শব্দ এবং মিম্মিনাদি স্বরোৎপত্তির দ্বারা স্বর যন্ত্র তথা অন্য শারীরিক ব্যাধির নিদান করা হয়ে থাকে। শরীরের শ্বাসযন্ত্র তথা হৃদয়ের গতির সূচনা ও ধ্বনির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। স্টেথিস্কোপ এবং অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি গ্রহণ করে হৃদয় এবং ফুসফুসের প্রাকৃত এবং বিকৃত ধ্বনির জ্ঞান অর্জন করে রোগ নিদান করা হয়।

স্পর্শ গুণ:

যে গুণের গ্রহণ কেবলমাত্র স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়ে থাকে তাকে স্পর্শ বলা হয়।[১৩] এই গুণ স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আর অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না, এই গুণের সহকারী হল ত্বক। স্পর্শ তিন প্রকার হয় শীত স্পর্শ, উষ্ণ স্পর্শ এবং অনুষ্ণ-শীত স্পর্শ। এদের মধ্যে শীত স্পর্শ জল মহাভূতে থাকে। উষ্ণ স্পর্শ অগ্নি মহাভূতে থাকে, তথা অনুষ্ণ শীত স্পর্শ বায়ু এবং পৃথিবী এই দুই মহাভূতে থাকে। স্পর্শ গুণের কারণে ইন্দ্রিয় নিজ বিষয় গ্রহণ করে থাকে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে মনের দূরবর্ত্তী বিষয়ের গ্রহণ কিভাবে হতে পারে? তার উত্তরে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে স্পর্শের বিদ্যমানতা মনেই থাকে। মনের সংযোগ যখন বিষয়ের সঙ্গে হয় তখন তাকে মনো স্পর্শ বা মানস স্পর্শ বলা হয়। ত্বক সর্বশরীরে ব্যাপ্ত। যেকোন প্রত্যক্ষে মনোসংযোগ কারণ এবং মনের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধিত হওয়ার কারণে অন্য ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের বিষয়ের জ্ঞান স্পর্শের মাধ্যমে হয়ে থাকে।[১৪]

স্পর্শের তাৎপর্য হল সম্বন্ধ বা সংযোগ। যেমন লোক ব্যবহারে দেখা যায় মূর্ত বা অমূর্ত দ্রব্যের সংযোগ হওয়াকেই স্পর্শ বলা হয়। লোক ভাষায় স্পর্শ বলতে কোন কিছু ছোঁয়াকে বোঝায়। স্পর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বস্তুর সংযোগ হয় যেখানে দুটি বস্তুর সংযোগ হয় সেখানেই স্পর্শ হয়। একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর যখন সংযোগ হয় তখন একটি বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সেই সংযোগ স্পর্শকে আশ্রয় করেই হয়ে থাকে। শরীরে বাহ্য জগতের যে বিভিন্ন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্পর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারাই গ্রহণ হয়ে থাকে। স্পর্শ গুণের দ্বারাই স্পর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যাপকতা দেখানো হয়েছে।

রূপ:

"চক্ষুর্মাত্র গ্রাহ্যো গুণোরূপম্।" অর্থাৎ কেবল চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য গুণকে রূপ বলা হয়।[১৫] উক্ত লক্ষণে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য গুণকে রূপ বলায় এই লক্ষণের রসাদি গুণে অতিব্যাপ্তি বারিত হয়। কিন্তু এখানে যদি 'মাত্র' শব্দের অর্থ কেবলমাত্র চক্ষু ইন্দ্রিয়কে বোঝানো হয় তাহলে রূপের লক্ষণে অসম্ভব দোষ দেখা দেবে, কারণ কোন রূপই কেবল মাত্র চক্ষুর দ্বারা হয় না। তার জন্য যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দরকার হয় তেমনি আত্মা, আত্মমনঃসংযোগ ইত্যাদি কারণেরও দরকার হয়। অতএব এখানে মাত্র শব্দের দ্বারা এটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে-যে গুণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত, অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না তাকে রূপ বলা হয়।

উক্ত লক্ষণে যদি গুণ শব্দের সন্নিবেশ না করা হত তাহলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি হত। কারণ রূপ যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হয় তেমনই রূপত্ব জাতি, রূপত্ব ব্যাপ্য নীলত্ব আদি জাতিরও গ্রহণ হয়। এই রূপত্ব আদি জাতিতে রূপের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বরণের জন্য গুণ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। রূপত্ব আদিজাতি চক্ষুর দ্বারা গ্রাহ্য হলেও তা গুণ নয়। অতএব গুণ শব্দের ব্যবহারের দ্বারা এই অতিব্যাপ্তি বারিত হয়।

এখন প্রশ্ন হল রূপকে চিকিৎসা শাস্ত্রে গুণ বলে স্বীকার করা হয়েছে কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে রূপ শব্দের দ্বারা সাধারণত কোন বস্তুর আকার বা তার বর্ণের গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কেবল চক্ষু দ্বারা গ্রাহ্য হওয়ার কারণে এখানে রূপ গুণের দ্বারা বর্ণই অভীষ্ট। চিকিৎসার ক্ষেত্রে চোখ, ত্বক, চুল, নখ ইত্যাদির বর্ণের দ্বারাই রোগের বর্ণনা করা হয়ে থাকে। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও তারা সহায়ক। শরীরের নীল, তাম্র এবং শুক্ল বর্ণকে বৈকারিক বলা হয়।[১৬]

প্রাকৃত এবং বিকৃত বর্ণের এক সঙ্গে উপস্থিতি সদ্য মৃত্যুর আভাস দিয়ে থাকে। রক্ত অল্পতা, পাণ্ডু, কুষ্ঠ বিভিন্ন প্রকারের রোগের ক্ষেত্রে ত্বক এর বর্ণ তথা মল, মূত্রের বর্ণও বিভিন্ন রোগের নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুদ্ধাশুদ্ধ রক্ত আদির জ্ঞান তার বর্ণের দ্বারাই করা হয়ে থাকে। রক্তের মধ্যে হিমোগ্লোবিন এর মাত্রার নির্ধারণ ও রক্তের বর্ণের দ্বারা করা যেতে পারে। কোন অঙ্গের বর্ণ যদি বিবর্ণ হয় তাহলে ওই স্থানে বা শরীরে বিকৃতির আভাস প্রকাশ

করে। রূপ গ্রহণকারী যে দৃষ্টি বা সংবেদন সেটার উপর মানুষ সব থেকে বেশী নির্ভরশীল। কারণ রোগ নির্ণয় করার যে তিনটি সাধন-দর্শন, স্পর্শ এবং প্রশ্ন তার মধ্যে দর্শনের গুরুত্ব সব থেকে বেশী।

রসগুণ:

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে রস শব্দের প্রয়োগ বিভিন্ন অর্থে করা হয়েছে। সুশ্রুত সংহিতায় শরীরের প্রথম ধাতুকে রস বলা হয়েছে।[১৭] রসধাতু গমনার্থক। যে ধাতু অহরহ গমন বা সঞ্চরণ করে তাকে রস বলা হয়।

আবার চরক সংহিতায় রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণকেই রস বলা হয়।[১৮] চক্রপাণি দত্ত তার আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকায় বলেছেন যে "রস্যত আস্বাদ্যত ইতিরসঃ।" অর্থাৎ রসনা বা জিহ্বার দ্বারা যার আস্বাদন করা হয় তাকে রস বলা হয়।[১৯]

এই প্রকার রস এক হওয়া সত্ত্বেও তার নানা অর্থ আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু গুণের আলোচনার ক্ষেত্রে রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা যার গ্রহণ হয় তাই রস, এই অর্থই বিবেক্ষিত। জল, পৃথিবী হল রসের সমবায়িকারণ, এবং রসের উৎপত্তির ক্ষেত্রে তথা তার মধুরাদি যে ভেদ সে ক্ষেত্রে আকাশ, বায়ু এবং তেজ এই তিনটি মহাভূত হল নিমিত্ত কারণ।

রস সম্পর্কে মহর্ষি চরকের মতের সাথে ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের মতের মিল লক্ষ্য করা যায়। কারণ আমরা দেখি অন্নংভট্ট তার তর্কসংগ্রহে বলেছেন

রসনেন্দ্রিয়ে দ্বারা সেই গুণের গ্রহণ করা যায় সেই গুণকে রস বলে।[২০] রস ছয় প্রকার সেগুলি হল—মধুর, অম্ল, লবন, কটু, তিক্ত এবং কষায়। রসনামক গুণ পৃথিবী, এবং জল মহাভূতে থাকে। পৃথিবী মহাভূতে ছয় প্রকার রসই থাকে কিন্তু জলমহাভূতে কেবল মধুর নামক রসই থাকে।[২১]

চরকসংহিতায় রসের উৎপত্তি বিষয়ে বলা হয়েছে—অন্তরীক্ষপ্রভব, জল সৌম্য এর প্রকৃতি শীতল লঘু ও অব্যক্ত রসবিশিষ্ট অর্থাৎ জলে অম্ল, মধুরাদি কোন রস অনুভব হয় না। এটা প্রথমে আকাশ থেকে নিপতিত হয়ে পঞ্চমহাভূতের গুণ বিশিষ্ট হয়ে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সমূহের দেহ পরিতৃপ্ত করে এবং ঐ সমুদয় মূর্তিতে মধুরাদি ছয় রসের প্রকাশ পায়।

এখন আমরা মধুরাদি যে ছয় প্রকার রসের কথা স্বীকার করা হয়েছে তার প্রকৃতি বর্ণনা করব—

মধুররসঃ

এই রস গুড়, চিনি, দুধ, জল ইত্যাদিতে থাকে। পৃথিবী এবং অপ্ মহাভূতে এই রসের আধিক্য পাওয়া যায়। এই রস ধাতুবর্ধক, আয়ুবর্ধক তা প্রসন্নতা প্রদান করে এবং জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। এই রসের অধিকমাত্রায় সেবনের ফলে কফ দোষের বৃদ্ধি হয়। স্থুলতা, আলস্য, নিদ্রা ইত্যাদি কফজ বিকার উৎপন্ন হয়। এটি বাত দোষ এবং পিত্ত দোষের শমণে সক্ষম এবং কফ বৃদ্ধি কারক।[২২]

অম্লরসঃ

এই রস লেবু, আম, তেঁতুল ইত্যাদি দ্রব্যে পাওয়া যায়। পৃথিবী এবং অগ্নি মহাভূতে এই রসের প্রাধান্য থাকে। এই রস অগ্নি বর্ধক, রুচিকর, লঘু এবং উষ্ণ আদি গুণ যুক্ত। এই রসের অতিরিক্ত সেবনে দন্তহর্ষ এবং পিপাসা বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কফ পাতলা হয় এবং পিত্তদোষ বৃদ্ধি পায়।[২৩]

লবণরসঃ

সৈন্ধব বা কালো নুন আদি লবণ হল এই রসের উদাহরণ। জল এবং অগ্নি মহাভূতের আধিক্য এই রসে দেখা যায়। লবণরস পাচনের সহায়ক। এই রস রুচি বৃদ্ধি করে। এই রস উষ্ণ, বাত নাশক, পিত্ত বর্ধক। এই রসের অতিরিক্ত সেবনের ফলে পিপাসা বৃদ্ধি পায়। এটি পুরুষত্ব শক্তির নাশক এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাস কারক।

কটুরসঃ

কালোমরিচ ইত্যাদি হল এই রসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই রস রসনেন্দ্রিয়ের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ফলে জিহ্বাকে উদ্বিগ্ন করে। যা মুখ, চোখ, নাকে প্রবেশ করলে জল নির্গত করে। এই রস মুখকে শুদ্ধ করে, ইন্দ্রিয়কে স্বচ্ছ করে। এই রস লঘু, রুক্ষ্ম, উষ্ণ গুণ যুক্ত, পিত্ত এবং বাত বর্ধক এবং কফনাশক। এই রসের অতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে রসগ্লানি, শিথিলতা, মোহ, মূর্চ্ছা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। বায়ু এবং অগ্নি মহাভূতে এই রসের আধিক্য পাওয়া যায়।

তিক্তরস:

নিম, করলা, চিরতা ইত্যাদি হল এই রসের উদাহরণ। এই রস রসনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই অন্য রসের গ্রহণের ক্ষমতা নাশ করে। যা মুখকে বিশাদ করে দেয়, মুখকে শুষ্ক করে দেয় তাই হল তিক্তরস। এই রসের আধিক্য বায়ু এবং আকাশ মহাভূতে পাওয়া যায়। এই রস বিষ এবং কৃমি নাশক।[২৪]

কষায় রস:

বাবুল ইত্যাদি হল কষায় রসের উদাহরণ। যে রস রসনেন্দ্রিয় বা জিহ্বাকে বিশাদতা এবং জড়তা প্রদান করে তাকে কষায় রস বলা হয়। এই রসের প্রাধান্য মূলত বায়ু এবং পৃথিবী মহাভূতে দেখা যায়। এই রস বাত দোষের বর্ধক এবং কফ দোষের শামক। এই রসের অধিক সেবনের ফলে মুখ শুকনো এবং হৃদয় পীড়ন হতে পারে। এই রসের মূল উপযোগিতা হল এই রস শরীরের ক্লান্তি নাশ করে এবং মল-মূত্রকে আটকাতে সাহায্য করে।

রস পাঞ্চভৌতিক, পঞ্চমহাভূতের সংগঠনের ন্যুনাধিকতার কারণে মধুর অম্ল আদি রস ভিন্ন ভিন্ন গুণ এবং কর্মের সাথে যুক্ত হয় মহাভূতের ন্যুনাধিক্য ঋতু অনুসারে হয়ে থকে।[২৫] যেমন—

ঋতু	মহাভূতাধিক্য	রস
১। শীত	বায়ু এবং আকাশ	তিক্ত
২। বসন্ত	বায়ু এবং পৃথিবী	কষায়

৩। গ্রীষ্ম	বায়ু এবং অগ্নি	কটু
৪। বর্ষা	পৃথিবী এবং অগ্নি	অম্ল
৫। শরৎ	জল এবং অগ্নি	লবন
৬। হেমন্ত	পৃথিবী এবং জল	মধুর

রসগুণের উপযোগিতা:

আয়ুর্বেদ সম্মত চিকিৎসায় রস গুণের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। আয়ুর্বেদে কোন রস বলবৃদ্ধি কারক তার চর্চা করা হয়। রোগীকে সুস্থ করার জন্য, চরক সংহিতায় ইন্দ্রিয় স্থানে রসের আলোচনা পূর্বক রসের গুরুত্ব খ্যাপন করা হয়েছে। স্পর্শ, শব্দ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচ বিশেষ গুণের মধ্যে রস গুণকেই আয়ুর্বেদে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ দ্রব্যের পরীক্ষা মূলত তার রস জ্ঞানের দ্বারাই করা হয়ে থাকে। সুশ্রুত সংহিতায় তথা চরক সংহিতায় রসগুণের উপর নির্ভর করে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সামগ্রী বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্রব্যের বীর্য, বিপাক, আদি জ্ঞান রসের দ্বারাই হয়ে থাকে। অতএব রস নির্দেশে দ্রব্যের গুণ আদির জ্ঞানও হয়ে থাকে। চরকসংহিতায় বলা হয়ে রসের উল্লেখের দ্বারা দ্রব্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান হয়ে থাকে। এই কারণে শ্রেষ্ঠ বৈদ্য তাকে বলা হয়েছে যার রস সম্পর্কে জ্ঞান আছে।

গন্ধ গুণ:

"ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণোগন্ধ" অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য গুণ বিশেষকে গন্ধ বলা হয়। রূপাদি গুণে অতিব্যাপ্তি নিরাকরণের জন্য যা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য তাকেই গন্ধ গুণ বলা হয়েছে। গন্ধ গুণ বায়ুতে প্রতীতি হলেও পৃথিবীই গন্ধের কারণ, বায়ু কারণ নয়। গন্ধের দুটি ভেদ স্বীকার করা হয়েছে—একটি হল সুরভি এবং অন্যটি হল অসুরভি। সুগন্ধ সুখ উৎপন্ন করে রুচি উৎপন্ন করে। দুর্গন্ধ ঠিক এর বিপরীত এটি অরুচি উৎপন্ন করে।

অন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মত গন্ধ গুণ গ্রহণ করার শক্তি কেবলমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরই আছে। আমরা জানি যে অনেক দ্রব্য যেমন কোরোসিন, পেট্রল ইত্যাদি চেনার জন্য গন্ধ গুণের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্পুর, চন্দন, অশ্বগন্ধা ইত্যাদি যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে উপযোগী এমন দ্রব্যের জ্ঞান গন্ধের মাধ্যমে হয়। পুরুষের মূত্র ও মলের প্রকৃতি অবস্থায় বিশেষ গন্ধ থাকে। বিকৃত অবস্থায় তাদের গন্ধের পরিবর্তন হয়। এই জ্ঞান বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক। চরক সংহিতায় বলা হয়েছে রোগীর সাধ্যাসাধ্যতা তথা মৃত্যুর নিশ্চয় করার ক্ষেত্রেও গন্ধ গুণের ভূমিকা প্রদর্শন করা হয়েছে। বলা হয় যদি কোন রোগী সুগন্ধ তথা দুর্গন্ধের মধ্যে অন্তর করতে না পারে বা কোন প্রকার গন্ধ গ্রহণ করতে না পারে তা তার মৃত্যুর সম্ভাবনা সূচনা করে।

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে সুগন্ধিকারক দ্রব্য অরুচিকে নাশ করে রুচি উৎপন্ন করে, বিভিন্ন উদ্বেগকে শান্ত করে, সুখপ্রদান করে। এই প্রকার যখন কোন রোগীর সংজ্ঞাহীনতা রোগ দেখা দেয়, তখন তার সংজ্ঞা ফেরানোর জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের প্রয়োগ করা হয়। সেক্ষেত্রে গন্ধ গুণকে কাজে লাগিয়েই তার আরোগ্য সাধন করা হয়। অতএব এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় গন্ধ গুণের উপযোগিতা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বুদ্ধি, ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ দুঃখ এবং প্রযত্ন এই ছয়টি গুণকে আধ্যাত্মিক গুণ নামে অবিহিত করা হয়। চক্রপাণি দত্ত এই গুণগুলিকে আত্মগুণ বলেছেন; প্রশ্ন হল কেন এই গুণগুলিকে আধ্যাত্মিক গুণ বলা হল? উত্তরে বলা যায় চরক সংহিতায় আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলা হয়েছে। অতএব এই গুণগুলি আত্মদ্রব্যের গুণ হওয়ার কারণে এই গুণগুলিকে আধ্যাত্মিক গুণ বলা হয়।

বুদ্ধিঃ

আধ্যাত্মিক গুণের মধ্যে যে গুণের উল্লেখ প্রথমে করা হয়েছে তাহল বুদ্ধি। বুদ্ধি প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদে বলা হয় যখন আত্মা মনের সঙ্গে, মন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তথা ইন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয় তখন যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। একেই বুদ্ধি বলা হয়।[২৬] বুদ্ধির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যেমন করে একটি আঙ্গুলের সঙ্গে অন্য আঙ্গুলের সংযোগ করে কোন কিছু তোলা যায়

বা বীণার তারের সঙ্গে নখের সংযোগের ফলে সংগীতের উৎপত্তি হয় তেমনি আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগের ফলে বুদ্ধির উৎপত্তি হয়।[২৭]

আয়ুর্বেদে ছয় প্রকার বুদ্ধির কথা স্বীকার করা হয়েছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাকে ইন্দ্রিয় বুদ্ধি বলা হয় এবং মনের দ্বারা প্রাপ্ত যে বুদ্ধি তাকে মনোভাবা বুদ্ধি বলা হয়। এই ভাবে যে ছয় প্রকার বুদ্ধির কথা স্বীকার করা হয়েছে তাহল শ্রোত্রেন্দ্রিয় বুদ্ধি, স্পর্শনেন্দ্রিয় বুদ্ধি, চক্ষুরীন্দ্রিয় বুদ্ধি, রসনেন্দ্রিয় বুদ্ধি, ঘ্রাণজ বুদ্ধি এবং মনোভবা বুদ্ধি।[২৮]

ইচ্ছাঃ

নিজের জন্য অথবা অন্য কারোর অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য যে প্রার্থনা তাকে ইচ্ছা বলা হয়। এখানে প্রার্থনা বলতে বোঝায় চাওয়া। ইচ্ছার উৎপত্তিতে আত্মা এবং মনের সংযোগের কথা স্বীকার করা হয়। কিন্তু কেবল আত্মা এবং মন নয়, সুখ, এবং স্মৃতির কথাও স্বীকার করা হয়েছে ইচ্ছা উৎপত্তির ক্ষেত্রে। কারণ কোন বিষয় আমাদের সুখ দিলে আমরা সেটাকে পুনরায় পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করি। এই সংসারে প্রত্যক প্রাণীর প্রত্যক প্রবৃত্তিই সুখের কারণেই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির যে বিষয়ের দ্বারা সুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে সেই ব্যক্তির সেই বিষয়টি প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে। যেমন—কোন ব্যক্তি অর্থকে, কোন ব্যক্তি ভোজনকে, কোন ব্যক্তি সঙ্গীতকে, কোন ব্যক্তি কোন কিছু দর্শনীয় বিষয়কে সুখ সাধন মনে করে এবং সেগুলিকে পেতে চায়। এই প্রকার কোন জ্ঞানী ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যুকে সমস্ত দুঃখের কারণ মনে

করেন এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মোক্ষ কামনা করেন। এখনে প্রশ্ন হতে পারে যে ইচ্ছা উৎপত্তির ক্ষেত্রে স্মৃতির ভূমিকা কোথায়? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, পূর্বে যে বিষয়প্রাপ্তির জন্য সুখ উৎপন্ন হয়েছে সেই সকল বস্তুর বার বার স্মরণে আনার কারণেই সেই বিষয়গুলিকে পাওয়ার ইচ্ছা হয়ে থাকে। অতএব বলা যায় ইচ্ছার উৎপত্তিতে সুখ এবং স্মৃতি সহায়ক হয়। কাম, অভিলাষা, রাগ, সংকল্প, করুণা, বৈরাগ্য, উপধা এবং ভাব এই আট ভাগে ইচ্ছাকে ভাগ করা হয়।

কাম: মৈথুনের ইচ্ছাকে কাম বলা হয়।

অভিলাষা: অব্যবহারের ইচ্ছাকে অভিলাষা বলা হয়।

রাগ: কোন বিষয়ে বার বার গ্রহণ করার ইচ্ছাকে বলা হয় রাগ।

সংকল্প: অনাসন্ন ক্রিয়াকে বলা হয় সংকল্প।

করুণা: নিজের বিষয় ছাড়া অন্য কারোর দুঃখ দূর করার জন্য যে ইচ্ছা তাকে করুণা বলা হয়।

বৈরাগ্য: যখন কোন বিষয়ে কোন দোষ দেখা যায় এবং তার জন্য তাকে ত্যাগ করার যে ইচ্ছা তাকে বলা হয় বৈরাগ্য।

উপধা: অন্য কাউকে ঠকানোর যে ইচ্ছা তাকে উপধা বলা হয়।

ভাব: অন্তর্নিগূঢ় ইচ্ছাকে ভাব বলা হয়।

দ্বেষ:

প্রশস্তপাদভাষ্য অনুসারে যে গুণের কারণে কোন ব্যক্তি নিজেকে সন্তপ্ত অনুভব

করে সেই গুণকে দ্বেষ বলা হয়। অনিষ্ট বস্তুর প্রতি যে অরুচি ভাব অনুভব হয় তাকে দ্বেষ বলা হয়।

প্রযত্ন:

প্রযত্ন আত্মার একটি বিশেষ গুণ। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির মত এই গুণও শরীরাবচ্ছেদে উৎপন্ন হয়। এই গুণের সমবায়িকারণ হল আত্মা, অসমবায়ি কারণ হল আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ, কোন বিষয়ের প্রতি দ্বেষ বা ইচ্ছা হল তার নিমিত্ত কারণ। ইচ্ছা থেকে ওই ইচ্ছার বিষয়কে প্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন উৎপন্ন হয়। আবার দ্বেষ থেকে দ্বেষের বিষয়কে পরিহারের জন্য প্রযত্ন উৎপন্ন হয়।

সুখ:

চরক সংহিতায় সুত্র স্থানে সুখ বলতে আরোগ্যকে বোঝানো হয়েছে। চরক সংহিতায় সূত্র স্থানে ৩০ নং শ্লোকে সুখের আরো স্পষ্ট বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। সেখানে বলা হয়েছে যখন প্রাণী শারীরিক বা মানসিক রোগ রোহিত থাকে সেই অবস্থাকে সুখ বলা হয়। বিশেষতঃ যখন যুবাবস্থায় থাকে প্রত্যেক কাজ করতে সমর্থ হয়, বলবীর্য ও যশের সাথে যুক্ত থাকে তাকে সুখ বলা হয়। আচার্য চরকের মতে এই সুখ মূলত লৌকিক সুখ। আচার্য চরক মূলত ধন, সম্পত্তি এবং সাধনকে লৌকিক সুখের বস্তুনিষ্ঠ মাপক বলেছেন।

চরকসংহিতার বিমান স্থানের অষ্টম অধ্যায়ে সুখের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—চিকিৎসা কার্যের ফলে সুখ প্রাপ্তি হয়, সুখের লক্ষণ হল মন, বুদ্ধি এবং

ইন্দ্রিয় তথা শরীরের তুষ্টি। এখানে তুষ্টি শব্দের অর্থ হল সম্যক রূপে তৃপ্তি। মন, শরীর ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সন্তুষ্টি হওয়াই সুখ। দর্শনশাস্ত্রে ধর্ম জন্য অনুকূল অনুভবকে সুখ বলা হয়। যা প্রতিকূল বেদনীয় তা দুঃখ। কিন্তু আয়ুর্বেদে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির তৃপ্তিকে সুখ বলা হয়। এখানে এটা স্পষ্ট করা জরুরী যে, এখানে তুষ্টি বলতে ইচ্ছা পূর্তি অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

জীবনের চারটি ঘটক, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মা। সুখের সন্দর্ভে আত্মার প্রতিনিধি বুদ্ধিকে স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রকার সম্যক তুষ্টির দ্বারা জীবন ঘটকের সামান্য স্থিতি ধরে রাখাই সুখ।

আধ্যাত্মিক সুখের লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বলেছেন যে, মোক্ষ প্রাপ্তিই হল আধ্যাত্মিক সুখ। মোক্ষে চরম দুঃখ নিবৃত্তি হয়। চরক সংহিতায় শরীর স্থানে বলা হয়েছে যখন আত্মা সকল বস্তুকে অতিক্রম করে তখন চরম সুখ লাভ করে। এই লোকগত সুখের সাধনরূপে আচার্য চরক ধর্ম, অর্থ, কামকে স্বীকার করেছেন।

দুঃখ:

দুঃখের লক্ষণ প্রসঙ্গে চরক সংহিতায় বলা হয়েছে “বিকারো দুঃখ মেব চ”, অর্থাৎ মহর্ষি চরক বিভিন্ন বিকারকেই দুঃখ বলেছেন। দুঃখ প্রসঙ্গে চরকসংহিতার সূত্র স্থানে ৩০ নং অধ্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে, “অসুখ মতো বিপর্যয়েন” অর্থাৎ যাকে সুখের লক্ষণ বলা হয়েছে ঠিক তার বিপরীত লক্ষণকে দুঃখ বলা হয়েছে। যা সুখের

সাধন সেটাই দুঃখের সাধন। যখন মনুষ্যের প্রবৃত্তি সুমার্গে হয় তখন সুখের উৎপত্তি হয় এবং যখন কুমার্গে হয় তখন দুঃখের উৎপত্তি হয়।

গুরু :

আচার্য চরক গুরু গুণকে আহারের সংঘাত রূপে স্বীকার করেছেন। সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে এই গুণের কারণে অঙ্গে গ্লানি, মলবৃদ্ধি হয়।[২৯] বৈশেষিক দর্শনে এই গুণকে স্বীকার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এই গুণের দ্বারা স্বাভাবিক পতন উৎপন্ন হয়। আয়ুর্বেদে দ্রব্য গুণ শাস্ত্রে গুরুপাক দ্রব্যকে গুরু বলা হয়েছে। পৃথিবী ও জল মহাভূতে গুরু গুণ থাকে। গুরু গুণ যুক্ত দ্রব্যের ফলে শারীরিক ক্রিয়া হ্রাস হয়। শরীরে মল বৃদ্ধি হয় কিন্তু স্নিগ্ধতা আসে। এই গুণকে বৈশেষিক দর্শনে স্বীকার করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই গুণকে 'গুরুত্ব' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

লঘু :

লঘু গুণের উল্লেখ চরক সংহিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু এই গুণের যথাযত বর্ণনা চরকসংহিতায় দেওয়া হয়নি। সুশ্রুতসংহিতায় এই গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে এই গুণ হল গুরু গুণের বিপরীত গুণ। যার ফলে শরীর পাতলা হয়। মল তথা কফের হ্রাস হয়। অঙ্গে লঘুতার অনুভব হয়, দ্রব্যের শীঘ্র পচন হয়। এই গুণ শীঘ্র কার্য সম্পন্ন করার ইচ্ছা প্রদান করে। শরীরকে দুর্বল করে এবং এই গুণযুক্ত দ্রব্যের সেবনে শরীর রোগা হয়। এই গুণে তেজ, বায়ু, আর আকাশ মহাভূতে আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।[৩০] বৈশেষিক দর্শনে এই গুণকে স্বতন্ত্র

গুণ হিসাবে স্বীকার করা হয় না। এখন প্রশ্ন হল কেন স্বতন্ত্র গুণ হিসাবে স্বীকার করা হয় না? উত্তরে বলা হয় এই গুণকে অন্য কোন গুণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার আলোচনা আমরা ন্যায় বৈশেষিক সম্মত গুণে আয়ুর্বেদীয় গুণের অন্তর্ভুক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে করেছি।

শীত:

শরীরে উষ্ণতার হ্রাস যে গুণের দ্বারা হয় তাকে শীত বলা হয়। সুশ্রুতাচার্যের মতানুসারে যার প্রয়োগের দ্বারা শরীরে প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়, পিপাসা, স্বেদ এবং দাহের শমন হয় তাকে শীত গুণ বলা হয়। দ্রব্যে জলের আধিক্য থাকার কারণে শীত গুণের উৎপত্তি হয়। এই গুণকে স্পর্শের দ্বারা জানা সম্ভব। যেমন চন্দন, পদ্ম ইত্যাদি দ্রব্যের মধ্যে উপলব্ধি গুণ। এই গুণের দ্বারা মনেও প্রসন্নতা আসে।[৩১]

উষ্ণ:

শীত গুণের বিপরীত গুণকে উষ্ণ গুণ বলা হয়। চরক এই গুণকে পিত্তের একটি লক্ষণ বলে স্বীকার করেছেন। উষ্ণ গুণযুক্ত দ্রব্যে অগ্নির আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এই গুণের কারণে শরীরে জ্বালা উৎপন্ন হয় এবং পিপাসা বৃদ্ধি পায়। এই গুণ যুক্ত দ্রব্য শরীরে সমস্ত ক্রিয়াকে তীব্র করে। এই গুণ পাচনক্রিয়া করতে সাহায্য করে।[৩২] বৈশেষিক দর্শনে উষ্ণ-শীত গুণকে স্বতন্ত্র গুণ হিসাবে স্বীকার করা হয়নি। এই গুণ গুলিকে স্পর্শ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে।

স্নিগ্ধ :

মহর্ষি চরক পিত্ত এবং কফের গুণরূপে স্নিগ্ধ গুণকে স্বীকার করেছেন।[৩৩] সুশ্রুতসংহিতা অনুসারে যার কারণে শরীরে ক্লান্তি, স্নিগ্ধতা আর মৃদুতা উৎপন্ন হয় তাকে স্নিগ্ধ গুণ বলা হয়। এই গুণ মূলত মধুর, অম্ল, আর লবণ রসের মধ্যে পাওয়া যায়। এই গুণের ফলে শরীরে বল থাকে। চক্ষু এবং স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই এই গুণকে জানা সম্ভব।

রুক্ষ:

যে গুণের কারণে শরীরে রুক্ষতা, কঠোরতা এবং শুষ্কতা উৎপন্ন হয় তাকে রুক্ষ গুণ বলা হয়। পৃথিবী ও বায়ুতে এই গুণ থাকে। মহর্ষি চরকের মতানুসারে বায়ুর গুণ হল রুক্ষ। স্নিগ্ধ গুণের বিপরীত গুণ হিসাবে এই গুণকে স্বীকার করা হয়েছে। এই গুণ বল আর বর্ণের হ্রাস করে। তথা বিশেষরূপে খরত্ব উৎপন্ন করে।[৩৪] চক্ষু ও স্পর্শেনেন্দ্রিয় দ্বারা এই গুণকে জানা যায়। কটু, তিক্ত আর কষায় রসযুক্ত দ্রব্যে এই গুণ পাওয়া যায়। এই গুণ কফ নাশক, এই গুণ গতিশীলতা হ্রাস করে। বিশেষত ঐচ্ছিক পেশীগুলিকে স্তব্ধ করে। পুষ্টি নাশ করে। বৈশেষিক দর্শণে স্নিগ্ধ ও রুক্ষ এই গুণগুলিকে স্বীকার করা হয়নি। এই দুটি গুণকে বৈশেষিক দর্শনে স্পর্শ গুণের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

শ্লক্ষ্ণ গুণ:

সুশ্রুতসংহিতা অনুসারে এই গুণ বল, কফ এবং জীবনী শক্তিকে বৃদ্ধি করে। কিন্তু এই গুণ পিচ্ছিল গুণের থেকে পৃথক। কারণ পিচ্ছিল গুণ স্নিগ্ধ হয় কিন্তু শ্লক্ষ্ণ গুণ যুক্ত দ্রব্য স্নেহ রহিত আর কঠিন হয়েও বস্তুকে চকচকে রাখে। মহর্ষি চরক এবং সুশ্রুত দুজনেই এই গুণে আকাশের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন। এই গুণের কারণেই ভগ্ন অস্থিগুলি সন্ধিবদ্ধ হয়। এই গুণ অস্থি সূত্রগুলিকে বৃদ্ধি করে সংযোজনের কাজে সাহায্য করে।[৩৫]

খর:

কর্কশ আর দুঃখ স্পর্শকে খর বল হয়। এই গুণকে বায়ুর মুখ্যগুণ বলা হয়েছে। এর দ্বারা বায়ুর বৃদ্ধি হয়। এই গুণের মুখ্য কার্য হল রুক্ষ করা। এই গুণ যুক্ত দ্রব্যের দ্বারা ধাতুর ক্ষয় এবং মল শোষন হয়।[৩৬]

স্থির:

যে গুণ গতিহীনতা এবং স্থায়িত্ব উৎপন্ন করে তাকে স্থির গুণ বলে। এই গুণ পৃথিবী মহাভূতের বিশেষ গুণ, এই গুণে মধুর, তিক্ত ও কষায় রস থাকে। চরকসংহিতায় এই গুণকে কফ ঘটক বলা হয়েছে। এই গুণ সপ্ত ধাতুর যথাযথ মাত্রা সংরক্ষণ করে অর্থাৎ ধাতুর বৃদ্ধি থাকলে হ্রাস করে এবং ধাতুর হ্রাস হলে তাকে বৃদ্ধি করে। মল এবং মলগত বায়ুকে অবরুদ্ধ করে।

সর :

যে গুণের দ্বারা বায়ু এবং মলের প্রবৃত্তি হয় তাকে সর গুণ বলা হয়। এই গুণ ধাতুকে গতিশীল করে এবং তা বাতবর্দ্ধক। বায়ু এবং অগ্নি মহাভূতে এই গুণ পাওয়া যায়। অম্ল, লবণ তথা কটু রসে এই গুণ পাওয়া যায়। এই গুণের কারণেই মল ঢিলা হয়ে বাইরে নির্গত হতে পারে। মহর্ষি চরক সর গুণকে পিত্তের একটি ঘটক বলেছেন।

বিশদ:

যে গুণ পিচ্ছিলতা নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে তাকে বিশদ গুণ বলা হয়। এর মুখ্য কার্য হল দোষের নিষ্কাশন করা। সুশ্রুতসংহিতার মতানুসারে তা শরীরগত ক্লেদের শোষণ করে শরীরকে নির্মলতা প্রদান করে, চক্ষু এবং স্পর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা এই গুণকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই গুণ হল বায়ুর ঘটক।

পিচ্ছিল :

যে গুণ শরীরে গিয়ে শরীরের লেপনকার্য করে সেই গুণকে বলা হয় পিচ্ছিল গুণ। এই গুণ বল, গুরুতা ও কফ বৃদ্ধি কারক। এই গুণকে চক্ষু ও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানা যায়। অপ মহাভূতে এই গুণের প্রাধান্য দেখা যায়। এই গুণ ধাতুর আবরণ করে শরীরস্থ ধাতুর বৃদ্ধি করে।

স্থূল :

যে গুণের জন্য দেহে স্থূলতা উৎপন্ন হয় তাকে স্থূল গুণ বলে। মহর্ষি চরক এবং সুশ্রুত স্থূল গুণ যুক্ত দ্রব্যকে পার্থিব বলেছেন। মহর্ষি চরকের মতে এটি কফ বর্ধক, এই গুণে পৃথিবী মহাভূতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই গুণ মাংস ও মেদ ধাতু বৃদ্ধি করে শরীরকে মোটা করে। এই গুণের কারণে শরীরে সংকোচন শক্তি উৎপন্ন হয়।

সূক্ষ্ম :

যে গুণের কারণে দেহে বিবরণ শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে সূক্ষ্ম গুণ বলা হয়। মহর্ষি চরক এই গুণকে বায়ুর ঘটক বলেছেন। এই গুণে আগ্নেয়, বায়ব্য ও আকাশীয় মহাভূতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই গুণযুক্ত দ্রব্য স্নেহন আর স্বেদন করে।

তীক্ষ্ণ:

যে গুণের কারণে শরীরে দহন ও পাক উৎপন্ন হয় তাকে তীক্ষ্ম বলা হয়। এই গুণের কারণে কার্যের তীব্রতা উৎপন্ন হয়। এটি কফ নাশক এবং পিত্ত বর্ধক। চরকসংহিতায় তীক্ষ্ণ গুণকে পিত্তের গুণ রূপেও স্বীকার করা হয়। এই গুণ রসনেন্দ্রিয় এবং স্পর্শনেন্দ্রিয়ে দ্বারা জানা যায়। এই গুণের দ্বারা শরীরে উষ্ণতা উৎপন্ন হয়।

মন্দ :

যে গুণ শরীরে শমন করে তাকে মন্দ গুণ বলা হয়। এই গুণে পৃথিবী এবং জল মহাভূতের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এই গুণ কফ বর্ধক, এবং পিত্ত শামক। এই

গুণের মুখ্য কার্য হল শমন করা। এই গুণে পৃথিবী এবং অপ মহাভূতের আধিক্য থাকার কারণে রস-রক্তাদি ধাতুতেও মন্দ গুণ পাওয়া যায়। এই গুণের কারণে শরীরস্থ অঙ্গ প্রতঙ্গ মনুষ্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবসাদগ্রস্থ ও তামসিক ভাবাপন্ন হয়।

সান্দ্র :

যা স্থূল এবং স্থির তাকে সান্দ্র গুণ বলা হয়। এই গুণ দেহের স্থূলতা বর্দ্ধক, সুশ্রুতের মতে এই গুণে অপ এবং পৃথিবী মহাভূতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অতএব এই গুণ যুক্ত দ্রব্য কফ বর্ধক, এই গুণ ধাতু বর্দ্ধক। শরীরের সন্ধি স্থল গুলিকে পুষ্ট করে সন্ধি দৃঢ় করে।[৩৭]

দ্রব :

যে গুণের জন্য শরীরে আর্দ্রতা উৎপন্ন হয় তাকে দ্রব বলা হয়। মহর্ষি চরকের মতে এই গুণ পিত্ত ঘটক। দ্রব গুণ বহুল দ্রব্যকে অপমহাভূত যুক্ত বলা হয়েছে। এই গুণের কারণে রসাদি ধাতুর বৃদ্ধি হয়, মলের মাত্রা বৃদ্ধি হয়।[৩৮]

কঠিন :

যে গুণ শরীরে দৃঢ়তা এবং কঠোরতা প্রদান করে তাকে কঠিন গুণ বলা হয়। মহর্ষি চরক এবং সুশ্রুত দুই জনেই এই গুণকে ধাতু বৃদ্ধি কারক বলেছেন। এই গুণের কারণে মল শুকিয়ে যায়। এই গুণ বাত বর্দ্ধক।

মৃদতা :

যা শরীরে কোমলতা আর শিথিলতা উৎপন্ন করে তাকে মৃদু বলা হয়। আকাশ ও অপ মহাভূতে এই গুণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় এবং এটি লবণ রসের মধ্যে পাওয়া যায়। এই গুণ কফ, বর্ধক। এই গুণের কারণে মাংস ধাতু শিথিল হয়।[৩৯]

পরত্ব :

পরত্বের অর্থ হল প্রধানতা। একই প্রকার অনেক দ্রব্যে যা শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্টতম তাকে পরত্ব বলা হয়। প্রশস্তপদ ভাষ্যে এই গুণকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—একটি হল দিককৃত এবং অন্যটি হল কালকৃত।[৪০] দৈশিক পরত্ব হল সন্নিকৃষ্ট জ্ঞানের এবং কালিক পরত্ব হল জ্যেষ্ঠত্বের জ্ঞানের কারণ। এই প্রকার দিক ও কালে যে সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ যা নিকটতম তাকে পরত্ব বলা হয়েছে। আচার্য চরক পরত্ব গুণের উপযোগিতা চিকিৎসা সিদ্ধিতে করেছেন। সেখানে দেশ, কাল, বয়স, মাস, পাক, বীর্য, রস ইত্যাদির উৎকৃষ্ট গুণকে পর বলা হয়েছে। চিকিৎসার দৃষ্টিকোণে দেশের তাৎপর্য হল ভূমিদেশ বা শরীরদেশ। চিকিৎসায় দেশের পরত্বের জ্ঞান বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপযোগী। যেমন—হিমালয় প্রদেশের ঔষধি পর। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বয়সের দিক থেকে যুবাবস্থাকে পর বলা হয়। কারণ জীবন দশায় যুবাবস্থাই হল শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার দেখানো হয়েছে কোন কর্মের ক্ষেত্রে বা কোন দোষের ক্ষেত্রে কোন রস পর যেমন—পোষণের ক্ষেত্রে মধুররস পর। হৃদরোগীর জন্য অম্ল রস পর। চরকসংহিতার সূত্র স্থানে ২৫ নং অধ্যায়ে শ্রেষ্ঠতম দ্রব্যের বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে যা পরতের ব্যবহারিক স্বরূপ এবং চিকিৎসা কর্মে সিদ্ধিদায়ক।[৪১]

অপরত্ব :

পরত্ব গুণের সাপেক্ষ গুণ হল অপরত্ব। অর্থাৎ এই গুণ পরত্ব গুণের বিপরীত। অপরত্বের অর্থ হল অপ্রধান। সমান জাতীয় গুণের মধ্যে যা নিকৃষ্টতম গুণ তাকে অপরত্ব বলা হয়। চরকসংহিতায় নিকৃষ্ট বা অপ্রধান দ্রব্যের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরত্বের বিপরীত অপরত্ব। যেমন বয়সের দিক থেকে বৃদ্ধাবস্থা অপরত্ব। চরকসংহিতায় সূত্র স্থানে ২৫ নং অধ্যায়ে পরত্বের সাথে সাথে অপরত্বের উল্লেখ করা হয়েছে।[৪২]

যুক্তি :

দোষ, দেশ, প্রকৃতি, কাল ইত্যাদিকে দেখে ঔষধির যে সম্যক কল্পনা বা যোজনা তাকে যুক্তি বলা হয়।[৪৩]

যদি কল্পনা অযৌক্তিক হয় তাহলে সেটা কল্পনা হলেও যুক্তি হবে না। আচার্য্য চরক একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। অযোগ্য পুত্র যেমন পুত্র নয় তেমনি যদি ঔষধির কল্পনাও সম্যক না হয় তাহলে তা কল্পনা হলেও যুক্তি নয়। আচার্য্য চক্রপাণি দত্ত বলেছেন যে, ভেষজ কল্পনায় সংযোগ, পরিণাম, সংস্কার ইত্যাদি বিচার করা হয়। কিন্তু তাদের মহত্ব প্রদর্শনের হেতু স্বতন্ত্র বর্ণনা করা হয়েছে। চিকিৎসায় যুক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ এই সংসারে সকল দ্রব্য ঔষধি। কিন্তু চিকিৎসায় তখনই দ্রব্য প্রয়োগ সফলতা পাওয়া যায় যখন তাদের যোজনা সম্যক রূপে করা হয়।

ঔষধির সম্যক যোজনা মাত্রা এবং কালের উপর নির্ভর করে। সম্যক যোজনার দ্বারাই কার্য সিদ্ধি হতে পারে। ঔষধির সমুচিত যোজনা না করা হলে চিকিৎসা সফল হবে না।[৪৪]

চরকসংহিতায় যুক্তিকে একটি প্রমাণ রূপে স্বীকার করা হয়েছে যা আধ্যাত্মিক যুক্তির সমান। কিন্তু প্রমাণ যুক্তির সঙ্গে এই যুক্তির পার্থক্য হল প্রমাণ যুক্তিতে আমরা কোন পদার্থ সম্পর্কে জানতে পারি। কিন্তু এই যুক্তিতে দ্রব্যের ঔষধি রূপে যোজনা করে, বিচার করে, তার প্রয়োগ করে দ্রব্যের গুণ সম্পর্কেও জানা যায়।

সংখ্যা:

গণনার ব্যবহারহেতু যে এক, দুই, তিন ইত্যাদির ব্যবহার করা হয় তাকে সংখ্যা বলা হয়। দোষ, রোগ তথা দ্রব্যাদির ভেদ সংখার দ্বারাই করা হয়। যেমন— একদোষ, দুইদোষ, পঞ্চমহাকষায়, ত্রিকুট, ত্রিফলা ইত্যাদি।

আয়ুর্বেদে সংখ্যাকে গুণ বলা হয়েছে এবং তার ব্যবহারিক স্বরূপ দেখানো হয়েছে। যেমন অব্যক্ত বা শুদ্ধ চেতন তত্ত্ব একটি, জীবাত্মার উৎপত্তির কারণ তিনটি, (মোহ, ইচ্ছা এবং দ্বেষ)। দোষের সংখ্যা তিনটি। বৈশেষিক দর্শণে ও এই গুণকে স্বীকার করা হয়েছে। এই গুণকে সামান্য গুণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। কারণ এই গুণটি বিশেষ কোন দ্রব্যের গুণ নয়, এটি সকল দ্রব্যের সাধারণ গুণ।[৪৫]

সংযোগঃ

দুই বা ততোধিক দ্রব্যের মিলনকে সংযোগ বলা হয়। এটি অনিত্য কেননা দুটি বিভিন্ন দ্রব্য কাল বিশেষ বা অল্পকালের জন্য মিলিত হয়। কারণের দৃষ্টিতে সংযোগকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—১) দ্বন্দ্ব কর্মজ, ২) সর্ব কর্মজ, ৩) এক কর্মজ।[৪৬]

১) **দ্বন্দ্ব কর্মজ** : যেখানে মিলিত দুটি পদার্থ নিজ নিজ ক্রিয়া সাথে সংযোগ হয় তাকে দ্বন্দ্ব কর্মজ বলে। যেমন দুটি যুদ্ধে লিপ্ত মেষের সংযোগ।

২) **সর্ব কর্মজ** : এখানে দুই বা তার বেশি দ্রব্য পরস্পর মিলিত হয়। যেমন—একটি মেলায় একাধিক ব্যক্তি পরস্পর মিলিত হয়।

৩) **এক কর্মজ** : এই সংযোগের ক্ষেত্রে একপক্ষ ক্রিয়াশীল হয় এবং অন্য পক্ষ নিষ্ক্রিয় হয়। যেমন—কাক এবং গাছের সংযোগ।

কার্য অনুসারেও সংযোগকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ১) ভৌতিক এবং ২) রাসায়ানিক।

ভৌতিক সংযোগে যে দ্রব্যগুলি মিলিত হয় তাদের গুণ ও কর্মের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু রাসায়নিক সংযোগে দ্রব্যের নতুন গুণ ও কর্মের উৎপত্তি হয় যেমন—অম্ল এবং ক্ষারের সংযোগে লবণ উৎপন্ন হয়।

বিভাগ :

দ্রব্যের বিভাজন অথবা সংযোগ নাশের কারণকে বিভাগ বলা হয়। কোন দ্রব্য সমূহকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেওয়া হল বিভাগের কাজ। বিভাগ অনিত্য, কারণ সংযোগের দ্বারা বিভাগ নাশ হয়। সংযোগ বিভাগ সাপেক্ষ গুণ, অর্থাৎ বিভাগ সংযোগ বিরোধী। বিভাগের সম্বন্ধে চক্রপাণী দত্ত বলেছেন, কিছু লোক সংযোগের অভাবকে বিভাগ বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিভাগ ভাগ রূপে প্রতীত হয়। কারণ দ্রব্যের বিভক্ত রূপ প্রত্যক্ষযোগ্য।[৪৭] সংযোগের মত বিভাগও তিন ভাগে বিভক্ত— ১) দ্বন্দ্ব কর্মজ, ২) এক কর্মজ, ৩) সর্ব কর্মজ।

১) **দ্বন্দ্ব কর্মজ :** যে বিভাগে দ্রব্যের দুটি ভাগই নিজ নিজ কর্ম করে সেই বিভাগকে দ্বন্দ্ব কর্মজ বিভাগ বলা হয়। যেমন—দুইজন যোদ্ধা যারা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তাদের আলাদা করে দিলে তারা দুজনেই নিজ নিজ ক্রিয়া করতে পারেন।

২) **এক কর্মজ :** যখন দুটি দ্রব্যের মধ্যে বিভাজন করলে একটি সক্রিয় এবং অন্যটি নিষ্ক্রিয় হয় তখন তাকে এক কর্মজ বিভাজন বলা হয়। যেমন—উপকরণ এবং কর্তাকে বিভাজন করলে কর্তা সক্রিয় থাকে কিন্তু উপকরণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

৩) **সর্ব কর্মজ বিভাগ :** যখন কোন দ্রব্যকে বা সংযুক্ত কোন বিষয়কে দু-এর অধিক ভাগে ভাগ করলেও প্রত্যকটি ভাগ নিজ নিজ কর্ম

করে তাকে সর্ব কর্মজ বিভাগ বলা হয়। যেমন—যদি একই দ্রব্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে প্রত্যেক ভাগ ক্রিয়াযুক্ত হয়।

বৈশেষিক দর্শনে সর্ব কর্মজ বিভাগের স্থানে বিভাগজ বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়ুর্বেদ এবং বৈশেষিক দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে সংযোগ বিভাগের যে আলোচনা করা হয় সেখানে আমরা দেখলাম যে সংযোগ এবং বিভাগ সম্পর্কে দুটি শাস্ত্রের মতের মধ্যে সাম্য আছে কিন্তু এদের প্রকার ভেদে কিছু মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন আয়ুর্বেদে সংযোগ ও বিভাগের যে প্রকার ভেদের কথা বলা হয়েছে তাহল—দ্বন্দ্ব কর্মজ, সর্ব কর্মজ এবং এক কর্মজ। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে সংযোগের যে প্রকার ভেদের কথা পাই তাহল একতর ক্রিয়াজন্য, উভয় কর্মজ এবং সংযোগজ এবং বিভাজনের যে প্রকার ভেদ পাই তাহল—একের ক্রিয়া জন্য বিভাগ, দুয়ের ক্রিয়াজন্য বিভাগ এবং বিভাগজ বিভাগ। এদের নামের পার্থক্য থাকলেও এদের স্বরূপের কিন্ত তেমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

পৃথকত্ব:

একই দ্রব্যকে অন্য দ্রব্য থেকে আলাদা যে গুণের দ্বারা করা হয় তাকে পৃথকত্ব বলা হয়। চক্রপাণি দত্ত পৃথকত্বের লক্ষণে বলেছেন দ্রব্যে পরস্পর পার্থক্য বুদ্ধি উৎপন্ন যে গুণের দ্বারা হয়ে থাকে তাকে পৃথকত্ব বলা হয়।[৪৮] পৃথকত্বের তিনটি প্রকার ভেদের কথা স্বীকার করা হয়েছে তাহল—১) অসংযোগ, ২) বৈলক্ষণ্য, ৩) অনেকতা।

১) **অসংযোগ** : দেশ ও কালের স্থায়ী ব্যবধানের জন্য যেখানে কখনও সংযোগের সম্ভাবনা নেই এই রকম পৃথকত্বকে অসংযোগ পৃথকত্ব বলা হয়।

২) **বৈলক্ষণ্য** : বিশিষ্ট লক্ষণ যুক্ত বিজাতীয়দের মধ্যে যে পৃথকত্ব তাকে বৈলক্ষণ্য পৃথকত্ব বলে।

৩) **অনেকতা** : একজাতীয় অনেকগুলি দ্রব্যের মধ্যে যে পৃথকত্ব তাকে অনেকতা পৃথকত্ব বলা হয়।

পরিমাণ:

যা মাপ, ওজন ইত্যাদি মানের ব্যবহারের কারণ তাকে পরিমাণ বলা হয়। অনু, মহৎ হ্রস্ব, দীর্ঘ এই চার প্রকার পরিমাণ এর কথা স্বীকার করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে মান অর্থে প্রধানত তুলাযন্ত্র দ্বারা অনুমেয় মানকেই বোঝানো হয়েছে।

সংস্কার :

যে গুণের দ্বারা দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ পরিবর্তন করা যায় তাকে সংস্কার বলা হয়।[৪৯] সংস্কার গুণকে বৈশেষিক দর্শনেও স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে সংস্কার বলতে বোঝায় যা জ্ঞান জন্য অথচ স্মৃতিরহেতু। অতএব আমরা দেখছি বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত সংস্কার এবং আয়ুর্বেদে যে সংস্কারের কথা বলা হয়েছে তারা স্বরূপত ভিন্ন। আয়ুর্বেদে সংস্কার গুণকে আয়ুর্বেদের উপযোগিতা আর ব্যবহারিকতার দৃষ্টিতে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনে তিন প্রকার সংস্কারের

কথা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু আয়ুর্বেদে বেগ নামক সংস্কার এবং ভাবনা সংস্কারে কথাই স্বীকার করা হয়েছে। স্থিতি স্থাপন সংস্কারের কথা স্বীকার করা হয়নি।

অভ্যাস :

কোন পদার্থের নিরন্তর সেবনকে অভ্যাস বলা হয়। আয়ুর্বেদে এই গুণ উপযোগী। আচার্য চরক এই গুণের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে বিমান স্থানের প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন যে, রসের লাগাতার অভ্যাস করলে ওই রসের সম্বন্ধিত দোষের বৃদ্ধি হয় তথা ওই প্রকার দোষের বিরুদ্ধ রসের সতত অভ্যাস করা হলে ওই দোষের শান্তি হয়ে যায়। শরীর স্থানে অভ্যাসের ব্যবহারিক স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে—সমান গুণযুক্ত আহারের অভ্যাসে সমান ধাতুর বৃদ্ধি হয় এবং বিপরীত গুণযুক্ত দ্রব্যের অভ্যাসে সেই ধাতুর হ্রাস হয়। আয়ুর্বেদের উপযোগিতার কথা মাথায় রেখে আয়ুর্বেদে এই গুণকে স্বতন্ত্র গুণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে কিন্তু এই গুণকে স্বীকার করা হয়নি।

চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগ নিরূপন করার জন্যও দ্রব্যের প্রয়োগ করা হয়েছে। দ্রব্য নিজ গুণ অনুসারে শরীরকে প্রভাবিত করে। ফলে এই কারণে আয়ুর্বেদোক্ত ৪১ প্রকার গুণের স্বরূপ জানা প্রয়োজন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র হওয়ায় চিকিৎসার কথা মাথায় রেখে এই ৪১ প্রকার গুণের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই গুণ গুলি রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা কার্যে যে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন তা তাদের স্বরূপ আলোচনার মাধ্যমেই স্পষ্ট।

তথ্যসূত্রঃ

১. মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* প্রথম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৭।

২. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* প্রথম ভাগ, ব্যাখ্যাকার ড. লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, সূত্রস্থান, চৌখাম্বা, কৃষ্ণদাস অকাদমী বারাণসী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৬, পৃ. ৪১।

৩. "প্রবৃত্তিস্তু খলু চেষ্টা কার্য্যার্থা সৈবক্রিয়া কর্ম যত্নঃ কার্য্যসমারম্ভশ্চ।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* খণ্ড -২, বঙ্গানুবাদ ব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৫৭।

৪. "দ্রব্যাশ্রয়্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্"। বৈঃ দঃ, ১:১:১৬।

৫. "গুণা গুণাশ্রয়া নোক্তাস্তস্মাদ্রসগুণান্ ভিষক্। বিদ্যাদ্দ্রব্যগুণান্ কর্ত্তুরভিপ্রায়াঃ পৃথগ্বিধাঃ।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* খণ্ড-১, বঙ্গানুবাদ ব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৭১।

৬. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* ২য় খণ্ড, কবিরাজ ব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৭।

৭. তদেব, পৃ. ১৯৩।

৮. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* প্রথম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৯।

৯. তদেব।

১০. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপানী দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদদীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্প কল্প তরু টীকা সহ, খন্ড-১, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাই চন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত, চৌঘাম্বা অরিয়েন্টালিয়া বারাণসী, ১৯৯১, পৃ.৬৩।

১১. শ্রীমদঅন্নংভট্ট বিরচিত *তর্ক সংগ্রহঃ* সটীকঃ অধ্যাপনাসহিত, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, পৃ. ২৮৯।

১২. *প্রশস্ত পাদভাষ্যম্,* ভাষ্যানুবাদ বিবৃতি ন্যায়কন্দলী তত্ত্বানুবাদ সহিতম্ প্রথম ভাগ অনুবাদকারক দন্তীস্বামী দামোদরাশ্রম, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধানসরণী, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৪৭৩।

১৩. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* প্রথম খণ্ড, ইংরাজি অনুবাদ, আর. কে. শর্মা, ভগবান দাস, চৌঘাম্বা সাংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০১৯, পৃ. ১৬৭।

১৪. তদেব, পৃ. ২২৩।

১৫. শ্রীমদঅন্নংভট্ট বিরচিত *তর্কসংগ্রহ* সটীকঃ অধ্যাপনাসহিতঃ শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, বঙ্গাব্দ ১৪১৩, পৃ. ২০৬।

১৬. যস্য বৈকারিকঃ বর্ণঃ শরীরে উপজায়তে, অর্ধেয়দি বা কৃৎস্নে নিমিত্তং ন চ নাস্তিসঃ। নীলং বা যদি বা শ্যাবঃ তাম্রঃ বা যদি বাঅরূপম মুখাধর্মন্যথা বর্ণো মুখার্ধ্যেরিষ্টমুচ্যতে।। *পদার্থ বিজ্ঞান*, ড. যোগেশ চন্দ্র মিশ্র, চৌখাম্বা প্রকাশন, বারাণসী-২২১০০১, ২০০৭, পৃ. ৮৯।

১৭. মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য, *সুশ্রুত সংহিতা*, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা—বৈদ্যাচার্য্য কালীকিঙ্কর সেন শর্মা ও আয়ুর্বেদাচার্য্য সত্যশেখর ভট্টাচার্য্য, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০১৩, পৃ. ৪৬।

১৮. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, চক্রপাণি দত্তের আয়ুর্বেদ দীপিকাসহ, ইংরাজী অনুবাদ, প্রথম ভাগ, আর. কে. শর্মা, ভগবান দাস, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী-২২১০০১, ২০২০, পৃ. ৪৬৫।

১৯. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, প্রথম ভাগ, সূত্র স্থান, ড. লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, সহব্যাখ্যাকার ড. বি. কে. দ্বিবেদী ও ড. পি. কে. গোস্বামী, চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস অকাদমী, বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ৬৫।

২০. অন্নংভট্ট বিরচিত, *তর্কসংগ্রহ*, অধ্যাপনা সহিতঃ, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, বঙ্গাব্দ-১৪১৩, পৃ. ২১৫।

২১. তদেব।

২২. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, পূর্বভাগে আয়ুবেদাচার্য শ্রী জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, মোতিলাল বনারসী দাস, বারানসী, ১৯৭৫, পৃ. ২১৫।

২৩. তদেব।

২৪. তদেব, পৃ. ২২২।

২৫. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, চক্রপাণি দত্ত বিরচিত আয়ুর্বেদ দীপিকা সহ, প্রথম খণ্ড, আর. কে. শর্মা, ভগবান দাস, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারানসী, ২০২০, পৃ. ৪৭১।

২৬. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, প্রথম খণ্ড, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০০৩, পৃ. ১০৪।

২৭. "আত্মেন্দ্রিয়মনোঅর্থনাং সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ত্ততে। ব্যক্তা তদাত্বে যা বুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষং সা নিরুচ্যতে।।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, প্রথম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০০৩, পৃ. ১০৪।

২৮. "যা যাদন্দ্রিয়মাশ্রিত্য জন্তোর্বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে। যাতি সা তেন নির্দ্দেশং মনসা চ মনোভবা।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* দ্বিতীয় খণ্ড, আর. কে. শর্মা, ভগবান দাস, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারানসী, ২০১৯, পৃ. ৩১৯।

২৯. মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য, *সুশ্রুতসংহিতা,* প্রথম খণ্ড, বৈদ্যাচার্য্য কালীকিঙ্কর সেনশর্মা ও সত্যশেখ ভট্টাচার্য্য, দীপায়ন, ২০ কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০১৩, পৃ. ১৯৫।

৩০. তদেব, পৃ. ২২২।

৩১. মহর্ষি সুশ্রুত, *সুশ্রুতসংহিতা,* অনুবাদক—অত্রিদেব, মোতিলাল বনারসী দাস, বারাণসী, ২০১৫, পৃ. ২২৪।

৩২. তদেব।

৩৩. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* প্রথম খণ্ড, কবিরাজ, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০০৩, পৃ. ৯।

৩৪. সুশ্রুতাচার্য, *সুশ্রতসংহিতা,* অনুবাদক-অত্রিদেব, মোতিলাল বনারসী দাস, বারাণসী, ২০১৫, পৃ. ২২২।

৩৫. তদেব, পৃ. ২২৪।

৩৬. মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য, *সুশ্রুতসংহিতা,* প্রথম খণ্ড, বৈদ্যাচার্য্য কালীকিঙ্কর সেন শর্মা, সত্যশেখর ভট্টাচার্য্য, দীপায়ন, ২০ কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০১৩, পৃ. ২২৫।

৩৭. মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য, *সুশ্রুতসংহিতা,* প্রথম খণ্ড, বৈদ্যাচার্য্য কালীকিঙ্কর সেন শর্মা, সত্যশেখর ভট্টাচার্য্য, দীপায়ন, ২০ কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০১৩, পৃ. ২২৫।

৩৮. তদেব।

৩৯. তদেব, পৃ. ২২৬।

৪০. *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* প্রথম ভাগ, অনুবাদাদিকারক শ্রী শ্যামাপদ ন্যায়তর্কতীর্থঃ, দামোদরাশ্রম, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডর, ৩৪ নং বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬, পৃ. ১৯১।

৪১. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* প্রথম ভাগ, সূত্রস্থান, ড. লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, ড. বি. কে. দ্বিবেদী, ড. পি. কে. গোস্বামী, চৌখম্বা কৃষ্ণদাস অকাদমী, বারাণসী, ২০১৭, পৃ. ৪৭৮।

৪২. তদেব।

৪৩. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* আয়ুর্বেদ দীপিকাসহ, প্রথম ভাগ, আর. কে. শর্মা, ভগবান দাস, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০২০, পৃ. ৪৬০

৪৪. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* আয়ুর্বেদ দীপিকা সহ, প্রথম খণ্ড, আর. কে. শর্মা ও ভগবান দাস, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০২০, পৃ. ৬৮।

৪৫. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা, আয়ুর্বেদদীপিকা* ও *জল্পকল্পতরু* টীকা ব্যাখ্যা সহ, ড. লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, বি. কে. দ্বিবেদী, ড. পি. কে. গোস্বামী, প্রথম ভাগ, চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস অকাদমী, বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ৪৭৯।

৪৬. তদেব, পৃ. ৪৮০।

৪৭. তদেব।

৪৮. *চরকসংহিতা,* মহর্ষি চরক, প্রথম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৭১।

৪৯. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* প্রথম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৭১।

<u>তৃতীয় অধ্যায়</u>

আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রদত্ত দ্রব্য পদার্থ

আয়ুর্বেদ গুণনামক পদার্থের পরেই দ্রব্য নামক পদার্থের উল্লেখ করা হচ্ছে। তার কারণ যদিও আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে মূলত দ্রব্যের স্বরূপ, দ্রব্যের বিভাগ এবং দর্শনের সঙ্গে আয়ুর্বেদ সম্মত দ্রব্যের লক্ষণ ও বিভাগ বিষয়ে মিল ও অমিল আলোচিত হবে। এই অধ্যায়ে দ্রব্যের গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করা হবে। দ্রব্য প্রসঙ্গে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে "যত্রাশ্রিতাঃ কর্মগুণ কারণং সমবায়ি যৎ, তদ্ দ্রব্যম।"[১] অর্থাৎ যা গুণ আর কর্মের আশ্রয় এবং যা সমবায়ি কারণ তাকে দ্রব্য বলা হয়।

আয়ুর্বেদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল সুশ্রুত সংহিতা সেখানে দ্রব্যের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে "দ্রব্যলক্ষণং তু ক্রিয়াগুণবত্ সমবায়িকারণম্ ইতি।"[২] অর্থাৎ যেখানে কর্ম ও গুণ সমবেত হয় এবং যা কর্ম ও গুণের সমবায়ি কারণ তাকে দ্রব্য বলা হয়।

চরকসংহিতায় দ্রব্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেখানে আমরা লক্ষ্য করি লক্ষণ প্রসঙ্গে দোষ গুণের বিচার এখানে করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকায় চক্রপাণি দত্ত দ্রব্যের লক্ষণে দোষগুণ বিচার করেছেন। সেখানে আমরা লক্ষ্য করি দ্রব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'স্ব সমবেত কার্য জনকত্ব' এই ধর্ম গুণ, কর্ম থেকে দ্রব্যের ভেদ জ্ঞাপন করে। কর্ম সমবায়ত্ব আকাশাদির দ্রব্যে

নেই। গুণবত্ত্বা উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে দ্রব্যে থাকে না। কিন্তু গুণাশ্রয় যোগ্যত্ব থাকে। এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট লক্ষণের দোষ গুণের বিচারও টীকাতে করা হয়েছে তা বোঝা যায়।[৩]

উক্ত লক্ষণে 'যত্র' আদি শব্দের দ্বারা গ্রন্থকার দ্রব্যের লক্ষণ করেছেন। যেখানে গুণ কর্ম সমবেত থাকে তাকে দ্রব্য বলা হয়। অর্থাৎ এখানে আশ্রয় রূপে দ্রব্যই বিবেচিত। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে দ্রব্য কর্ম ও গুণের আশ্রয় হয়ে যাওয়া মানে কী কর্ম গুণের সমবায়িকারণ হয়ে যাওয়া? তার উত্তর পেতে হলে 'কারণং সমবায়ি' এই পদের অর্থ সন্ধান করতে হবে। 'কারণং সমবায়ি' এই পদের দ্বারা যা কর্ম ও গুণের সমবায়িকারণ অর্থাৎ অপৃথকভাগ সম্বন্ধে যেখানে কর্ম এবং গুণ বিদ্যমান থাকে তাকে দ্রব্য বলে। দ্রব্য গুণ ও কর্মের সমবায়িকারণ হয়ে থাকে। দ্রব্য দ্রব্যেরও সমবায়িকারণ হতে পারে। যেমন—ঘট তার সমবায়িকারণ কপাল কপালিকাতে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে যে, চরকসংহিতায় আদৌ কারণ স্বীকৃত? আলোচনার অবকাশ থেকে যাবে কারণ সম্পর্কে চরক সংহিতায় কিরূপ মত স্বীকার করা হয়েছে। চরকসংহিতায় বিমান স্থানে অষ্টম অধ্যায়ে কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "তত্র কারণং নাম তদ্ যঃ করোতি স এব হেতু স কর্ত্তা" অর্থাৎ যে করে তাকে কারণ বলা হয়েছে, আবার তাকেই হেতু বলা হয়েছে, তাকেই আবার কর্তা বলা হয়েছে। কিন্তু কর্তা কি কার্যের উৎপত্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট? কারণ বলতে কর্তাকে

বোঝালে কি কারণ শব্দের অর্থ সম্পূর্ণভাবে বলা হয়? এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ উক্ত স্থলে কারণ, হেতু ও কর্তাকে সমার্থক বলে গ্রহণ করা হয়েছে।[৪] আমরা জানি কর্তা কার্যের প্রতি বিশেষ প্রকার কারণ। তাকে বলা হয় নিমিত্ত কারণ। অবশ্যই আমরা ন্যায় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলছি। কর্তা ছাড়াও যে বস্তু থেকে কার্য উৎপত্তি হয় তাকে একপ্রকার কারণ বলা হয়। কিন্তু তা উপাদান কারণ নামে দর্শনান্তরের পরিচিত। আবার যাতে কার্য উৎপন্ন হয়ে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে তা সমবায়িকারণ নামে পরিচিত। প্রশ্ন হল চরকসংহিতায় কি কারণের উক্ত বিভাগ দৃষ্ট হয়?

চরকসংহিতায় আমরা লক্ষ্য করি কারণের কোন উক্ত বিভাগ দৃষ্ট হয়নি। পরবর্তী কালে আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকায় চক্রপাণি দত্ত, এবং জল্পকল্পতরু টীকায় আচার্য গঙ্গাধর সমবায়িকারণের উল্লেখ করেছেন। সমবায়িকারণের অর্থ হল যেখানে সমবেত হয়ে কার্য উৎপত্তি হয় তাকে সমবায়িকারণ বলা হয়। গুণ ও কর্ম স্বসমবেত কার্য উৎপন্ন করতে পারে না সুতরাং গুণ ও কর্ম সমবায়িকারণ নয়।

এখন আমাদের দেখা উচিত যে আয়ুর্বেদে দ্রব্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তার প্রতিপদ ব্যাবৃত্তি হচ্ছে কিনা? কিন্তু এই আলোচনার পূর্বে আমাদের আরও একটি বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে তাহল এই লক্ষণটি কি দ্রব্যের একটি লক্ষণ নাকি তিনটি লক্ষণ? কারণ এই লক্ষণ থেকে আমরা তিনটি বিষয় পেয়ে থাকি। ১) যা ক্রিয়াবৎ অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয় তাই দ্রব্য। ২) যা গুণবৎ তাই দ্রব্য।

৩) যা সমবায়িকারণ তাই দ্রব্য। অর্থাৎ এখানে তিনটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে তথাপি তিনটি লক্ষণই নির্দোষ নয়। প্রথম দুটিতে দোষের জন্য তৃতীয় লক্ষণের প্রয়োজন হয়।

এখন প্রশ্ন হল ক্রিয়াবৎ যা তাই দ্রব্য বললে কি সমস্যা হত? এর উত্তরে বলা হয় এই লক্ষণটিতে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। কারণ আকাশ, কাল, দিক ও আত্মা এই চারটি দ্রব্য নিষ্ক্রিয়। যেহেতু তারা বিভু। অতএব দ্রব্যকে কেবল ক্রিয়াবৎ বললে আকাশ, কাল, দিক ও আত্মায় দ্রব্যের লক্ষণটি প্রযুক্ত হত না। অতএব এই লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ থাকায় এই লক্ষণকে নির্দোষ লক্ষণ বলে স্বীকার করা যাবে না।

দ্বিতীয় যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা হল যা গুণবান তাই দ্রব্য। সমবায় সম্বন্ধে গুণ যাতে থাকে তাকে দ্রব্য বলা হয়। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু দ্রব্যেই সমবায় সম্বন্ধে গুণ থাকে এবং গুণ, কর্ম, সামান্যাদিতে সমবায় সম্বন্ধে গুণ থাকে না। এই জন্য আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় লক্ষণটি দ্রব্যের যথাযথ লক্ষণ। কিন্তু একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারটি দ্রব্যের পরমাণু আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন নিত্যদ্রব্য এদের উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। কিন্তু পরমাণু ভিন্ন পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু যখন স্থূল আকার প্রাপ্ত হয় তখন তার উৎপত্তি এবং বিনাশ দুই আছে। সুতরাং তা অনিত্য। আর অনিত্য দ্রব্য স্ব স্ব উৎপত্তি ক্ষণে গুণহীন। অতএব ‘গুণবৎ দ্রব্যতম্’ দ্রব্যের এই

লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। কারণ উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে লক্ষণ সমন্বয় হল না। এই কারণে দ্রব্যের লক্ষণে বলা হল যা গুণ ও কর্মের সমবায়িকারণ তাই হল দ্রব্য। এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, 'যত্রাশ্রিতার্থ' এই শব্দের ব্যবহার কেন করা হয়েছে? এর উত্তরে বলা যায় যে আয়ুর্বেদে 'যত্রাশ্রিতার্থ' এই শব্দের দ্বারা আধার আধেয় ভাবের কথা বলা হয়েছে। দ্রব্য হল আধার এবং গুণ হল আধেয়, আধার আধেয় ভাবের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সেই অর্থে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে আধার আধেয় ভাব থাকে।

এই প্রসঙ্গে জল্পকল্পতরু টীকাকার আচার্য গঙ্গাধর বলেছেন 'যত্রাশ্রিত' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা গ্রন্থাকার দ্রব্যের লক্ষণ দিয়েছেন। এখানে কারণের উল্লেখের দ্বারাই কার্যের উল্লেখ হয়ে যায়। যেমন গুণ, কর্ম যেখানে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত হয় তা তাদের সমবায়িকারণ সেটাই দ্রব্য।[৫]

বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আয়ুর্বেদেও সেই লক্ষণের কথা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে আরও একটি লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা হল—'দ্রব্যত্ব জাতিমত্বম'।[৬] অর্থাৎ যাতে দ্রব্যত্ব জাতি থাকে তাই দ্রব্য। যেমন—যাতে গোত্ব জাতি আছে তাই গরু। চরকসংহিতায় কিন্তু দ্রব্যের এমন কোন লক্ষণের কথা স্বীকার করা হয়নি। অর্থাৎ এখান থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, লক্ষণের দোষ, গুণ বিচার তথা প্রদত্ত লক্ষণের দোষ উত্থাপন পূর্বক অপর নির্দোষ লক্ষণের অনুসন্ধান দৃষ্ট হয় না।

দ্রব্য যেমন গুণ ও কর্মের সমবায়িকারণ হয় তেমনি দ্রব্য, দ্রব্যেরও সমবায়ি কারণ হয়। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যায় কিছু দ্রব্য আছে যা উৎপন্ন হয় এবং কিছু দ্রব্য আছে যা উৎপন্ন করে। যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তা কার্য দ্রব্য। যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় না তা নিত্য দ্রব্য। যে দ্রব্য কার্য দ্রব্য উৎপন্ন করে তাকে কারণ দ্রব্য বলা হয়। যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তা কার্য দ্রব্য। অতএব এই অর্থে দ্রব্য দুই প্রকার কার্য দ্রব্য এবং কারণ দ্রব্য।

চরকসংহিতায় কারণ দ্রব্যকে নয় ভাগে ভাগ করা হয়। এই নয় প্রকার কারণ দ্রব্য হল—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, আত্মা, মন, কাল এবং দিক্।[৭] আমরা জানি বৈশেষিক দর্শনে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা, মন এই ক্রমে দ্রব্যের বিভাগ করা হয়েছে। কিন্তু আচার্য চরক আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, আত্মা, মন, কাল এবং দিক্ এই ক্রমে নয় প্রকার কারণ দ্রব্যের উল্লেখ করেছেন। আয়ুর্বেদ এবং বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যের যে ক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে তা লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব যে, সেখানে প্রথমেই পঞ্চমহাভূতের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে দুটি শাস্ত্র অর্থাৎ আয়ুর্বেদ এবং বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যের ক্রমের ক্ষেত্রে প্রথমেই পঞ্চমহাভূতের কথা উল্লেখ করলেও দুটি শাস্ত্রে একই ক্রমে পঞ্চমহাভূতের উল্লেখ করা হয়নি। অতএব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে যে কেন আয়ুর্বেদে আকাশাদি দ্রব্য দিয়ে দ্রব্যের ক্রম শুরু হল অথচ বৈশেষিক দর্শনে পৃথিবী দ্রব্য দিয়ে দ্রব্যের ক্রম শুরু হল? আরো প্রশ্ন করা হয় যে

পঞ্চমহাভূতের উল্লেখ কেন পূর্বে করা হল? এর উত্তরে চক্রপাণি দত্ত বলেন যে মহর্ষি চরকের উল্লিখিত দ্রব্যের ক্রম অনাগতবেক্ষণ ন্যায়ের দ্বারা করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন ওঠে 'অনাগতবেক্ষণ ন্যায়' কি? উত্তরে বলা হয় যার উল্লেখ আগে করা হয়েছে অর্থাৎ যা পূর্বেই আমাদের জ্ঞাত হয়েছে তার উল্লেখ বা আলোচনা পরে করে, এখনও যে বিষয় আমরা জ্ঞাত হয়নি তার আলোচনাকে পূর্বে করাকেই অনাগতবেক্ষণ ন্যায় বলে। আত্মাদির উল্লেখ চরকসংহিতায় দ্রব্যের উল্লেখের পূর্বেই করা হয়েছে। তাই যা অনাগত অর্থাৎ যার উল্লেখ করা হয়নি তার উল্লেখ এখানে প্রথমে করা হয়েছে। তারপর যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। এই জন্য আকাশাদি পঞ্চমহাভূতে উল্লেখ প্রথমে করা হয়েছে।[৮]

এই প্রসঙ্গে আচার্য গঙ্গাধর জল্পকল্পতরু টীকায় বলেছেন যদিও আত্মা এই নয় প্রকার কারণদ্রব্যের মধ্যে প্রধান তথাপি তার চৈতন্যের প্রকাশ ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ যদি আত্মার সংযোগ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে না হয় তাহলে চেতনাদি আত্মার যে গুণ তা ব্যক্ত হবে না, তাই এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য বেশি। আয়ুর্বেদে ইন্দ্রিয়কে ভৌতিক বলা হয়েছে। অতএব সর্বপ্রথম পঞ্চমহাভূতের উল্লেখ করা হয়েছে। 'খাদি' শব্দের দ্বারা আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথিবী এই ক্রম বোঝানো হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে আত্মার সঙ্গে কি সরাসরি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়? এর উত্তরে বলা হয় না। আত্মা যখন শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন মনে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এই কারণে আত্ম দ্রব্যের পর মনের উল্লেখ করা হয়েছে। কাল

ও দিক ঔপাধিক রূপে সমবায়িকারণ হওয়ার ফলে এই দুটি অন্তে উল্লেখ করা হয়েছে। কাল ও দিক ঔপাধিক কেন? তার আলোচনা আমরা কাল ও দিকের বিস্তারিত আলোচনা যেখানে করা হয়েছে সেখানে করব। অর্থাৎ এই নয় প্রকার দ্রব্য আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, আত্মা, মন, কাল ও দিক্ এই নয় প্রকার দ্রব্য ছাড়া কার্যের উৎপত্তি হতে পারে না। তাই এই নয় প্রকার দ্রব্যকে কারণ দ্রব্য বলা হয়।

আয়ুর্বেদে যে পঞ্চমহাভূতের উল্লেখ করা হয়েছে তা হল—আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ এবং ক্ষিতি। এখন প্রশ্ন হল আয়ুর্বেদে যে পঞ্চমহাভূতের ক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে তার ক্রম বৈশেষিক দর্শনে পঞ্চমহাভূতের যে ক্রম উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ তার থেকে পৃথক কেন? আয়ুর্বেদে কেন আকাশ মহাভূত দিয়ে মহাভূতের ক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে?

স্থূল শরীরের উপাদান অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক ও লোম—পৃথিবী জন্য, শুক্র, শোনিত, মজ্জা, মল, মূত্র—জল জন্য, নিদ্রা, ক্ষুধা তৃষ্ণা, ক্লান্তি, আলস্য তেজ জন্য, ধারন, চালন, ক্ষেপন, সংকোচন ও প্রসারণ-বায়ু জন্য এবং কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ আকাশ জন্য উৎপন্ন হয়।[৯]

আবার বলা হয় আয়ুর্বেদ মূলত একটি চিকিৎসা শাস্ত্র। আয়ুর্বেদের মূল উদ্দেশ্য পুরুষের স্বাস্থ্য রক্ষা। তাই পুরুষের উৎপত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা

হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে গর্ভাশয়ে শুক্র ও শোনিতের সংযোগ হওয়ার ফলে তথা আত্মার প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে তার পরিণাম স্বরূপ যে আকৃতি উৎপন্ন হয় তাকে গর্ভ বলা হয়। সেখানে চেতনার উৎপত্তি হয়ে থাকে। বায়ু তাতে বিভাজন, তেজ তাতে পাচন, জল তাতে ক্লেদতা, পৃথিবী তাতে সংহরণতা এবং আকাশ মহাভূত অন্যান্য মহাভূতের বিকাশের জন্য অবকাশ প্রদান করার ভূমিকা পালন করে থাকে। এই প্রকার উক্ত গর্ভ বৃদ্ধি করে তাতে হাত, পা, জিহ্বা, নাক, কান ইত্যাদি অঙ্গের যুক্ত রূপে শরীর নাম প্রাপ্ত হয়ে থাকে।[১০]

শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয়, শ্রোত্রেন্দ্রিয়, লাঘব, সুক্ষ্মতা আর বিবেক এই কয়টি হল আকাশ। বিবেকের তাৎপর্য হল শারীরিক ভাব, শিরা, স্নায়ু, অস্থি ইত্যাদির পরস্পর পৃথক পৃথক থাকা। শরীরে পাওয়া সকল প্রকার ছিদ্র সমূহ আকাশের দ্বারাই উৎপন্ন হয়ে থাকে। গর্ভে উপস্থিত শিশুর শরীরে যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাজন আর বিকাশ ক্রিয়ার আরম্ভ হয় তখন তাদের আরও বিস্তৃতি ও বিকাশের কাজ আকাশই করে থাকে। তাই আকাশকে পঞ্চমহাভূতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাভূত বলা হয়েছে।

চরকসংহিতায় যে ক্রমে পঞ্চমহাভূতের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে তৈত্তিরীয়োপনিষদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ তৈত্তিরীয়োপনিষদে আত্মা থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী উৎপত্তি হয়েছে। এই পঞ্চমহাভূতের গুণগুলি যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ।

সুশ্রুতসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিনটি গুণ থেকে মহাভূতের সৃষ্টি হয়েছে। আকাশ সত্ত্ব প্রধান। বায়ু রজঃ ও তম প্রধান। সত্ত্ব ও রজঃ প্রধান অগ্নি। অপ সত্ত্ব ও তম প্রধান এবং পৃথিবী তম প্রধান।[১১]

চরকসংহিতাতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই পাঁচটিকেই পঞ্চমহাভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় সকল পদার্থই যে পঞ্চভৌতিক এটাও বলা হয়েছে এবং এটাও স্বীকার করা হয়েছে যে এই বিশ্ব সংসারে সকল কিছুই পঞ্চমহাভূত থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এই পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্র থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। পরমাণুরূপকে তন্মাত্র এবং স্থুল রূপকে পঞ্চমহাভূত বলা হয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এই মহাভূতের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে। যা প্রত্যেক মহাভূতের জ্ঞান উৎপাদক। মানব শরীরও পঞ্চমহাভূতে সংযোগ আছে। অর্থাৎ রোগীকে রোগাবস্থা বা অসুস্থ অবস্থা থেকে সুস্থ করার জন্য পঞ্চমহাভূতের সাম্যবস্থা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। এই কারণে যে মহাভূতের ন্যূনতা ঐ রোগাবস্থার কারণ ঐ মহাভূত যুক্ত দ্রব্যের প্রয়োগের মাধ্যমে পঞ্চমহাভূতের সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়। যেমন—শরীরে যদি জলের ঘাটতি হয় বা পৃথিবীর ঘাটতি হয় তাহলে ঐ ঐ মহাভূতের প্রয়োগের দ্বারা সমান অবস্থায় নিয়ে আসা হয়, অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে শরীর গঠন এবং চিকিৎসা পঞ্চমহাভূতের দ্বারাই হয়ে থাকে।

পাঁচটি মহাভূতের মধ্যে চরকসংহিতায় প্রথম যে মহাভূতের উল্লেখ আছে তা হল আকাশ, আকাশের পর বায়ু, বায়ুর পর অগ্নি, অগ্নির পর অপ্, অপ্ এর পর ক্ষিতি মহাভূতের উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু উল্লেখ নয় এই ক্রমে যে মহাভূতগুলি

উৎপন্ন হয়েছে তাও স্বীকার করা হয়েছে। আকাশের গুণ হল শব্দ। আকাশের পর বায়ুর উল্লেখ করা হয়েছে। বায়ুর গুণ হল শব্দ ও স্পর্শ। বায়ুর পর অগ্নির উল্লেখ করা হয়েছে। এই মহাভূতের গুণ হল শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। এর পর অপ মহাভূতের উল্লেখ করা হয়েছে। অপ চারটি গুণ বিশিষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস। অপের পর ক্ষিতি মহাভূতের উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষিতি পাঁচটি গুণ বিশিষ্ট। এগুলি হল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এখানে বলা হয়েছে যে ভূতটি থেকে যে ভূতের উৎপন্ন হয় সেই ভূতটিতে পূর্ববর্তী ভূতের গুণটি যুক্ত হয়। ফলে পরবর্তী ভূতের গুণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একে একত্তর পরিবৃদ্ধি বলা হয়। মহাভূতগুলি উৎপন্ন হওয়ার পর এদের সংশ্রিমণের ফলে দ্রব্যগুলি যেভাবে উৎপন্ন হয় সেই পদ্ধতিকে পঞ্চীকরণ পদ্ধতি বলা হয়।

<u>পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া</u>

স্থূল	সুক্ষ্ম তম্মাত্রা				
	(শব্দ)	(স্পর্শ)	(রূপ)	(রস)	(গন্ধ)
	আকাশ	বায়ু	তেজ	জল	পৃথিবী
১। আকাশ	১/২	+ ১/৮	+ ১/৮	+ ১/৮	+ ১/৮
২। বায়ু	১/৮	+ ১/২	+ ১/৮	+ ১/৮	+ ১/৮
৩। তেজ	১/৮	+ ১/৮	+ ১/২	+ ১/২	+ ১/৮
৪। জল	১/৮	+ ১/৮	+ ১/৮	+ ১/২	+ ১/৮
৫। পৃথিবী	১/৮	+ ১/৮	+ ১/৮	+ ১/৮	+ ১/২

মহাভূতের উৎপত্তিঃ

আচার্য সুশ্রুতের মতানুসারে মহাভূতের উৎপত্তি সাংখ্য দর্শনকে অনুসরণ করে অর্থাৎ অব্যক্তের দ্বারা ত্রিগুণাত্মক মুহতের উৎপত্তি হয় যার দ্বারা ত্রিগুণাত্মক অহংকারের উৎপত্তি হয়। এই অহংকার তিন প্রকার—বৈকারিক, তৈজস এবং ভূতাদি। ভূতের উৎপত্তি ভূতাদি অহংকারের দ্বারা তৈজস অহংকারের সহায়তায় হয়ে থাকে। অর্থাৎ তৈজস অহংকারের সহায়তায় ভূতাদি অহংকারের দ্বারা সত্ব, রজ ও তম লক্ষণ যুক্ত পাঁচটি তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। শব্দ তন্মাত্রা, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, গন্ধ তন্মাত্র। এদের বিশেষ গুণ হল যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ। এই তন্মাত্রের দ্বারাই পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়। যথাক্রমে শব্দ তন্মাত্রের দ্বারা আকাশ মহাভূতে। স্পর্শ তন্মাত্রের দ্বারা বায়ু মহাভূতের, রূপ তন্মাত্রের দ্বারা অগ্নি মহাভূতের রস তন্মাত্রের দ্বারা জল মহাভূতের এবং গন্ধ তন্মাত্রের দ্বারা পৃথিবী মহাভূতের উৎপত্তি হয়।

আচার্য চরক এর মতানুসারে অহংকার থেকে সরাসরি মহাভূতগুলির উৎপত্তি হয়। মহাভূতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, অহংকার থেকে আকাশাদি যথাক্রমে হয়ে থাকে—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, উৎপত্তি হয়েছে।[১২]

পঞ্চমহাভূতে পরস্পর অনুপ্রবেশ :

এখানে উত্তরোত্তরানুপ্রবেশ তাৎপর্য এই যে পূর্ব পূর্ব ভূতে উত্তর উত্তর ভূবত অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ প্রবেশ করে। এই প্রকার পূর্ব পূর্ব মহাভূতে প্রবেশ করার

কারণে উত্তর উত্তর মহাভূত নিজ নৈস্বর্গিক এবং স্বাভাবিক গুণ অর্থাৎ বিশেষ গুণ ছাড়াও পূর্ব পূর্ব মহাভূতের গুণও ঐ মহাভূতে চলে আসে। যেমন—বায়ু মহাভূতে স্বাভাবিক গুণ স্পর্শ কিন্তু বায়ু মহাভূতের পূর্ব মহাভূত আকাশের গুণ শব্দেও বায়ুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়। কারণ বায়ু মহাভূতে স্বাভাবিক গুণ স্পর্শ ছাড়াও আকাশের নৈস্বর্গিক গুণ শব্দও চলে আসে। যার কারণে বায়ু দ্বিগুণাত্মক অর্থাৎ স্পর্শ এবং শব্দগুণ যুক্ত। এই প্রকার তেজ মহাভূতের পূর্ব পূর্ব মহাভূত বায়ু মহাভূত অথবা আকাশ মহাভূতের গুণের অনুপ্রবেশ হয়ে যায়। তেজ মহাভূতের গুণ রূপের সাথে বায়ু এবং আকাশ মহাভূতের গুণ যথাক্রমে স্পর্শ এবং শব্দও অনুপ্রবিষ্ট হয়। এই কারণে অগ্নি মহাভূত তিনটি গুণ বিশিষ্ট রূপ, শব্দ এবং স্পর্শ। জল মহাভূতে পূর্ব পূর্ব মহাভূত অর্থাৎ অগ্নি মহাভূত বায়ু মহাভূত এবং আকাশ মহাভূতে গুণের অনুপ্রবেশ হয়। এই কারণে জল মহাভূত নিজের স্বাভাবিক গুণ রসের অতিরিক্ত পূর্ব পূর্ব মহাভূত অগ্নি, বায়ু, আকাশ মহাভূতের স্বাভাবিক গুণের অর্থাৎ রূপ স্পর্শ এবং শব্দের অনুপ্রবেশ হয়ে যায়। এই কারণে জল মহাভূত রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই চারটি গুণ যুক্ত হয়। এই প্রকার পৃথিবী মহাভূতে পূর্ব পূর্ব মহাভূত অর্থাৎ জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এদের স্বাভাবিক গুণ যথাক্রমে রস, রূপ স্পর্শ, শব্দ এদের অনুপ্রবিষ্ট হয়। এই কারণে পৃথিবী মহাভূতের গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি গুণ থাকে।

আচার্য চরক এই প্রসঙ্গে বলেছেন পূর্ব পূর্ব ভূতের গুণ উত্তর উত্তর ভূতে অনুবিষ্ট হয় যার দ্বারা পূর্বভূত উত্তর উত্তর ভূতে একটি একটি গুণ ক্রমশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে তথা উত্তর উত্তর মহাভূত পূর্ব পূর্ব মহাভূতের গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়। আচার্য যোগীন্দ্রনাথ সেন এই মতবাদটিকে স্ববিস্তার বর্ণনা করে বলেছেন—উত্তরাত্তরাণুপ্রবেশের ফলে প্রত্যেক উত্তর উত্তর মহাভূতে এক এক গুণের ক্রমশ বৃদ্ধি হয় যেমন—আকাশ প্রারম্ভিক হওয়ার কারণে একটি গুণ যুক্ত বায়ু দুটি গুণ যুক্ত, অগ্নি তিনটি গুণ যুক্ত, জল চারটি গুণ যুক্ত এবং পৃথিবী পাঁচটি গুণ যুক্ত। আচার্য চক্রপাণি দত্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন শব্দাদি ক্রমানুসারে আকাশাদির ভূতে গুণের যে বৃদ্ধি হয় তা অনুপ্রবিষ্ট ভূতের সম্বন্ধের দ্বারাই হয়। ভূতের উত্তরোত্তর অনুপ্রবেশের দ্বারা পৃথিবী মহাভূতে চারটি ভূতের প্রবেশ হওয়ায় তাতে পাঁচটি গুণ থাকে।

আচার্য সুশ্রুত উত্তরাত্তোর অনুপ্রবেশের বিষয়ে বলেছেন আকাশ বায়ুতে জল এবং পৃথিবীতে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ একটি একটি গুণের বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন—আকাশ একটি গুণ যুক্ত। বায়ু দুটি গুণ যুক্ত, অগ্নি তিনটি গুণ যুক্ত এবং জল চারটি গুণ যুক্ত। এবং পৃথিবী পাঁচটি গুণ যুক্ত।[১৩]

আকাশ:

আকাশের গুণ হল শব্দ এবং অপ্রতিঘাত হল আকাশের কর্ম এবং এই দুয়ের সমবায়ী কারণ হওয়ায় আকাশও দ্রব্য পদবাচ্য। তৈত্তিরিয়োপনিষদে আত্মা থেকে

আকাশের উৎপত্তির কথা স্বীকার করা হয়েছে। মনুস্মৃতি অনুসারে পঞ্চমহাভূতের সর্বপ্রথম শব্দ লক্ষণ যুক্ত শব্দতন্মাত্রের সহায়তায় আকাশের উৎপত্তি হয়। অন্যান্য দর্শনেও আকাশের উৎপত্তি শব্দতন্মাত্র দ্বারা হয়েছে একথা স্বীকার করা হয়। সাংখ্য দর্শন অনুসারে অহংকারের দ্বারা শব্দ তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়েছে আর শব্দতন্মাত্রের দ্বারা আকাশের উৎপত্তি হয়েছে। সুশ্রুত সংহিতায় আকাশকে সত্ত্বগুণ প্রধান বলা হয়েছে। প্রশস্তপদ ভাষ্য অনুসারে আকাশে শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ এবং বিভাগ এই ছয়টি গুণ থাকে। কোন জায়গায় আসা যাওয়া দ্বারা এই দ্রব্যের অনুমান করায় যে সেখানে আকাশ আছে। কারণ মর্ত স্থানে গতি ক্রিয়া আকাশ ছাড়া সম্ভব নয়। আকাশ সকল মূর্ত দ্রব্যের আরাম্ভক হওয়ার কারণে আকাশকে কারণ দ্রব্য বলা হয়। যখন এই আকাশ পঞ্চাভৌতিক মূর্ত দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন তা কার্যাকাশ নামে অভিহিত হয়। এই আকাশের দ্বারা সকল স্থাবর এবং জঙ্গম দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। আবার আকাশেই তারা লীন হয়ে যায়। এই কারণে সকল দ্রব্যে আকাশকে শ্রেষ্ঠ মহাভূত বলা হয়েছে।

শ্রবণেন্দ্রিয়, শব্দ, সূক্ষমতা, লঘুতা এবং বিবেক এই পাঁচটি আকাশাত্মক, শিরা, স্নায়ু, অস্থি অবকাশ যুক্ত ভাগ এবং ছিদ্র সমূহ সকলই আকাশাত্মক। গর্ভস্থ ভ্রূণের বিস্তৃতি করে বিশাল আকৃতি প্রদান করার কাজও আকাশ করে থাকে। আকাশের প্রধান ইন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয় এবং এর গুণ হল শব্দ।[১৪]

চরকসংহিতাতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটিকেই পঞ্চমহাভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় সকল পদার্থই যে পঞ্চাভৌতিক এটাও বলা হয়েছে। সুশ্রুতসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে মহাভূত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ বিশিষ্ট। আকাশ সত্ত্ব প্রধান, বায়ু রজঃ প্রধান, অগ্নি সত্ত্ব ও রজঃ প্রধান, জল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রধান এবং পৃথিবী তমঃ প্রধান।[১৫]

মরুৎ বা বায়ু:

বায়ুর গুণ স্পর্শ এবং এর কার্য হল শুষ্কতাদি। শুষ্কতাদি এবং স্পর্শের সমবায়ী কারণ হল বায়ু অতএব বায়ুকে দ্রব্য বলা যায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বায়ুকে শরীরের মূল তত্ত্ব ধরে নিয়ে যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়া ও রচনার কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেহেতু বায়ুর বিশেষ কর্ম চলন। চলনের জন্য ক্রিয়া, গতি, বেগ, কম্পন, উৎবেদন, আকুঞ্চন, প্রসারণ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এছাড়া আহার এবং ঔষধাদিতে রুক্ষতা, বিশদতা, খরতা উৎপন্ন করা বায়ুর কাজ। বায়ুতে প্রকৃতির রজ গুণের প্রাবল্য থাকায় বায়ু চঞ্চল।

বায়ু স্বক্রিয় এটি সীমিত পরিধির মধ্যে থাকে। মহাঊর্ধ্ব অন্তরীক্ষে বায়ু থাকে না সুতরাং বায়ুর একটি সীমিত পরিধি আছে বলেই তা বিভু নয়। এই কারণেই বায়ুর গতি আছে। ভৌতিক দ্রব্যে যেখানে যেখানে স্পর্শ, চলন, গতি, ক্রিয়া, চঞ্চলতা, স্পন্দন, কম্পন, বেগ ইত্যাদি প্রকাশ পায় সেখানেই বায়ু মহাভূতের অস্তিত্ব আছে তা বোঝা যায়। যে কোন বস্তুরই সীমা থাকলে তা স্পর্শযোগ্য হয়।

বায়ু থেকেই এই স্পর্শ গুণ পরাদির ক্ষুদ্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেমন বায়ু থেকে তেজ, তেজ থেকে জল, জল থেকে ক্ষিতি অধিক স্পর্শ গুণ যুক্ত বলেই ক্রমশ এদের আদান-প্রদানের ক্ষমতা বেশী। স্পর্শের স্বল্পতম পরিধির জন্য স্ফুটন হয়ে থাকে।[১৬]

তেজ বা অগ্নি:

তেজ বা অগ্নির কর্ম হল দাহ করা এবং উষ্ণতা হল তেজের গুণ। এই দুইটি সমবায়ী কারণও তেজ অতএব তেজকে দ্রব্য বলা হয়। আয়ুর্বেদে শরীর রূপী অগ্নিকে পিত্ত বলা হয়। কারণ পিত্তই অগ্নির রূপান্তরিত অবস্থা বা অগ্নি পিত্তের অন্তর্গত। দৃষ্টিশক্তি এবং চক্ষু ইন্দ্রিয় রচনার ক্ষেত্রে অগ্নির প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে।[১৭] তেজ দুই প্রকার—নিত্য এবং অনিত্য যা কার্যরূপ। চক্ষু ইন্দ্রিয়, শরীরে বর্ণ, রূপ, উষ্ণ, মেধা, ক্লান্তি, পবন শক্তি ইত্যাদি যা শরীরে পাওয়া যায় তা তেজ মহাভূতাত্মক।[১৮]

জল বা অপ্:

জলের কর্ম হল তৃষ্ণানিবারণ করা এবং গুণ হল শীত এই গুণ ও কর্মের সমবায়ী কারণও জল অতএব জল দ্রব্য। শরীরের যে রস, রক্ত, স্বেদ, ক্লেদ, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা ইত্যাদি সেগুলি জল বা অপ এরই বিভিন্ন রূপ। সূক্ষ্ম অপ্ই রস তন্মাত্র, যা রূপ পরিবর্তন করে অপ্মহাভূত বা জলরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

রূপ, রস এবং শব্দ গুণ অপ্ এর মধ্যে বর্তমান, তার মধ্যে রস সর্বাধিক, যার ফলে অপ্ দ্রব্যে দ্রবত্ব, স্নিগ্ধতা, শৈত্য এবং মাধুর্য্য ভৌতিক গুণ থাকে। অপের বিশেষ গুণ হল রস। অপের কারণে দ্রব্য গুলির মধ্যে ষড়রসের অনুভূতি হয়।

মধুরাদি রস, রসনেন্দ্রিয়ের বিষয়। জিহ্বাকে রসনেন্দ্রিয় বলা হয়। অপ্মহাভূত এবং রস তন্মাত্র জিহ্বাতে অধিষ্ঠান করে। যার ফলে জিহ্বাতে রস গ্রহণের শক্তি উৎপন্ন হয়। জগতে যতগুলি সরস, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল বস্তু আছে সকলের মধ্যেই অপের আধিক্য আছে। রসনেন্দ্রিয, দ্বেষ, ক্লেদ, রক্ত, মুত্র, স্নেহাদি দ্রব্য যা শরীরে পাওয়া যায় তা সকলই জলের দ্বারা উৎপন্ন।[১৯]

পৃথিবীঃ

পৃথিবী দ্রব্য কেননা পৃথিবীর কর্ম স্থুল ঘটাদি আর পৃথিবীর গুণ গন্ধ। কার্য ঘট ও গুণ গন্ধের আশ্রয় এই পৃথিবী। ঘটাদি এবং গন্ধ পৃথিবীতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। দ্রব্যের লক্ষণে বলা হয়েছে যে কর্ম এবং গুণ যেখানে সমবায় সম্বন্ধে থাকে সেটা দ্রব্য। এখানে আমরা দেখছি গুণ গন্ধ এবং কর্ম স্থুল ঘটাদি পৃথিবীতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। অতএব পৃথিবীকে দ্রব্য বলা যায়। পৃথিবী যোনিজ ও অযোনিজ ভেদে দুই প্রকার।[২০] জরায়ুজ এবং অন্ডজকে যোনিজ এবং স্বেদজ ও উদ্ভিজকে অযোনিজ বলা হয়। সূক্ষ্ম পরমাণুরূপ এবং পৃথিবী নিত্য। দ্রব্যরূপ স্থুল পৃথিবী অনিত্য। অনিত্য হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টির আরম্ভ থেকে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়ে সৃষ্টির লয় পর্যন্ত স্থায়ী থাকে তাই ক্ষিতিকে দ্রব্য সকলের কারণ দ্রব্য বলা হয়। যে কোন কঠিন স্থির দ্রব্যের রূপ,

রস, গন্ধ এবং স্পর্শ আছে। শরীরের মধ্যে সূক্ষ্ম গন্ধ বা গন্ধ তন্মাত্রের সর্বাধিক উপস্থিতি বা উপাদান দ্বারা নাসিকা যন্ত্র উৎপন্ন হয়েছে। চরকের মতানুসারে গর্ভকালে তৃতীয় মাসেই ঘ্রানেন্দ্রিয়, গৌরব, মূর্তি বা কাঠিন্য উৎপন্ন হয় যা পৃথিবী মহাভূতাত্মক।[২১]

আত্মাঃ

আত্মা নির্বিকার, আত্মায় নিত্য, সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, ইচ্ছা, ধর্ম, অধর্ম ইত্যাদি গুণ আছে। এগুলির সমবায়ী কারণও আত্মা। অতএব আত্মাও দ্রব্য। কারণ দ্রব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যা গুণও কর্মের সমবায়ী কারণ তাই দ্রব্য। আত্মা সম্বন্ধে চরকসংহিতার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সূত্রস্থান, বিমানস্থান এবং বিশেষ করে শারীরস্থানে আত্মাতত্ত্ব বিশদ আলোচনা লক্ষ্য করা যায়।

চরকসংহিতায় আত্মার পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, আত্মা সূক্ষ্ম, এর কোন বিকার নেই। বাহ্য বিষয় এবং ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃইন্দ্রিয় মনের সঙ্গে সংযোগের ফলে যে জ্ঞানের উদ্ভব হয় তার কারণ হচ্ছে আত্মা। আত্মা নিত্য এবং সব কিছুর দ্রষ্টা ও সব ক্রিয়ার সাক্ষী।[২২] আত্মা নিজে স্বরূপতঃ নির্বিশেষ, কিন্তু মন ও শরীরগত পার্থক্য হেতু এতে বিশেষ উপলব্ধি হয়।[২৩] ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন, চেতনা, ধৃতি, বুদ্ধি, স্মৃতি ও অহংকার এই গুণগুলি পরমাত্মার জ্ঞাপক বলা হয়েছে। এখানে কিন্তু পরমাত্মা বলতে ঈশ্বরকে বোঝানো হয়নি। শরীর অধিষ্ঠিত দেহস্থিত আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য পরম আত্মা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মা

এই অর্থেই পরমাত্মা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই লক্ষণ গুলি জীবিত ব্যক্তিতেই দেখা যায়, মৃত ব্যক্তিতে দেখা যায় না। এজন্য শাস্ত্রকারেরা এই বিষয় গুলিকে আত্মার লিঙ্গ বলেছেন। শরীর চেতনার আশ্রয় নয়। যদি শরীর থেকে আত্মা চলে যায়, তাহলে শরীর কেবলমাত্র প্রাণহীন দেহে পরিণত হয়। পঞ্চমহাভূত অবশিষ্ট থাকায় দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। সেই সময় দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে এবং প্রাণী মৃত্যু মুখে পতিত হয়।[২৪]

আত্মাকে আত্মজ্ঞেরা নিষ্ক্রিয়, স্বতন্ত্র, বশী, সর্বগ, বিভু ও সাক্ষী ইত্যাদি নামে অভিহিত করে থাকেন।[২৫] চরকসংহিতার আত্মাকে আবার অব্যক্ত, শাশ্বত, বিভু বলা হয়েছে।[২৬]

আত্মা বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় হলেও কর্মানুসারে তাকে ফল ভোগ করতে হয়। আত্মা বশী তাই তা মনকে সমাহিত করতে পারে। আত্মা সর্বগত, সেই কারণে দেহে আবদ্ধ হলে কেবলমাত্র নিজের স্পর্শনেন্দ্রিয়েই বেদনা অনুভব করতে পারে। আত্মা সর্বগত এবং মহান, সেইজন্য এটিকে বিভু বলা হয় পর্বত প্রাচীরাদি দ্বারা ব্যবহিত পদার্থও মনের সমাধির দ্বারা দেখতে পায়।[২৭] সকল প্রাণী প্রাণের সঙ্গে নিজেকেও নিজের আত্মার দ্বারা সব যোনিতে সম্মিলিত করে। যোনি বিশেষে প্রাণিগণ নিজে নিজেই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এরা কেউ কারও সঘটক হয় না।[২৮] আত্মা দেহ বিশেষে এবং কর্মফল বিশেষে অনুরূপ ভাবাপন্ন মনের সঙ্গে নিত্য অনুবন্ধ বিশিষ্ট বলে এক যোনিস্থিত হলেও আত্মাকে সর্বযোনিগত বলা হয়ে থাকে।[২৯]

মন:

মনের মধ্যে অনুত্ব আর একত্ব গুণ আছে। মনের কার্য চিন্তা, বিবেচনা এবং এগুলির সমবায়ী কারণও মন। অতএব মন একটি দ্রব্য। আয়ুর্বেদ অনুসারে মনের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে জ্ঞানের ভাব ও অভাব মনের লক্ষণ অর্থাৎ মনের অস্তিত্ব, জ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব দ্বারা জানা সম্ভব। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ, এদের সংযোগ হলেও মনেরযোগ ভিন্ন ইন্দ্রিয়জ্ঞান নিষ্পন্ন হতে পারে না। অতএব মন একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য। অণুত্ব ও একত্ব মনের দুটি গুণ। অণু শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম ও এক শব্দের অর্থ অসংশ্লিষ্ট। যার দ্বারা চিন্তা, বিচার, তর্ক, ধ্যান বা সঙ্কল্প করা যায় ও যা জ্ঞেয় তাই মন। ইন্দ্রিয় চালনা ও নিজের চালনা, মনের এই দুইটি কর্ম, তর্ক ও বিচারের দ্বারাই উৎপন্ন হয় এবং তারপর বুদ্ধি প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় যে ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রহণ করে তা মনের সাহায্যেই করে থাকে।[৩০] চরকসংহিতার সূত্রস্থানের ৮ম অধ্যায় মনের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হল মন, মনের বিষয়, বুদ্ধি ও আত্মা এই কয়েকটি আধ্যাত্মিক দ্রব্য। এই গুলিই শুভাশুভ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির হেতু। পুরুষের ক্রিয়া দ্রব্যাশ্রিত অর্থাৎ দ্রব্য না থাকলে ক্রিয়া হয় না। ইন্দ্রিয় সকল পঞ্চমহাভূতের বিকার। তেজ চক্ষুতে, আকাশ কর্ণে, ক্ষিতি ঘ্রাণে, জল রসনে, বায়ু স্পর্শনে বিশেষরূপে আছে। যে ইন্দ্রিয় যে মহাভূতে নির্মিও, সেই ইন্দ্রিয়ের সেই স্বভাব বিশিষ্ট্য। তাই সেই মহাভূতোপকরণ বিষয়েরই অনুসরণর করে। সেই বিষয়ে অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ হলে মন ইন্দ্রিয় বিকৃত হয় তখন বুদ্ধিনাশ হয়। আর সেই বিষয়ের যথাযোগ হলে মন ও ইন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ থাকে এবং বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়। মনের বিষয় চিন্তা, মন ও বুদ্ধির

যথাযোগ, অতিযোগ, হীনযোগ ও মিথ্যাযোগ প্রকৃতি ও বিকৃতির কারণ। যাতে ইন্দ্রিয় ও মন প্রকৃতই থাকে তার যত্ন করা উচিত। মন, বিষয় ও আত্মার সন্নিকর্ষ হলে মনের চেষ্টা নির্বাহিত হয়। স্বার্থ, ইন্দ্রিয়ার্থ ও সঙ্কল্পের বিভিন্নতা বশতঃ একই পুরুষে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন বিভিন্ন গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এক পুরুষের অনেক মন নেই।

ইন্দ্রিয় সকল মনের অনুবর্তী বলেই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। চরকসংহিতায় সর্ব প্রথম মনের স্থান আধ্যাত্মদ্রব্য গুণ সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩১] এখানে আত্মা অধিষ্ঠিত মন ও বুদ্ধিকে শরীরাবয়ব সমূহের প্রয়োজক কর্তা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মন আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হলে একে শরীরের নিয়ামক বলে।[৩২]

শরীর দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হলে আত্মার সুখ, দুঃখ ভোগ হয় না, শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতে সমবেত হয়েই জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা ইত্যাদি আত্মার বিশেষ গুণগুলি উৎপন্ন হয়। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগও ঐ আত্মায় সমবায় সম্বন্ধে থাকে। অতএব শরীরের মত মনও আত্মার ভোগের সাধক।

সংখ্যা, পরিমাণ, সংযোগ, বিভাগ, পৃথকত্ব, দৈশিক, পরত্ব ও অপরত্ব এবং বেগ নামক সংস্কার—এই কয়টি মনের গুণ। আত্মা সংখ্যায় বহু হওয়ায় মনও সংখ্যায় বহু। একটি মন অন্য মন থেকে পৃথক। অতএব মনে পৃথকত্ব ধর্ম আছে।

মনের পরিমাণ হল অণু-পরিমাণ। মন দ্রব্য বলে তা অন্য দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয় আবার বিভক্ত হয়। কাজেই সংযোগ এবং বিভাগও মনের গুণ। আবার দিক দ্রব্যটির সঙ্গে সংযোগের ফলে মনে দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব গুণ আছে। বেগ নামক গুণটি মূর্ত দ্রব্যে থাকে। মন অণু-পরিমাণ বিশিষ্ট মূর্ত দ্রব্য। এজন্য মনে বেগ নামক গুণও আছে। মনেরও ক্রিয়া আছে। মন অত্যন্ত চঞ্চল, অত্যন্ত দ্রুতগামী দ্রব্য। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যে ক্রিয়া থাকে। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারটি দ্রব্যে স্পর্শ থাকে। মনের ক্রিয়া আছে কিন্তু স্পর্শ নেই। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে গেলেই কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের দরকার হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি ইন্দ্রিয় ছাড়া না হয়, তাহলে সুখ, দুঃখের প্রত্যক্ষের জন্যও কোন না কোন ইন্দ্রিয় দরকার। বাহ্য ইন্দ্রিয় গুলির সাহায্যে আত্মার সুখ, দুঃখ ইত্যাদির প্রত্যক্ষ হতে পারে না, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। সুখ ও দুঃখকে আমরা কেউই চোখ, কান ইত্যাদির সাহায্যে জানি না। কোন বাহ্য ইন্দ্রিয় দিয়েই যখন সুখ, দুঃখ ইত্যাদির অনুভব সম্ভব নয়, বাহ্য ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন এমন একটি অন্তর ইন্দ্রিয় স্বীকার করা দরকার, যার দ্বারা সুখ, দুঃখ ইত্যাদির প্রত্যক্ষ সম্ভব। এই অন্তর ইন্দ্রিয়ের নামই মন। মন ছাড়া কেবল বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষও সম্ভব নয়। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হবে, মনের সঙ্গে চোখের সংযোগ হবে, চোখের সঙ্গে টেবিলের সংযোগ হবে। তবে টেবিলের প্রত্যক্ষ হবে।[৩৩]

অণু-পরিমাণ মন একই সঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে না। ন্যায়-বৈশেষিক বলেন, আত্মার ইচ্ছা ও প্রযত্নের দ্বারাই মন নিয়ন্ত্রিত হয়। রূপ, রস ইত্যাদি বাহ্য বিষয়গুলির মধ্যে যে বিষয়টির প্রতি জ্ঞাতার ইচ্ছা আছে এবং ইচ্ছা অনুযায়ী প্রযত্ন হয়েছে, সেই বিষয় গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই সেই ব্যক্তির মনের সংযোগ প্রথমে হয় এবং যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ হবে, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হবে। মন অণু-পরিমাণ বিশিষ্ট হওয়া নিরংশ ও নিত্য।[৩৪] এই মতের দ্বারা মন মধ্যম পরিমাণ বা বিভূপরিমাণ এই মতের বিরোধিতা করা হয়েছে। কারণ দর্শন শাস্ত্রে কোথাও কোথাও মনকে মধ্যম পরিমাণও বলা হয়েছে।

কাল:

যা উৎপন্ন হওয়া সকল দ্রব্যের জনক, জগতের আশ্রয় তথা পরত এবং অপরত বুদ্ধি যার দ্বারা প্রকটি হয় তাকে কাল বলা হয়। "কালঃ পুনঃ পরিণাম উচ্যতে।"[৩৫] কাল পরিণামকে কাল বলা হয়। পরিণামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যা সমস্ত প্রাণীর পরিবর্তন আনে তাকে পরিণাম বলা হয়। এই পরিণাম তিন প্রকারের হয়—অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ।

কালের পরিণামের দ্বারা ধর্ম-অধর্মরূপী শুভ-অশুভ কর্মের প্রভাব প্রাণীর উপর হয়ে থাকে। কালের পরিণামের দ্বারাই মানুষের বৃদ্ধাবস্থা তথা মৃত্যু জনিত রোগ স্বাভাবিক ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। আর কাল সমযোগে যুক্ত হলে প্রকৃতির হেতু বা স্বাস্থ্যের প্রতি কারণ হয়।

কাল যেখানে মহাকাল নামে পরিচিত যা স্বয়ম্ভু অর্থাৎ তা স্বয়ং উৎপন্ন হয়। এটি কারোর দ্বারা উৎপন্ন হয় না। এর আদি, মধ্য, অন্ত নেই এটি নিত্য। আচার্য সুশ্রুত বলেছেন দ্রব্যের রসের সম্যক রূপে থাকা বা উৎপন্ন হওয়া বা বিকৃত রূপে উৎপন্ন হওয়া এসকলই কালের অধীন। এই প্রকার প্রাণীর জীবন ও মৃত্যু কালের অধিন।[৩৬]

নিজ গতিবিশেষ থেকে কালের নিমেষ কাষ্ঠা, বালা, মুহূর্ত, অনুরাত্র, পক্ষ, মাস, অয়ন, বর্ষ আর যুগ এই প্রকার বিভাগ করা হয়। এখানে কালকে জ্ঞান হেতু মানবরূপে স্বীকার করা হয়েছে।[৩৭]

কাল প্রসঙ্গে বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে—অপরের দ্বারা কনিষ্ঠ পরের দ্বারা জ্যেষ্ঠ সকল জ্ঞানই কালের লক্ষণ। [৩৮] যা উৎপন্ন হওয়া সকল পদার্থের জনক জগতের আশ্রয় তথা পরত অপরত বুদ্ধির হেতু এই কাল এক কিন্তু উপাধি ভেদে বিভিন্ন বা অনেক। চরকসংহিতায় আবার বলা হয়েছে—যা শীত, উষ্ণ এবং বর্ষা লক্ষণ যুক্ত তথা পূর্ণ হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত ইত্যাদি ঋতু বিশিষ্ট সম্বৎসরকে কাল বলা হয়।[৩৯]

কালের গুণ:

কালের সামান্য গুণ পাঁচটি এগুলি হল সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ এবং বিভাগ।

কালের বিভেদক হেতু:

কালের ব্যবহারিক উপাধি সূর্যের গতি দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ গতির কারণেই ক্ষণ, কলা, কাষ্ঠা, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, বর্ষ, ঋতু, প্রয়োগ করা হয়। এই সমস্ত উপাধিতে কালের বিভেদক কারণ রূপে সূর্যকেই মানা হয়েছে। এই লোক ব্যবহারে সূর্যের দ্বারা কাল বিভাজন দিন, রাত্রি আর কোন বস্তুর বৃদ্ধি, স্থিতিতেও সহায়ক। কারোর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আয়ুর গণনা কালের দ্বারাই হয়ে থাকে।

কালের দ্রব্যত্ব সিদ্ধি:

কালকে কারণ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্রব্যের লক্ষণ অনুসারে কর্ম এবং গুণ সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে যাতে তাকে দ্রব্য বলা হয়। সূর্যক্রিয়ার কারণে গতিশীল হওয়া কর্মরূপ আর পরত আদি গুণের সমবায় সম্বন্ধের আশ্রয় হওয়ার কালের দ্রব্যত্ব সিদ্ধি হয়ে যায়। অতএব কালকে দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কাল সমস্ত কার্য দ্রব্যের কারণ হওয়ায় কালকে কারণদ্রব্য বলা হয়।

কালের ঔপাধিক ভেদ:

দার্শনিক মতে কাল এক, নিত্য এবং বিভু। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে কাল ত্রিবিধ- ভূত ভবিষ্যত এবং বর্তমান। প্রশ্ন হয় যে কাল এক হওয়া সত্ত্বেও কালের ভেদ কেন স্বীকার করা হয়? এর উত্তরে বলা হয় একই কালের দ্বারা সকল প্রকার প্রক্রিয়া এবং অনেক যোজনা একই সময় নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। অতএব দার্শনিক

দৃষ্টিতে কালের ভেদ স্বীকার না করলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীবনে অনেক কার্য সুসমতার জন্য কালে প্রকার ভেদ স্বীকার করতে হয়। একে কালের ঔপাধিক ভেদ বলা হয়েছে। এই ঔপাধিক ভেদ ত্রৈকালিক। ব্যবহারিক ভেদে সকল ক্রিয়ার সম্পন্ন করার জন্য বস্তুর উৎপত্তি এবং বিনাশের জ্ঞানের জন্য, বস্তু প্রারম্ভিক মধ্য এবং অন্তিম স্থিতির জ্ঞানের জন্য কাল সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আয়ুর্বেদে সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ নিবারণ হেতু প্রতিদিন দৈনিক ক্রিয়াকে কালের দ্বারা বিভাজিত করা হয়ে থাকে। ঋতু বিভাজনের দ্বারা দোষের ক্ষয়, বৃদ্ধি এবং কালজ রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। অয়ন, বর্ষণের দ্বারা সূর্যের আদান এবং বিসর্গ অবস্থার দ্বারা প্রাণীর জীবনে প্রভাব পড়ে। এই ররম ঔষধি উৎপত্তির সময় তার মধ্যে থাকা গুণ, ধর্ম কালের উপর নির্ভর করে। তথা ঔষধ সেবনাদিও কালের দ্বারা বর্ণনা করা হয়।

আয়ুর্বেদে কালের ভূমিকা:

আয়ুর্বেদে প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি, বিকার এবং বিনাশে কাল বিশেষ রূপে সহায়ক। দোষ এবং ধাতুর উৎপত্তি বিকৃতি। শরীরে ক্ষমতা অথবা বিষমতা রোগ উৎপত্তির কারণ। ঋতু আদির কালের সাথে এদের বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। শরীরে দোষের স্থিতি সম করার জন্য বা শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োগ করা হয় সেই সকল দ্রব্যের উৎপত্তি, গ্রহণ তথা ঔষধি আদির গ্রহণ ও কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ তাৎপর্য এই যে কালের পরিনামের অনেক

প্রতিক্রিয়া আছে। চরকসংহিতার বিমান স্থানে বর্ণিত দশবিধ পরীক্ষণ বিষয়ের মধ্যে কাল অন্যতম। এজন্য বলা হয়েছে কাল পুনঃপরিনাম বা ঋতু, মাস, অয়ন এবং বর্ষ আদি স্বয়ং পরিনামশীল। পরীক্ষার বিষয়েও কালের উল্লেখ করা হয়েছে। সুশ্রুত সংহিতায় অষ্টাঙ্গ কালের ভূমিকা প্রদর্শন করা হয়েছে।

দোষাদি সংচয়াদি কাল। শরীরের মূলভূত উপাদান রূপে ত্রিদোষকে মানা হয়েছে। তার গর্ভাশয়ে শরীর নির্মাণে সক্রিয় যোগদান করে যার দ্বারা মনুষ্য প্রকৃতি তৈরী হয়। প্রতিদিন শরীর নির্মাণ হেতু এবং ক্রিয়া সম্পাদনের হেতু গ্রহণ করা আহারাদি দ্বারা ঐ সকল দোষের উৎপত্তি হয়ে থাকে এবং এই দৈনিক উৎপন্ন হওয়া দোষের দ্বারা প্রাকৃতিক দোষের শমনের সাথে সাথে শরীরের প্রশমনও হয়ে থাকে। তিনটি দোষের স্বভাব ষড় ঋতুর দ্বারা আধারিত হওয়ার কারণে ক্রমশ এক ঋতু থেকে উত্তরোত্তর তিনটি ক্রিয়া চলতে থাকে। যথা বাত দোষ গ্রীষ্ম ঋতুতে অনুকূল বাতাবরণ দ্বারা অধিক সঞ্চালিত হয়। বর্ষা ঋতুতে প্রকোপ কারণের দ্বারা প্রকোপিত হয়ে শরৎ ঋতুতে শমন হয়ে থাকে। এর থেকে বলা যায় প্রত্যেক দোষের সঞ্চারাদি কাল দ্বারা নির্ণয় করে রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং বিশেষ উপদেশ দেওয়া হয়।

ঔষধি সেবন কালঃ

রোগ, আয়ু, ঋতু, দেশ, আদির দ্বারা রোগ অনুসারে ঔষধির যে নির্ণয় করা হয়ে থাকে তাতে কালের বিশেষ ভূমিকা আছে। ঔষধি সেবন করার জন্যেও কালের

বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন—প্রাত-সকাল, মধ্যদিন, সন্ধ্যা, রাত্রি ভোজন করার সময়, ভোজন করার আগে ঔষধি গ্রহণ ইত্যাদি নিয়ম কালের দ্বারাই নির্ণয় করা হয়। চরকসংহিতায় বিমান স্থানে কার্য এবং অকার্যকে মাথায় রেখে রোগের অবস্থাতেও কাল এবং অকালের বিভাজন করা হয়েছে। এই ঔষধি কালের কারণ, ওই ঔষধি কালের অকারণ এই ব্যবস্থার দ্বারাও চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

বনৌষধ গ্রহণ কাল:

রোগ নিবারণে স্বাস্থ্য রক্ষার হেতু যে বনস্পতি দ্রব্যের প্রয়োগ করা হয় তারমধ্যে কালের উল্লেখ করা থাকে। অর্থাৎ কোন ঋতু অথবা কালে কোন ঔষধি উপযুক্ত সেটা বুঝে গ্রহণ করা উচিত। কোন কালে পত্র, কোন কালে ফল, মূল, পুষ্পাদি গ্রহণ করা হবে তাও কালের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ঔষধির সবীর্য এবং নির্বীর্য:

কোন ঋতু বা কালে বনস্পতি সবীর্য বা নিবীর্য হয় তাও কাল নির্ধারণ করে। গঙ্গাধর জল্পকল্পতরু টীকায় নিমিত্ত ঔষধির কাল নির্ণয় করে ঔষধি কত সময় পর্যন্ত তা কার্যকর হবে তা স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন—চূর্ণাদি চার মাস পর্যন্ত, জোড়িবটি এক বছর পর্যন্ত এবং ঘি, তৈলাদি ৩-৫ বছর পর্যন্ত কার্যকর হবে।

বিভিন্ন রোগের কাল:

দোষ অনুসারে উৎপন্ন হওয়া রোগের নির্ণয়ও কালের দ্বারাই করা হয়ে থাকে। যেমন—সাধ্য, অসাধ্য প্রভৃতি রোগের অবস্থা কালের দ্বারাই নির্ণয় করা হয়ে

থাকে। যেমন—বাল্য, যুবা তথা বৃদ্ধাবস্থায় উৎপন্ন রোগ কালের আধারে করা হয়। আয়ুর্বেদে রোগ এবং রোগীর পরীক্ষাও কাল দ্বারা নির্ধারিত হয়।

স্থুল ব্যক্তি এবং রোগী ব্যক্তি আহার গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও কালের বিশেষ সম্বন্ধও রয়েছে। সম্যক কালে গ্রহণ করা আহার স্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোগ নিবারণেও সহায়ক। রাতে শয়ন, দিনে জাগরণ, জন্ম এবং মৃত্যু আদি কালের দ্বারা নির্ণয় হওয়ার ফলে আয়ুর্বেদে কালের বিশেষ প্রয়োগ বা গুরুত্ব দেখা যায়।[৪০]

রোগের অবস্থা অনুসারে রোগীকে আহার বিহার পালন করতে হবে। বাত, পিত্ত এবং কফ দোষ দিন রাত্রির প্রথম ভাগ, মধ্য ভাগ, অন্তিম ভাগ স্বভাবের দ্বারাই বৃদ্ধি ও ক্ষীণ হয়ে থাকে। দোষের পচনেও কালের মহত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোন ঔষধ কোন সময় সেবন করা অধিক লাভদায়ক হবে তার বিচারও আয়ুর্বেদে বিস্তৃত রূপে করা হয়েছে। বিভিন্ন ঋতু তথা ঋতু পরিবর্তন স্বাস্থ্যে সরাসরি প্রভাব ফেলে। বস্তুর স্বাস্থ্য তথা অস্বাস্থ্যে কালদ্রব্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রোগ মূলত তিনটি কারণে হয়ে থাকে। তার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি। সেখানেও কালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কালের পরিমাণের দ্বারাই মানুষের বৃদ্ধাবস্থা তথা মৃত্যু আদি স্বাভাবিক স্থিতি হয়।[৪১] প্রায়োগিক ধুমপানের জন্য চরকসংহিতায় আটটি উপযোগী কালের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[৪২] আয়ুর্বেদে কালবিরুদ্ধ আহার এবং ঔষধি সেবনকে হানিকারক বলা হয়। যেমন রাত্রিকালে দধি সেবন নিষিদ্ধ।

দোষের উৎপত্তি প্রকোপ তথা শমন স্থিতিতে ঋতুচক্রের প্রভাব পড়ে। যেমন পিত্তদোষ বর্ষা ঋতুতে উৎপত্তি, শরৎ ঋতুতে প্রকোপ এবং হেমন্ত ঋতুতে শমন হয়ে থাকে। কফ দোষ হেমন্ত ঋতুতে উৎপত্তি, বসন্ত ঋতুতে প্রকোপ এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে শান্ত হয়ে থাকে। বাতদোষ গ্রীষ্ম ঋতুতে উৎপত্তি শরৎ ঋতুতে শমন হয়। দোষ এবং অধিক প্রকোপের স্থিতিতে সংশোধন অর্থাৎ বাতদোষের জন্য বস্তি, পিত্ত দোষের জন্য বিরেচন তথা কফ দোষের জন্য বমনের উপযোগিতা নির্দেশিত করা হয়েছে।

দিক:

আয়ুর্বেদ অনুসারে দিককে কারণ দ্রব্যের অন্তর্গত করা হয়েছে এবং দিককে অমৃত দ্রব্যও বলা হয়েছে। এর অপেক্ষা ওটি দূরে, ওর অপেক্ষা এটা কাছে, এই প্রকার জ্ঞান যার জন্য হয়ে থাকে তাকে দিক বলা হয়। এটা এক এবং নিত্য। কিন্তু উপাধির জন্য এর ভেদ করা হয়েছে।

আচার্য গঙ্গাধরের মতানুসারে যার কারণে এটা পূর্ব এটা পশ্চিম এমন বলা হয় তাকে দিক বলা হয়। তর্কসংগ্রহে আমরা দিকের এমন লক্ষণ লক্ষ্য করি সেখানে বলা হয়েছে ‘এটা পূর্ব, এটা পশ্চিম, এটা উত্তর এটা দক্ষিণ’। এই প্রকার যে ব্যবহার হয়ে থাকে সেই ব্যবহারের হেতু হল দিক। যাকে দেশও বলা হয়েছে।

এটা ওটার থেকে দূরে এই জ্ঞানের কারণ হিসাবে পরত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। এটি ওটার থেকে কাছে এই ব্যবহারের কারণ হিসাবে অপরত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে পরত্ব ও অপরত্ব কাকে বলে? তার উত্তরে বলা হয় যে দ্রব্য অধিক সংযুক্ত সংযোগের আশ্রয় তাকে পর এবং যে দ্রব্য অল্প সংযুক্ত সংযোগের আশ্রয় তাকে অপর বলা হয়েছে। এই প্রকার লোক ব্যবহারে পরকে দূর এবং অপরকে নিকট বলা হয়।

কালের মত দিকও এক নিত্য কিন্তু দিকের স্থিতি অনুসারে ঔপাধিক বিভাগ বা ভেদ করা হয়েছে। বাস্তবে দিকের কোন ভেদ নেই কেবল অপেক্ষাকৃত স্থিতির কারণেই তার নামকরণ বা তার উপাধি পূর্ব, পশ্চিম করা হয়েছে। যেমন একটি শহর অন্য শহরে পশ্চিমে রয়েছে তাহলে ওই শহর তার পরবর্ত্তী শহরে পূর্বে রয়েছে। দিকে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ তা পাঁচটি গুণ থাকে।

দিক এর ভেদ স্বীকার করা হলেও দিক একটাই। কিন্তু ঔপাধিকরূপে দিককে দশ ভাগে ভাগ করা হয়। সেইগুলি হল—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব উত্তর, উত্তর পশ্চিম, পশ্চিম দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব, উর্দ্ধদেশ এবং অধঃদেশ, দিক নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সূর্যের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

আয়ুর্বেদ দিকের গুরুত্ব: আয়ুর্বেদে দিককে কারণ দ্রব্য রূপে স্বীকার করা হয়েছে এবং তার ব্যবহারিক দিকও দেখানো হয়েছে। আয়ুর্বেদে দিকের বর্ণনা করা হয়েছে।

১। শরীর জ্ঞানে দিকের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। দিকের ওপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি কোন অবয়ব কোথায় স্থিত হয়ে আছে। যেমন বলা হয় অমুক অঙ্গ শরীরের অমুক অঙ্গের বাইরে বা ভিতরে, বাদিকে বা ডান দিকে, উর্ধ্বে বা অর্ধ, আগে বা পিছনে আছে। এর দ্বারা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে শরীর জ্ঞানের ক্ষেত্রে দিকের জ্ঞান আবশ্যিক।

২। ঔষধি সংগ্রহের হেতু বিভিন্ন দিকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন উত্তর দিকে স্থিত হিমালয়ের ঔষধিকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

৩। আয়ুর্বেদে দোষের গতিও দিকের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন—বলা হয় দোষটি উর্দ্ধগতি, অধোগতি বা তির্যকগতি সম্পন্ন।

৪। কতিপয় রোগের লক্ষণের বর্ণনাও দিকের দ্বারা দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন—উর্দ্ধরক্তপিত্ত।

৫। কিছু রোগের সাধ্য সাধ্যতাও দিকের দ্বারা নির্ণয় করা হয়। যেমন—উর্দ্ধ বা অধো সমস্ত দিক অর্থাৎ শরীরের সমস্ত দিকের ছিদ্র থেকে যদি রক্তপিত্ত বাইরে নিঃসৃত হয় তাহলে সেই রোগের চিকিৎসা অসাধ্য।

৬। আচার্য বাগ্ভট তার আয়ুর্বেদ সংগ্রহ গ্রন্থের সূত্রস্থানে ১২ নং সূত্রে বলেছেন বায়ুগুণের নির্ণয় দিকের দ্বারা করা যায়। যেমন—পূর্বদিকের বায়ু, উষ্ণ, তা অর্শ, কৃমি ইত্যাদির উৎপাদক। পশ্চিমদিকের বায়ু শীতল। তা দাহ এবং তৃষ্ণাদি নিবারণ করে। এই প্রকার দক্ষিণ দিকের বায়ু শ্রেষ্ঠ কারণ তা বলদায়ক। উত্তরদিকের বায়ু স্নিগ্ধ, মৃদু, মধুর, কষায় শীতল তথা স্বাস্থ্যকর।

৭। বাগ্ভট্টাচার্য তার আয়ুর্বেদ সংগ্রহ গ্রন্থের সূত্রস্থানে বিভিন্ন দিকের দ্বারা জলের গুণের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন প্রাচ্যাদি নদীর জল অর্শোৎপাদক, বিন্ধ্য পর্বতোৎপন্ন নদীরজল পাণ্ডু, কুষ্ঠোৎপাদক তথা পারিযাত্রা নদীর জল ত্রিদোষ শমক, বলাদি গুণ যুক্ত।

৮। আয়ুর্বেদে দিকানুসারে স্থিতভূমিকে দিক বলে। আমুপ, সাধারণ, জঙ্গল ভেদ তিন প্রকার দেশের কথা স্বীকার করা হয়েছে। তিনটি দেশের লক্ষণের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা দেশ বিশেষ যে দোষাদি সাথে যুক্ত তাও বলা হয়েছে। তাই রোগ নিদানে দেশপরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৯। দেশ অনুসার শরীর গঠন এবং তার চিকিৎসারও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই কারণে চরকসংহিতার বিমান স্থানের অষ্টম অধ্যায়ে

বলা হয়েছে রোগী কোন দেশে জন্ম হয়েছে? সেখানের আহার-বিহার কেমন এই সকল বিষয় জেনেই রোগীর চিকিৎসা করা উচিত।

পুরুষ:

চরকসংহিতার সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে শরীর, মন ও আত্মার সংযোগই রূপই হচ্ছে পুরুষ। সেই পুরুষেতেই সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, অজ্ঞান, বিষয়, বাসনা, সবকিছুই থাকে। এই পুরুষ চেতন আত্মার সংযোগে গঠিত হওয়ার কারণে চেতন এবং সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সবকিছুর আধার হয়ে থাকে। এই তিনটি যতদিন না বিচ্ছিন্ন হচ্ছে ততদিন লোক জীবিত থাকে। চেতন এই পুরুষকে উদ্দেশ্য করেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সমস্ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে।[৪৩]

পুরুষ বিষয়ে কঠোপরিনষদের সাথে আয়ুর্বেদের মত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ আমরা দেখি কঠোপনিষদে বলা হয়েছে যে, মহৎ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ থেকে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত থেকে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, পুরুষ থেকে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। এই পুরুষই হচ্ছে সকলের পরাকাষ্ঠা ও পরমগতি।[৪৪]

পুরুষের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে সেই বিষয়ে চরকসংহিতায় নানা মত লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত: আত্মা পুরুষের এবং তার রোগের কারণ বলে আত্মা থেকে পুরুষের উদ্ভব হয়েছে। এই পুরুষই সকল কর্ম করে এবং কর্মের ফল

নিজেই ভোগ করে। চৈতন্য স্বরূপ আত্মার সম্মিলন না হলে পুরুষের সুখ দুঃখের প্রবৃত্তি সম্ভব হত না।[৪৫]

দ্বিতীয়ত: শরীর যদি না থাকলে শরীর ধারণকারীদের রোগ সমূহ ও মনের স্থিতিও সম্ভব হত না। রসের দ্বারা ই প্রাণী ও তাদের রোগসমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে। আবার রসের উৎপত্তি জল থেকে হয়। অতএব জল থেকেই পুরুষের ও তার রোগসমূহের উৎপত্তি হয়েছে।[৪৬]

তৃতীয়ত: পুরুষকে ষড়ধাতুজ বলা হলেও মাতাপিতা ছাড়া পুরুষের উৎপত্তি কখনই সম্ভব নয়। যেমন—পুরুষ থেকে পুরুষ জন্মায়, গো থেকে গো জন্মায়, তেমনি মাতাপিতা থেকেই পুরুষের সেই সকল রোগের উদ্ভব হয়। অতএব মাতাপিতাই ওই পুরুষের উৎপত্তির কারণ।[৪৭]

চতুর্থত: কর্ম থেকেই পুরুষের উদ্ভব। যদি পুরুষের উৎপত্তির কারণ কেবলমাত্র মাতাপিতা হয়, তাহলে অন্ধ পিতামাতা থেকে অন্ধ পুত্র জন্মগ্রহণ করত, কিন্তু তা হয় না। অতএব কেবলমাত্র পিতামাতা পুরুষের উৎপত্তির কারণ নয়। পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্মকে এক্ষেত্রে কারণ বলা হয়েছে। অতএব কর্ম ছাড়া পুরুষ এবং তার রোগের উৎপত্তি সম্ভব নয়। [৪৮]

চরকসংহিতার শারীরস্থানে কর্ম থেকে যে পুরুষের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। সেই পুরুষ অনাদি হওয়ায় তার কোন কারণ স্বীকার করা যায় না। মোহ, ইচ্ছা ও দ্বেষকৃত ইত্যাদি কর্ম্ম থেকেই রাশিসংজ্ঞক পুরুষ উৎপন্ন হয়। [৪৯]

পঞ্চমত: যেহেতু কর্তা ছাড়া কর্ম সম্ভব নয় তাই অকৃতকর্মের ফল থেকে পুরুষের জন্ম হয় এই কথা স্বীকার করা যায় না। এই জন্য পুরুষ ও রোগসমূহের উৎপত্তির কারণরূপে স্বভাবকে স্বীকার করতে হয়। যেমন সৃষ্টির প্রথমে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুত এই সকল পদার্থের যথাক্রমে খরত্ব, দ্রবত্ব, উষ্ণত্ব ও চলত্ব প্রভৃতি গুণগুলি স্বভাব থেকে উৎপন্ন হয় সেইরূপ পুরুষ এবং রোগ উভয়ই স্বভাব থেকে জন্মায়।[৫০]

পুরুষের স্বরূপ:

যে পুরুষ অনাদি তা নিত্য। কিন্তু যে পুরুষের উৎপত্তি আছে অর্থাৎ যে পুরুষ কোন না কোন কারণ থেকে উৎপন্ন সেই পুরুষকে নিত্য বলা যায় না। যেমন— ঘট পট প্রভৃতি উৎপত্তিধর্মা দ্রব্য গুলি অনিত্য। সেইরকম উৎপত্তিশীল এই পুরুষ অনিত্য বলে নিত্য আত্মার সঙ্গে এর ভেদ স্বীকার করতে হয়। নিত্য আত্মা স্বরূপত, বিভু, ক্ষেত্রজ্ঞ, শাশ্বত, অব্যক্ত ও অচিন্ত্য। অব্যক্ত বলতে যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নয় তাকে বোঝানো হয়।[৫১]

কিন্তু ব্যক্ত পুরুষকে জানতে গেলে অনাদি অব্যক্ত পুরুষ থেকে এই পুরুষের ভেদ কোথায় এবং অব্যক্ত থেকে এই পুরুষ কিভাবে ব্যক্ত হল, সেটা জানা দরকার। অনাদি পুরুষ স্বরূপত অহেতুক, নিত্য ধর্মবিশিষ্ট এবং সৎ। অপরদিকে কারণোদ্ভূত পুরুষ হল হেতুজন্য ও অনিত্য ও সৎ। অব্যক্ত থেকে বুদ্ধির জন্ম হয়, আর এই বুদ্ধির সাহায্যেই অব্যক্ত নিজেকে 'আমি কর্তা' এইরূপ মনে করে। এই

কারণে বলা হয় বুদ্ধি থেকে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার থেকেই আকাশ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়। প্রলয়কালে কিন্তু পুরুষ এইসকল ইষ্টভাব থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েন। পুরুষ এইভাবেই অব্যক্ততা থেকে ব্যক্ত হয় এবং ব্যক্ততা থেকে আবার প্রলয় কালে অব্যক্ততায় বিলীন হয়ে যায়। রজঃ ও তমোগুণ সংযুক্ত হওয়ার ফলে পুরুষ জন্ম ও মৃত্যু চক্রাকারে আবর্ত্তিত হতে থাকে। রজঃ ও তমোযুক্ত হওয়ার কারণে অহঙ্কাররূপ মোহে আবিষ্ট হয়, তাঁদেরই জন্ম ও মৃত্যু বারবার হতে থাকে। কিন্তু যাঁরা অনাসক্ত এবং অহঙ্কার বুদ্ধিশূন্য হয় তাঁদের এইরূপ বারবার জন্ম ও মৃত্যু হয় না, তাঁরাই মুক্তি লাভ করে। [৫২]

রজঃ ও তমোগুণের সঙ্গে পুরুষের সংযোগ হলে চতুর্বিংশতিক রাশির সংযোগ অনন্ত প্রকার হয় এবং রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা পুরুষ বিচ্ছিন্ন হলে সত্ত্ববুদ্ধি দ্বারাই এই সংযোগের নিবৃত্তি হয়। রজঃ ও তমোগুণের সংযোগ হলেই চতুর্বিংশতি পুরুষের সৃষ্টি হয়। এই সংযোগের অভাব হলে সত্ত্ববুদ্ধি দ্বারাই পুরুষের মুক্তি হয়। কর্ম ও কর্মফল এই পুরুষেতেই প্রতিষ্ঠিত এবং জ্ঞানও এই পুরুষেই আশ্রিত। মোহ, মমতা, সুখ, দুঃখ এবং জীবনমরণ সবকিছুই এই পুরুষেই প্রতিষ্ঠিত। যে চিকিৎসক পুরুষের এই সকল তত্ত্ব বুঝতে পারেন জীবন ও মরণ, শরীর পরম্পরা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তিনিই যথার্থভাবে জানতে পারেন বলে মনে করা হয়। যদি পুরুষ না থাকত তাহলে আলোক, অন্ধকার, সত্য, মিথ্যা, বেদ, শুভাশুভ কর্ম, কর্তা প্রভৃতি কিছুই থাকত না। পুরুষ না থাকলে আশ্রয়, সুখ-দুঃখ,

সংসারে আগমন, পরলোক গমন, বাক্য, বিজ্ঞানশাস্ত্র, জন্ম-মরণ, বন্ধন ও মোক্ষ কিছুই থাকত না।[৫৩]

এখানে চরকসংহিতার সঙ্গে সাংখ্যা দর্শনের কিছু কিছু ক্ষেত্র মত পার্থক্য ও মত মিল লক্ষ্য করা যায়। সাংখ্যকারিকায় পুরুষকে ত্রিগুণাদি অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিপরীত, অত্রিগুণত্বাদি ধর্ম্ম ও হেতুবশতঃ পুরুষ হচ্ছেন সাক্ষী, অর্থাৎ দুঃখ প্রভৃতি ছাড়া নিত্যমুক্ত, উদাসীন, দ্রষ্টা ও অকর্ত্তা। [৫৪]

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে বলা হয়েছে পুরুষ জন্ম প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য বহু। চরকসংহিতায়ও পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করা হয়, নাহলে বিভিন্ন পুরুষের বিভিন্ন ভাবে চিকিৎস করা সম্ভব হত না।[৫৫]

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের ভাষ্যে আরো বলা হয়েছে যে, পুরুষ যদি অনেক না হত তাহলে কেউ স্বর্গে, কেউ নরকে এবং কারও বা মুক্তি লাভ এইরূপ পৃথকভাবে দেখা যেত না। অপূর্ব দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ ও বিয়োগই পুরুষের জন্ম ও মরণ। যখন দেহ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে পুরুষের সংযোগ হয় তখন তাকে জন্ম এবং যখন ঐ সংযোগের অভাব হয় তখন তাকে মরণ বলা হয়।

পুরুষ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ:

চরকসংহিতায় পুরুষ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়, কোথাও বলা হয়েছে চতুর্বিংশতি পুরুষ, কোথাও বা ষড়ধাতু পুরুষ এবং কোথাও বা পুরুষ একপ্রকার

বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চরকসংহিতার জল্পকল্পতরুটীকায় এই কথার উল্লেখ আমরা পেয়ে থাকি।[৫৬]

আকাশ, জল, তেজ, বায়ু ও পৃথিবী এই পঞ্চমহাভুত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অব্যক্ত এই আটটিকে অষ্টধাতু প্রকৃতি বলা হয়েছে।

ধাতুভেদের পরিকল্পনা অনুসারে পুরুষকে চব্বিশ প্রকার বলা হয়েছে চরকসংহিতায়। দশটি ইন্দ্রিয়, মনঃ, পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অর্থ এবং আটটি ধাতু বিশিষ্ট প্রকৃতি। এই চব্বিশ প্রকার ধাতুর সমবায়কে চতুর্বিংশতিক পুরুষ বা রাশিপুরুষ বলা হয়েছে।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ্ পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ এই ষোলটিকে প্রকৃতির বিকৃতি বলে গণ্য করা হয়। অব্যক্ত ছাড়া অন্যগুলিকে ক্ষেত্র এবং অব্যক্তকে ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়েছে।[৫৭]

চরকসংহিতায় পুরুষের চতুর্বিংশতিতত্ত্বের কথা বলা হলেও সুশ্রুতসংহিতায় কিন্তু পুরুষের পঞ্চর্বিংশতিতত্ত্বের উল্লেখ দেখা যায়। এই ‘অব্যক্ত’ থেকে অব্যক্তের লক্ষণযুক্ত ‘মহান্’ উৎপন্ন হয়। সেই মহৎ তত্ত্ব থেকে ‘অহঙ্কার’ উৎপন্ন হয়। এই ‘অহঙ্কার’ তিন প্রকারের—‘বৈকারিক’, ‘তৈজস’ ও ‘ভূতপ্রকৃতি’। তৈজস অহঙ্কারের সাহায্যে এই বৈকারিক অহঙ্কার থেকে এগারটি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। যথা—শ্রোত্র,

ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, হস্ত, উপস্থ, পায়ু, পাদ এবং মন। এদের মধ্যে প্রথমের পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং শেষের পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন হচ্ছে উভয় ইন্দ্রিয়। তৈজস অহঙ্কারের সাহায্যে ভূতপ্রকৃতি অহঙ্কার থেকেও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপন্ন হয়। যেমন—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র। এই তন্মাত্রের বিশেষ গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই বিশেষ গুণগুলি থেকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়। এদের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব বলা হয়েছে।

কিন্তু এই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব অচেতন। তাই চেতন পুরুষকে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব রূপে ধরা হয়। এর সঙ্গে কার্যকারণভাব যুক্ত হওয়াতে পুরুষকে চেতন বলে গণ্য করা হয়েছে সুশ্রুত সংহিতা।[৫৮]

সংখ্যা দর্শনেও পুরুষের পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের উল্লেখ দেখা যায়। জড়বর্গের আদি কারণ প্রকৃতি। এটি কার্য নয় কেবল কারণ। প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত মহতত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এরা কার্য ও কারণ উভয়রূপ। অপরপক্ষে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই ষোলটি কেবলমাত্র কার্য, এরা কারণ নয় এবং পুরুষ সকলের উর্দ্ধে, এটি কার্যও নয়, কারণও নয়। সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পুরুষের পার্থক্য দেখা যায় তাহল সাংখ্য দর্শনে পুরুষকে সর্বব্যাপী বলা হয়েছে কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পুরুষ অসর্বব্যাপী বলা হয়েছে।[৫৯]

চরকসংহিতায় চতুর্বিংশতিতত্ত্বের সমষ্টিকেই রাশিপুরুষ বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৬০]

ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষকে 'ষড্‌ধাতুজ'ও বলা হয়েছে। আকাশ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত এবং চেতনাধাতু এই ষড়ধাতুর সমবায়কেও পুরুষ বলে অভিহিত করা হয়েছে। "খাদয়শ্চেতনাবষ্ঠা ধাতবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।"[৬১] এখন প্রশ্ন হল চেতনা বলতে কি বোঝায়? চক্রপাণি চরকসংহিতার টীকায় চেতনা বলতে 'মনসংযুক্ত আত্মা'কে বোঝাতে চেয়েছেন। চক্রপাণির এই ব্যাখ্যা অনুসারে—যে আত্মা পুরুষ শব্দের দ্বারা উক্ত হয় তাকেই চেতনা বলে।[৬২] পরবর্তীকালে গঙ্গাধর তাঁর জল্পকল্পতরুটীকায় বলেছেন যে মহানির্ব্বাণ নামক প্রলয়কালে যে শক্তিব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে চেতনা। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চভূতের বিকার ও চেতনার অধিষ্ঠান হতে গর্ভের সৃষ্টি হয় বলেই গর্ভকে পঞ্চমহাভূতের বিকার-সমুদায়াত্মক ও চেতনাধাতুর অধিষ্ঠানরূপে স্বীকার করা হয়েছে। চেতনাধাতু গর্ভের ষষ্ঠ ধাতু নামে গণ্য হয়। এই চেতনা ধাতুকেই চরকসংহিতায় নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে, যথা—হেতু, কারণ, নিমিত্ত, অক্ষয়, কর্ত্তা, বোধয়িতা, বোদ্ধা, দ্রষ্টা, ব্রহ্মা, বিশ্বকর্মী, বিশ্বরূপ, পুরুষ, প্রভব, অব্যয়, নিত্য, গুণী, গ্রহণ, প্রাধান্য, অব্যক্ত, জীব।

শরীরের লক্ষণ:

শরীর গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয় ফলে শরীরকে দ্রব্য বলা যায়। চেতনার আশ্রয়ভূত পঞ্চমহাভূতের বিকার সমুদয়কে চরকসংহিতায় শরীর বলে স্বীকার করা হয়। শরীরকে ধারণ করে আছে যে ধাতুগুলি তার সকলেই সমযোগবাহী। অর্থাৎ ধাতু যথাযোগ্য সমতাপ্রাপ্ত হলে শরীর নিরোগ হয়। কিন্তু এই সকল ধাতুগুলি যখন বৈষম্যপ্রাপ্ত হয়, তখনই শরীর ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে এবং রোগের উৎপত্তি হয়। শরীরের নাশ ঘটে।[৬৩]

শরীরের পাঞ্চভৌতিকতা:

আকাশকে বাদ দিয়ে এখানে চারটি ভূতের উল্লেখ হলেও প্রচলিত সাধারণ মতানুসারে পাঁচটি ভূতের সম্মিলনে শরীরের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই পাঁচটি মহাভূত হল আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। চরকসংহিতায় বলা হয়েছে, গর্ভের অবয়ব সকল মাতৃজাত হলেও শরীরকে পঞ্চমহাভূতের বিকার বলা হয়। এই শরীরের উৎপত্তির সকল মহাভূতগুলির মধ্যে শব্দ হচ্ছে আকাশকৃত, শরীরের লঘুতা, সূক্ষ্মতা ও সচ্ছিদ্রতা ও আকাশকৃত। বায়ুর দ্বারা শরীরের স্পর্শ, স্পর্শনেন্দ্রিয়, রুক্ষ, প্রেরণ, ধাতুরচনা এবং শারীরিক চেষ্টা সমূহ উৎপন্ন করা। অগ্নির দ্বারা রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়, প্রকাশ, পরিপাকশক্তি ও উষ্ণতা উৎপন্ন হয়। রস, রসনেন্দ্রিয়, শীতলতা, মৃদুতা, স্নেহ ও ক্লেদ এগুলি শরীরে জলের দ্বারা উৎপন্ন হয়। এছাড়া পৃথিবীর দ্বারা গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গৌরব, কঠিনতা ও মূর্তি উৎপন্ন হয়।[৬৪]

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে অংশগুলি বিশেষরূপে স্থূল, স্থির, মূর্ত্তিমান, গুরু, খর ও কঠিন যথা—নখ, অস্থি, দাঁত, মাংস, চর্ম, কেশ, লোম এবং কন্ডরা প্রভৃতি এছাড়াও শরীরের গন্ধ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়কেও পার্থিব বলে স্বীকার করা হয়েছে। রস, রক্ত, বসা, কফ, পিত্ত, মূত্র ও স্বেদ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ দ্রব্য, সর, মন্দ, স্নিগ্ধ, মৃদু ও পিচ্ছিল সেই সকল পদার্থ হচ্ছে জলীয়। এছাড়া শরীরে অবস্থিত যাবতীয় রস ও রসনেন্দ্রিয় ও জলীয় পদার্থ। শরীরে রয়েছে যে পিত্ত, যে উষ্মা, যে তেজ এবং এছাড়া শরীরের রূপ ও চক্ষুরিন্দ্রিয়কে আগ্নেয় পদার্থ বলা হয়। শরীরের উচ্ছ্বাস, প্রশ্বাস, নিমেষ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন, প্রেরণ, ধারণ ইত্যাদি এছাড়াও শরীরের স্পর্শ ও স্পর্শনেন্দ্রিয়কে বায়বীয় পদার্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শরীরের অভ্যন্তরস্থ ছিদ্রসমূহ, স্থূল ও সূক্ষ্ম স্রোতসমূহ শব্দ এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে আকাশাত্মক পদার্থ ধরা হয়েছে। এই শরীরস্থিত অবয়ব সমূহের নিয়ন্তা বুদ্ধি ও মনকে প্রয়োজক কর্তারূপে পরিগণনা করা হয়েছে। চরকসংহিতায় এইভাবেই শরীরের পাঞ্চভৌতিকতা প্রতিপাদন করা হয়।[৬৫]

মনুষ্যাদির শরীর পাঞ্চভৌতিক এই বিষয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সাথে ন্যায় দর্শনের মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কারণ ন্যায় মতে মনুষ্যাদির শরীর পাঞ্চভৌতিক নয় একভৌতিক। কেবল মাত্র পৃথিবী মহাভূতের দ্বারাই মনুষ্যাদির শরীর গঠিত হয়েছে। ন্যায় মতে শরীরের উপাদানকারণ বা সমবায়িকারণ কেবলমাত্র পৃথিবী এবং অন্য যে চারটি মহাভূত সে গুলি শরীরের নিমিত্ত কারণ। ন্যায় মতে পার্থিব

শরীরে জলাদিভূত দ্রব্য গুলি নিমিত্ত কারণ না হত তাহলে শরীর অন্যান্য পাথর বা ইটের মত কঠিন হত, ভোগের আয়তন হত না। ন্যায় মতে একজাতীয় দ্রব্যেই উপাদান উপাদেয়ভাব যুক্তিসঙ্গত হওয়ার কারণে শরীর কেবল পার্থিবই হয়ে থাকে। শরীরকে যদি পৃথিবী, জল প্রভৃতি বিজাতীয় দ্রব্যের উপাদেয় রূপে স্বীকার করা হয় তাহলে শরীরে পৃথিবীত্ব, জলত্ব ইত্যাদি বিরুদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। ফলে সাঙ্কযহেতু পৃথিবীত্ব প্রভৃতিকে জাতি বলা যাবে না, পৃথিবী, জল প্রভৃতিকে বিজাতীয় বলা যাবে না। ফলে ন্যায় মতে দ্রব্যের যে বর্গীকরণ করা হয়েছে তাও অসম্ভব হয়ে যাবে। এই কারণে ন্যায় মতে শরীর পাঞ্চভৌতিক বা ত্রৈভৌতিক তা বলা যাবে না।[৬৬]

কার্য দ্রব্য:

আকাশাদি নয় প্রকার কারণ দ্রব্যের দ্বারা যে সকল দ্রব্যের উৎপত্তি হয় সেই সকল দ্রব্যকে কার্য দ্রব্য বলা হয়। কার্য দ্রব্যগুলি যেহেতু উৎপন্ন হয় তাই তা অনিত্য।

চক্রপাণি দত্ত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকাতে বলেছেন সকল পদার্থ পাঞ্চভৌতিক। সকল উৎপন্ন দ্রব্যই কার্য দ্রব্য। কার্য দ্রব্যের সংখ্যা অনন্ত হওয়ার কারণে পাঠকের সুবিধার্থে কার্য দ্রব্যের বর্গীকরণ করা হয়েছে। কার্য দ্রব্য দুই প্রকার চেতন দ্রব্য এবং অচেতন দ্রব্য।[৬৭]

চেতন দ্রব্য: ইন্দ্রিয় যুক্ত দ্রব্যকে চেতন দ্রব্য বলা হয়। এই চেতন দ্রব্যে জীবনের লক্ষণ চৈতন্য পাওয়া যায়। চৈতন্য আত্মার গুণ, আত্মার কারণে শরীর জীবিত রূপ প্রাপ্ত হয় এবং এর অভাবে শরীর অচেতন হয়ে থাকে।

অচেতন রূপ: ইন্দ্রিয় রহিত দ্রব্যকে অচেতন দ্রব্য বলা হয়। চেতন দ্রব্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে জীবিত শরীর উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে জীবনের লক্ষণ চৈতন্য পাওয়া যায়। যেমন—মানুষ, বৃক্ষ, বনস্পতি। চরকসংহিতায় চেতনাবিষয়ে বলা হয়েছে যখন থেকে শুক্র শোনিত সংযোগ হয়ে থাকে তখন থেকেই তাকে আয়ু বা জীবিত বলা হয়।[৬৮] আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় আর মনের যখন সংযোগ হয়ে থাকে তখন তার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের স্ববিষয়ে গ্রাহ্যতার সামর্থ আসে। অতএব এখানে ইন্দ্রিয় শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা বিচার করা আবশ্যক। পানিনীয় অষ্টাধ্যায়ীতে ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রের লক্ষণের প্রকাশক বলা হয়েছে। শব্দকল্পদ্রুমে ইন্দ্রিয়কে আত্মার লক্ষণের অনুমাপক বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয় ইন্দ্রের দ্বারা সৃষ্ট। ইন্দ্রিয়কে জ্ঞান এবং কর্মের সাধনও বলা হয়েছে। ইন্দ্রের অর্থ হল প্রাণ বা জীবাত্মা। অতএব যা আত্মা বা প্রাণের লক্ষণকে প্রকট করে তাকে ইন্দ্রিয় বলা হয়। যতগুলি চেতন দ্রব্য আছে তাতে মনের সংযোগ হলেও যদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযোগ না হয় তাহলে তাতে তাদের লক্ষণ অভিব্যক্তি হতে পারে না। এই জন্য আচার্য চরক বলেছেন 'সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয় সচেতনম্।' এখানে চেতন অর্থে কেবল জীবিত শরীরই নয় বৃক্ষাদিকেও বোঝানো হয়েছে।[৬৯]

এখানে প্রশ্ন হল জ্ঞানের সঙ্গে চৈতন্যের সম্বন্ধ কি? উত্তরে বলা যায়, যেখানে যেখানে চেতনা থাকে সেখানেই কেবল জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে। চেতনা না থাকলে জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। কারণ চেতনা আত্মার বিশেষ গুণ। চেতনা না থাকা মানে আত্মা না থাকা। আর আত্মা না থাকা মানে সেখানে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্নও থাকতে পারে না। এখানে প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে যে আত্মা চেতনা স্বরূপ নাকি আত্মা চেতনাবান? উত্তরস্বরূপ বলা যায় আত্মা চেতনাবান কারণ চেতনা আত্মার বিশেষ গুণ। চেতনা এবং আত্মা একে অপরের সঙ্গে জড়িত থাকে। আত্মা চেতনাবান এই জন্য আত্মাকে কর্তা বলা হয়। সুতরাং এখানে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ এই মতের বিরোধিতা করা হয়েছে।

জল্পকল্পতরু টীকায় চেতন দ্রব্যের দুটি প্রকার ভেদের কথা স্বীকার করা হয়েছে। সেগুলি হল অন্তঃশ্চেতন এবং বাহ্যাভ্যান্তর চেতন।[৭০]

অন্তঃশ্চেতন :

অন্তঃশ্চেতন তাকে বলে যার জ্ঞান, শক্তি আর সুখ ও দুঃখের অনুভব হয়। কিন্তু আক্রমণ বা বিপদে নিরাকরণের সামর্থ নেই। যেমন—বনস্পতি-লজ্জাবতী স্পর্শ করলে মুদিত হয়ে যায়। এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে বনস্পতি বর্গের মধ্যে অন্তঃশ্চেতনা বর্তমান। তাদের মধ্যে অন্তঃশ্চেতনা বর্তমান থাকায় তারা বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য উৎপন্ন করে থাকে।

অন্তশ্চেতন দ্রব্যকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হল—১) বনস্পতি, ২) বানস্পত্য, ৩) ওষধি, ৪) বিরুধ।[৭১]

১) **বনস্পতি**: যার পুষ্প কণিকার দ্বারা ঢাকা থাকে তাকে বনস্পতি বলা হয়। ঢাকা থাকার কারণে পুষ্প দেখা যায় না। যেমন—বট।

২) **বানস্পত্য** : যার পুষ্প এবং ফল দুটোই স্পষ্টরূপে দেখা যায় তাকেই বানস্পত্য বলা হয়। যেমন—আম, জাম ইত্যাদি।

৩) **ওষধি** : ওষধি হল যার ফল পাকার পর সে নিজে বিনষ্ট হয়ে যায় তাকে ওষধি বলা হয়। যেমন—ধান, গম ইত্যাদি।

৪) **বীরুধ** : লতানো অথবা গুল্মকে বীরুধ বলা হয়।

বাহ্যাভ্যান্তর চেতন :

যারা আন্তরজ্ঞান এবং সুখ-দুঃখ অনুভব করে, আক্রমণ বা বিপত্তিতে নিরাকরণ করতে সমর্থ তাকে বাহ্যাভ্যান্তর চেতন বলা হয়। যেমন—মানুষ, পশুপাখি ইত্যাদি।[৭২]

বাহ্যাভ্যান্তর চেতন দ্রব্যকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল জরায়ুজ, অন্তজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ।[৭৩]

১) **জরায়ুজ** : যা জরায়ু থেকে জন্ম গ্রহণ করে তাকে জরায়ুজ বলা হয়। যেমন—মানুষ, পশু ইত্যাদি।

২) **অন্ডজ :** যার উৎপত্তি অন্ড বা ডিমের দ্বারা হয়ে থাকে তাকে অন্ডজ বলা হয়। যেমন—পাখি, সাপ ইত্যাদি।

৩) **স্বেদজ :** স্বেদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যকে স্বেদজ বলা হয়। যেমন—কৃমি, পিঁপড়ে ইত্যাদি।

৪) **উদ্ভিজ :** পৃথিবীর ভিতরে উৎপন্ন হওয়া দ্রব্যকে উদ্ভিজ বলা হয়।

অচেতন:

যার অন্তজ্ঞান এবং বহির্জ্ঞান কোন প্রকার জ্ঞানই থাকে না তাকে অচেতন বলে যেমন—পাথর, মাটি, ধাতু, ইত্যাদি।[৭৪]

চরকসংহিতায় প্রভাবের ভেদেও দ্রব্যের বিভাগ করা হয়েছে। প্রভাব ভেদে দ্রব্য তিনপ্রকার হয়ে থাকে—১) কিছু দ্রব্য দোষকে শান্ত রাখে, ২) কিছু দ্রব্য ধাতুগুলিকে দূষিত করে, ৩) কিছু দ্রব্য সর্বস্ত হিতকারী হয়ে থাকে।[৭৫]

১) কিছু দ্রব্য দোষকে শান্ত রাখে। কিছু দ্রব্য শমন ও শোধন ক্রিয়ার দ্বারা তার সমভাব স্থাপিত করে। যেমন—ঘি, পিত্তের আর মধু কফের শমন করে।

২) কিছু দ্রব্য ধাতু বা প্রকৃত বাতাদি দোষ রসাদি সপ্ত ধাতু মলকে দূষিত করে থাকে। যেমন—মাংস, আম, দই, কিরট বিরুদ্ধ ভোজনাদি।

৩) কিছু দ্রব্যের প্রভাবে স্বাস্থ্য সুস্থ থাকে যেমন—যব, গম, গোদুগ্ধ ইত্যাদি। আমলকি নিজের প্রভাবে ত্রিদোষের শমন করে থাকে। যদিও তাদের মধ্যে অম্লরস থাকার কারণে পিত্তের প্রকোপের কারণ হয়। কিছু দ্রব্যের প্রভাবে আবার এই পিত্ত প্রকোপ না হয়ে শমক হয়ে যায়। যবাদিকে শাস্ত্রবৃত্তির মাধ্যমে হিতকারী বলা হয়, একে দোষ শমকও বলা উচিত। তথা যে দ্রব্য দোষ শমক হয়ে থাকে সেই দ্রব্য প্রকৃতি, শরীর, দেশ, কাল, মাত্রা ইত্যাদি অনুসারে দোষ কারক অথবা ধাতু প্রদুষক হতে পারে। যে দ্রব্য ধাতু প্রদুষক হয় ঐ দ্রব্য প্রকৃতি শরীর, মাত্রা ইত্যাদির কারণে দোষ শমকও হতে পারে। যেমন—বিষ উদর রোগের দোষ শমক হয়ে থাকে। এই প্রকার আলোচনা থেকে এটা বলা যেতে পারে যে, যে দ্রব্য দোষ শমক হয় সেইগুলির দ্বারা আবার দোষ দূষিত হতে পারে। যে দ্রব্য ধাতু প্রদুষক হয় সেগুলি ধাতু শমক। আর সেই দ্রব্য স্বাস্থ্যের জন্য হিতকারী হয়ে থাকে। অতএব উপযুক্ত তিন প্রকারের দ্রব্যের কল্পনা ভ্রমাত্মক প্রতীত হতে পারে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়েছে যে দ্রব্যের এই তিনপ্রকার ভেদ মূলত প্রয়োগবাদ অনুসারে করা হয়েছে। যে দ্রব্য যেমন কার্য করে থাকে তার মধ্যেও কিছু কিছু বিপরীত কার্যও করে থাকে। বাধক কারণে অভাব দোষ প্রশমন স্বভাব যুক্ত দ্রব্যদোষ শামক হয়ে থাকে। কিন্তু বাধক কারণের উপস্থিতি হওয়ার জন্য ঐ দ্রব্যগুলির স্বভাবের পরিবর্তন হয়। এই প্রকার ধাতু প্রদুষক দ্রব্যে ভিন্ন ভিন্ন কারণের উপস্থিতি হওয়ার জন্য ধাতুর প্রশামকও হয়ে থাকে। যে প্রকার চন্দ্রকান্তমণির সংযোজনে আগুনের দহন করার শক্তি থাকে না, চন্দ্রকান্তমণির অভাবে দহন কার্য

সম্পন্ন হয়। এর থেকে এটা কল্পনা করা উচিত নয় যে, আগুনে দহন করার মত শক্তি নেই। এই প্রকার বাধক কারণের অভাবেও যে দ্রব্যের মধ্যে দোষ শমকত্ব শক্তি আছে তার মধ্যে ধাতু প্রদুষকত্ব শক্তি এসে যায়।

উৎপত্তি স্থান ভেদে দ্রব্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—জাঙ্গম, উদ্ভিদ ও পার্থিব।

জঙ্গম: যা জঙ্গম প্রাণী থেকে প্রাপ্ত হয় তাকে জঙ্গম দ্রব্য বলা হয়। যেমন—মধু, দুগ্ধ, ঘি ইত্যাদি। জঙ্গম পদার্থ থেকে চিকিৎসার জন্য যে সকল দ্রব্য কাজে লাগে তারা হল মধু, গব্য, দুগ্ধাদি, পিত্ত, মজ্জা, রক্ত-মাংস প্রভৃতি।[৭৬]

উদ্ভিদ : ভূমিজাত ঔষধ কে উদ্ভিদ বলা হয়। এই উদ্ভিদকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়। কিছু উদ্ভিদ আছে যারা ফলপ্রধান, কিছু উদ্ভিদ আছে মূল প্রধান এবং কিছু উদ্ভিদ আছে যারা ফল এবং মূল উভয় প্রধান।[৭৭]

মূল প্রধান উদ্ভিদ ঔষধি দ্রব্য হল হস্তিদন্তী, হৈমবতী, অজগন্ধা ইত্যাদি।[৭৮] ফল প্রধান উদ্ভিদ ঔষধি দ্রব্য হল—ষষ্ঠীমধু, আমুপ, তিতলাউ, শরৎকালীন ফল কমলাবুলী ইত্যাদি।[৭৯]

চরকসংহিতায় বলা হয়েছে জগতে এমন কোন দ্রব্য নেই যা ঔষধ হতে পারে না। অর্থাৎ ধুলি, ছাই প্রভৃতিও ঔষধ হিসাবে প্রয়োগ করা যায়। দ্রব্যগুলি

কেবল গুণের প্রভাবেই কার্যকর হয় না। দ্রব্যকে মূলত আহার ঔষধি ভেদে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই জগতে সমস্ত কিছুই পাঞ্চভৌতিক এবং আমাদের শরীরও পাঞ্চভৌতিক তাই শরীরে কোন পদার্থের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে শরীরে ধাতু বৈষম্য দেখা দিলে তার বিপরীত ধর্মী বা সমধর্মী পদার্থের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিয়ে তার সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়। কোন দ্রব্য যা অহিতকর তা জেনে তার সেবন করা উচিত নয়। কারণ শরীর আহার থেকে উৎপন্ন হয় এবং আহার থেকেই দূষিত হয়ে থাকে। এই জন্য সকল প্রকার পরীক্ষণের দ্বারা পরীক্ষা করে হিতকর আহার গ্রহণ করা উচিত এবং অহিতকর আহার ত্যাগ করা উচিত। নাহলে অহিত আহারের ফলে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি রোগগ্রস্থ হয়ে যেতে পারে।

চরকসংহিতায় দ্রব্যের যে লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, বৈশেষিক দর্শনেও আমরা দ্রব্যের সেই লক্ষণই লক্ষ্য করি। কিন্তু আয়ুর্বেদে দ্রব্যের যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যের তেমন শ্রেণী বিভাগ লক্ষ্য করা যায় না। বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যের শ্রেণী বিভাগ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে দ্রব্য নয় প্রকার সেগুলি হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, দিক্, কাল, আত্মা এবং মন। আয়ুর্বেদে এই নয়টি দ্রব্যকে কারণ দ্রব্য রূপে স্বীকার করা হয়েছে যদিও আয়ুর্বেদে উক্ত ক্রমে সেটি স্বীকার করা হয়নি। এই কারণ দ্রব্যের দ্বারা উৎপন্ন বিভিন্ন কার্য দ্রব্যের কথাও স্বীকার করা হয়েছে।

চরকসংহিতায় কেবলমাত্র নয় প্রকার কারণ দ্রব্যেরই উল্লেখ করা হয়নি। আয়ুর্বেদে কখনও দ্রব্যের বিভাগ করা হয়েছে দ্রব্যের প্রভাবের দিক থেকে, কখনও উৎপত্তির দিক থেকে কখনও চেতনার দিক থেকে। তার কারণ স্বরূপ বলা যায় যে, দ্রব্যের বিভাগের ক্ষেত্রে মূলত আয়ুর্বেদের উপযোগিতার কথা মাথায় রাখা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ সম্পাদিত, প্রথম খন্ড, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ৭।

২. মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য, *সুশ্রুতসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ যশোদানন্দন সরকার, সম্পাদনা বৈদ্যাচার্য্য কালীকিঙ্কর সেনশর্মা, আয়ুর্বেদাচার্য সত্যশেখর ভট্টাচার্য, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩, পৃ. ১৪৭।

৩. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* সম্পাদক এবং ব্যাখ্যাকার ডঃ লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, সহ সম্পাদক ডঃ বি. কে দ্বিবেদী এবং প্রদীপ কুমার গোস্বামী, প্রথম ভাগ, চৌখাম্বা, কৃষ্ণদাস একাডেমি, বারাণসী, ২০১৩, পৃ. ৪০।

৪. ডঃ যোগেশচন্দ্র মিত্র, *পদার্থ বিজ্ঞান,* চৌখাম্বা প্রকাশন, বারাণসী, ২০০৭, পৃ. ৯।

৫. তদেব।

৬. শ্রীমদন্নংভট্ট বিরচিত *তর্কসংগ্রহঃ* সটীকঃ অধ্যাপনাসহিতঃ, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, বঙ্গাব্দ ১৪১৩, পৃ. ৩৫।

৭. "খাদীন্যাত্মা মনঃ কালো দিশশ্চ দ্রব্য সংগ্রহ।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ সম্পাদিত, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ৭।

৮. "খাদীনি চ 'মহাভূতানি খং বায়ুরগ্নিরূ পঃ ক্ষিতিস্তথা' ইত্যনেন ক্রমেনোক্তানি, ভূতানি অনাগতবেক্ষণেনৌবোচ্যন্তে। আত্মাদীনাং চ তথা অব্যবহিতস্য পূর্বনির্দেশঃ দ্রব্যসংগ্রহ ইতি করচরণহরীতকীত্রিবৃত্তাদ্যসংখ্যেয়ভেদভিন্নস্য কার্যদ্রব্যস্য কারণদ্বারা সংক্ষেপ ইত্যথঃ।" বি. কে. দ্বিবেদী, *পদার্থ বিজ্ঞান,* চৌখাম্বা, কৃষ্ণদাস একাডেমী, বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ৫৬।

৯. আশীষকুমার মল্লিক, *আয়ুর্বেদ সিদ্ধান্ত দর্শন ও পদার্থসূত্র*, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০০৯, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ৩৬।

১০. ড: হরনারায়ণ দে, *আয়ুর্বেদীয় সরল পদার্থ বিজ্ঞান*, আকাশ পাবলিকেশন, সারনাথ, বারাণসী, ২০০৯, পৃ. ৪৩।

১১. তত্র সত্ত্ব বহুলামাআকাশং, রজঃবহুলাবায়ুঃ সত্ত্বরজঃবহুলাঅগ্নি, সত্ত্বতমবহুলাঅপ, তমবহুলা পৃথ্বীতি - সুঃ সুঃ (১৫)।

১২. "ততঃ পরং যথাক্রমং ক্রমেন অহংকারঃ, খাদীনি উত্তপাদ্যন্তে। খাদীনি পঞ্চসূক্ষ্মভূতানি তন্মাত্রাখ্যানি অহংকারাদুত্তপদ্যান্ত।" ড: বি. কে. দ্বিবেদী, *পদার্থ বিজ্ঞান*, সম্পাদক লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, চৌখাম্বা, কৃষ্ণদাস একাদেমি, বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ১০০।

১৩. আকাশপবনদনুনতোয়ভুমিষু যথা সংখ্যামেকোত্তরপরিবৃদ্ধা শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা (*সুশ্রুতসংহিতা* ৪২/৩)

১৪. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, কবিরাজ ব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৩৫

১৫. ডালিয়া বাঁদুড়ী, *চরকসংহিতার দার্শনিক ভাবনা সমীক্ষা*, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৯০।

১৬. তদেব, পৃ. ৩২।

১৭. তদেব, পৃ. ৩১

১৮. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, কবিরাজ ব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৩৫।

১৯. তদেব, পৃ. ২৩৬।

২০. *আয়ুর্বেদ সিদ্ধান্ত দর্শন ও পদার্থ সূত্র*, আশীষকুমার মল্লিক, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃ. ২৮।

২১. তদেব।

২২. ডালিয়া ভাদুড়ী, *চরকসংহিতার দার্শনিক ভাবনা—সমীক্ষা*, দি এশিয়াটিক সোসাইটি। পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৬৬।

২৩. "নির্বিকার পরস্ত্বাত্মা ... পশ্যাতিহিক্রিয়া।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, চক্রপাণী দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা, ব্যাখ্যাসহ হিন্দি ব্যাখ্যা, কাশীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত গঙ্গাসহায় পান্ডে এবং ভূমিকা প্রিয়দত্ত শর্মা, প্রথম খণ্ড, চৌখাম্বা, সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৬৯, পৃ. ৭৭১।

২৪. তদেব, পৃ. ৭০৫।

২৫. তদেব, পৃ. ৭০৪।

২৬. তদেব, পৃ. ৬৯১।

২৭. "বশী তৎ কুরুতে কর্ম যৎ কৃত্বা ফলমশ্নুতে। বশী চেতঃ সমাধত্তে বশী সর্বং নিরস্যতি, দেহী সর্বগতোআত্মা স্বে স্বে সংস্পর্শনোন্দ্রিয়ে।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৯৯।

২৮. তদেব।

২৯. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী দত্ত প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকা, ব্যাখ্যাসহ হিন্দি ব্যাখ্যা কাশীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদক, গঙ্গাসহায় পান্ডে এবং প্রিয়ব্রত শর্মা প্রথম খণ্ড, চৌখাম্বা, সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৬৯, পৃ. ৭০৯।

৩০. "লক্ষণং মনসো জ্ঞানস্যাভাবো ভাব এব চ, সতিহ্যাত্বেন্দ্রিয়ার্থানাং সন্নিকর্ষোণাবর্ত্ততে। বৈধৃত্যান্নমনসো জ্ঞানং সান্নিধ্যাওচ্চ বর্ত্ততে।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৯১।

৩১. "মনো মনোঅর্থো বুদ্ধিরাত্মা চেত্যধ্যাত্মদ্রব্যগুণসংগ্রহঃ।" ডালিয়া বাদুড়ী, *চরকসংহিতার দার্শনিক ভাবনা সমীক্ষা,* দি এশিয়াটিক সোসাইটি। পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৬, ২০০৬, পৃ. ১১৫।

৩২. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী দত্ত প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকা, ব্যাখ্যা সহহিন্দু ব্যাখ্যা কাশীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, গঙ্গাসহায় পান্ডে এবং প্রিয়ব্রত শর্মা, প্রথম খণ্ড, চৌখাম্বা, সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৬৯, পৃ. ৬৭০।

৩৩. "স্পর্শনেন্দ্রিয়সংস্পর্শঃ স্পর্শো মানস এব চ। দ্বিবিধঃ সুখদুঃখানাং বেদনানাং প্রবর্ত্তকঃ।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২০৭।

৩৪. "অনুত্বমথ চৈকত্বং দ্বৌ গুণৌ মানসঃ স্মৃতৌ"। তদেব, পৃ. ১৯১।

৩৫. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম খণ্ড, ২০০৩, পৃ. ১১১।

৩৬. মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য, *সুশ্রুতসংহিতা,* প্রথম খণ্ড, বৈদ্যাচার্য কালীকিঙ্কর সেনশর্মা, সত্যশেখর ভট্টাচার্য্য, দীপায়ন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৬।

৩৭. তদেব।

৩৮. বৈদঃ ২/১/৬।

৩৯. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* কবিরাজ, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম খণ্ড, ২০০৩, পৃ. ১১১।

৪০. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৭৬।

৪১. তদেব।

৪২. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকা সহ, ইংরাজী অনুবাদ, আর. কে. শর্মা, ভগবান দাস, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০২০, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১৪।

৪৩. "সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতত্ত্রিদন্ডবৎ। লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাৎ তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।। স পুমাংশ্চেতনং তচ্চ তচ্চাধিকরণং স্মৃতম্। বেদস্যাস্য, তদর্থং হি বেদোহয়ং সম্প্রকাশিতঃ।।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* কবিরাজ ব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, প্রথম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৬।

৪৪. "মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।।" কঠ উ., ১.৩.১১

৪৫. "আত্মজঃ পুরুষো রোগাশ্চত্মজাঃ কারণং হি সঃ।। স চিনোত্যুপভুঙ্‌ক্তে চ কর্ম্ম কর্ম্মফলানি চ। ন হ্যতে চেতনাধাতোঃ প্রবৃত্তির সুখদুঃখয়োঃ।।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* আয়ুর্বেদ দীপিকা ব্যাখ্যাসহ ইংরাজী অনুবাদ, আর. কে. শর্মা ও ভগবান দাস, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০২০, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫।

৪৬. "নর্ত্তে শরীরাচ্ছারীররোগা ন মনসঃ স্থিতিঃ, রসজানি তু ভূতানি ব্যাধয়শ্চ পৃথগ্‌বিধাঃ। আপো হি রসবত্যস্তাঃ স্মৃতা নিবৃত্তিহেতবঃ।।" তদেব।

৪৭. "কস্মান্মাতাপিতৃভ্যাং হি বিনা ষড়্‌ধাতুজো ভবেৎ।। পুরুষঃ পুরুষাদ্ গৌর্গোরশ্বাদশ্বঃ প্রজায়তে। মাতাপিতৃভবাশ্চোক্তা রোগাস্তাবত্র কারণম্।।" তদেব, পৃ. ৪১৬।

৪৮. "নহ্যন্ধোহন্ধাৎ প্রজায়াতে। মাতাপিত্রোরপি চ তে প্রাগুৎপত্তির্ন যুজ্যতে।। কর্মজস্তু মতো জন্তুঃ কর্ম্মজাস্তস্য চাময়াঃ। নহ্যতে কর্ম্মণো জন্ম রোগাণাং পুরুষস্য বা।।" তদেব।

৪৯. "প্রভবো ন হ্যনাদিত্বাদ্বিদ্যতে পরমাত্মনঃ। পুরুষো রাশিসংজ্ঞস্তু মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মজঃ।।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ কবিরাজ, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২য় খণ্ড, ২০০৪, পৃ. ১৯৬

৫০. "কর্ত্তা পূর্ব্বং হি কর্ম্মণঃ। দৃষ্টং ন চাকৃতং কর্ম্ম যস্য স্যাৎ পুরুষঃ ফলম্।। ভাবহেতুঃ স্বভাবস্তু ব্যাধীনাং পুরুষস্য চ। খরদ্রবচলোষ্ণত্বং তেজোহন্তানাং যথৈব হি।।" তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮।

৫১. “অনাদিঃ পুরুষো নিত্যো বিপরীতস্তু হেতুজঃ। সদকারণবন্নিত্যং দৃষ্টং হেতুজমন্যথা। ... ব্যক্তমৈন্দ্রিয়কঞ্চৈব গৃহ্যতে তদ্ যদিন্দ্রিয়ৈঃ।অতোহন্যৎ পুনরব্যক্তং লিঙ্গ গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।।” তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭।

৫২. “জায়তে বুদ্ধিরব্যক্তাদ্ বুদ্ধ্যাঅহমিকি মন্যতে। পরং খাদীন্যহঙ্কারাদুৎপদ্যন্তে যথাক্রমম্।। ... উদয়প্রলয়ৌ তেষাং ন তেষাং যে ত্বতোহন্যথা।।” মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, ২য় খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৯৮।

৫৩. “রজস্তমোভ্যাং যুক্তস্য সংযোগোহয়মনন্তবান্। তাভ্যাং নিরাকৃতাভ্যান্তু সত্ত্ববুদ্ধ্যা নিবর্ত্ততে।। নাশ্রয়ো ন সুখং নার্ত্তির্ন ....। কারণং পুরুষস্তস্মাৎ কালণজ্ঞৈরুদাহৃতঃ।। তদেব, পৃ. ১৯৩।

৫৪. “তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য। কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ।।” সা. কা., ১৯

৫৫. “জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্।” সা. প্র. সূ., ১.১৪৯

৫৬. “ষড়ধাতুক একধাতুকশ্চতুর্ব্বিংশতিধাতুকশ্চেতি ধাতুভেদেন ত্রিবিধঃ পুরুষো ভবতীতি জ্ঞাপয়িতুং প্রথমং ষড্ধাতুকং বিবৃণোতি।” মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণিদত্ত, আয়ুর্বেদদীপিকাটীকা, গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরুটীকাসহ নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত, চৌখাম্বা ওরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১, পৃ. ১৭৪৬।

৫৭. “ভূতপ্রকৃতিকদ্দিষ্টা বিকারাশ্চৈব ষোড়শ।। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ। সমনস্কাশ্চ পঞ্চার্থা বিকারা ইতি সংজ্ঞিতাঃ।। ইতি ক্ষেত্রং সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বমব্যক্তবর্জ্জিতম্। অব্যক্তমস্য ক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রজ্ঞমৃষয়ো বিদুঃ।।” মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৯৮।

৫৮. তত্র সর্ব এবাচেতন এষ বর্গঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশতিতমঃ কার্যকারণসংযুক্তশ্চেতয়িতা ভবতি।” মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য, *সুশ্রুতসংহিতা,* দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গানুবাদ, যশোদানন্দন সরকার, দীপায়ন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১২।

৫৯. তদেব, পৃ. ৪।

৬০. “বুদ্ধীন্দ্রিয়মনোহর্থানাং বিদ্যাদ্‌যোগধরং পরম্। চতুর্ব্বিংশতিকো হ্যেষ রাশিঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ।।” মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* শ্রীজয়দেব বিদ্যালঙ্কার, হিন্দি অনুবাদ, পূর্বভাগ, মতিলাল বেনারসীদাস, বারাণসী, ২০১৮, পৃ. ৩৬২।

৬১. তদেব, পৃ. ৩৫৫।

৬২. চেতনাষষ্ঠা ইত্যত্রৈব চেতনাশব্দেন চেতনাধারঃ সমনস্ক আত্মা গৃহ্যতে। মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* আয়ুর্বেদ দীপিকাটীকাসহ যাদবজী, ত্রিকমজী আচার্য সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, বারাণসী, চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৮৪, পৃ. ১৭৪৬।

৬৩. তত্র শরীরং নাম চেতণাধিষ্টানভূতং পঞ্চমহাভূত বিকার সমুদায়াত্মকং সমযোগীবাহি যব হ্যর্ষিণ্ শরীরে ধাতকে বৈষম্যমাপদ্যেন্ডে তদা ক্লেশং বিনাশং বাপ্রাপ্রোতি। মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী দত্ত প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকা, ব্যাখ্যাসহ হিন্দি ব্যাখ্যা কাশীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, গঙ্গাসহায় পান্ডে, প্রিয়ব্রত শর্মা, ১ম খণ্ড, চৌখাম্বা সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৬৯, পৃ. ৭৮৮।

৬৪. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী দত্ত প্রণীত ব্যাখ্যা সহ হিন্দি ব্যাখ্যা, কাশীনাথ ও গঙ্গাসহায় পান্ডে, ১ম খণ্ড, চৌখাম্বা সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৬১, পৃ. ৭৬১।

৬৫. তদেব, পৃ. ৮২০।

৬৬. শ্রীকেশব মিশ্র বিরচিতা, *তর্কভাষা,* বঙ্গানুবাদ গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড, সেন্টার অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি ইন্ ফিলসফি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৫৫।

৬৭. "খাদীন্যাত্মামনঃ কালো দিগশ্চ দ্রব্য সংগ্রহ, সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত কৃত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা সহ কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র, কবিরত্ন সম্পাদিত কলকাতা, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, ২০০ সংখ্যক ভবন, ১৮৮৩, পৃ. ১৭।

৬৮. 'তত্রা আয়ুশ্চেতনানুবৃত্তি', মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ৩৫৬।

৬৯. তদেব।

৭০. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকা সহ নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত, সংশোধিত, বারাণসী, চৌখাম্বা, ওরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৭।

৭১. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী প্রদত্ত, আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা সহ, ইংরাজি অনুবাদ রামকরণ শর্মা এবং ভগবান দাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, বারাণসী, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৮৩, পৃ. ৪৯।

৭২. "তদ্বত্ত্বাদচেতনমপি দ্বিবিধং বাহ্যচেতনমন্তশ্চেতনং বৃক্ষাদি।" চরকসংহিতা, মহর্ষি চরক, চক্রপাণী দত্ত প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকা সহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সম্পাদিত ও সংশোধিত, বারাণসী চৌখাম্বা, অরিয়েন্টলিয়া, ১৯৯১, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৭।

৭৩. "তত্র জঙ্গমশ্চতুর্যোনির্জরায়ু জাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জভেদাৎ।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকা সহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও সংশোধিত, বারাণসী চৌখাম্বা, অরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯১

৭৪. তদেব।

৭৫. "কিঞ্চিদ্দোষপ্রশমনং কিঞ্চিদ্ধাতুপ্রদুষণম্। স্বস্থবৃত্তৌ মতং কিঞ্চিৎ ত্রিবিধং দ্রব্যমচ্যুতে।।" মহর্ষি চরক, চরকসংহিতা, চক্রপাণী প্রদত্ত আর্য়েবেদ টীকা, ইংরাজি অনুবাদ রামকরণ শর্মা এবং ভগবান দাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, বারাণসী, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৮৩, পৃ. ৪৭।

৭৬. "তৎ পুনস্ত্রিবিধং প্রোক্তংজঙ্গমৌদ্ভিদপার্থিবম্।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্তের আয়ুর্বেদ দীপিকা ব্যাখ্যা সহ, আয়ুর্বেদাচার্য যাদবজী—ত্রিকমজী আচার্য সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ, চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৪১, পৃ. ৪৯।

৭৭. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* টীকা ভাষ্য সহ প্রথম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার, সম্পাদিত বৈদ্যাচার্য কালিকিঙ্কর সেনশর্মা, আয়ুর্বেদাচার্য সত্য শেখর ভট্টাচার্য, দীপায়ান, ২০ কেশবচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ১০।

৭৮. তদেব।

৭৯. তদেব, পৃ. ১১।

চতুর্থ অধ্যায়

আয়ুর্বেদে স্বীকৃত কর্ম পদার্থ

বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যাদি পদার্থের যে ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে কর্মের স্থান তৃতীয়। কিন্তু আয়ুর্বেদে যে ক্রমে দ্রব্যাদি পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কর্মের স্থান পঞ্চম। কেন কর্মের স্থান পঞ্চম? কর্ম যেহেতু দ্রব্যকে আশ্রয় করেই থাকে তাই দ্রব্যের পর কর্মের আলোচনা করা হয়েছে। যে ক্রমে পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কর্মের স্থান বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও দুটি শাস্ত্রেই দ্রব্যের আলোচনার পরেই কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু কর্ম দ্রব্যাশ্রিত। কর্ম সংযোগ ও বিভাগের কারণ। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু আর মন এই পঞ্চ দ্রব্যে কর্মবৃত্তি হয়ে থাকে। আকাশ, কাল, দিক তথা আত্মা এই বিভু দ্রব্যে কর্মবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ কর্ম সব সময় মূর্ত দ্রব্যে আশ্রিত, অন্য কিছুতে নয়। সেই দ্রব্য থেকে তা উৎপন্ন হয়ে ঐ দ্রব্যের পূর্বদেশ থেকে বিভাগ উৎপন্ন করে উত্তর দেশের সাথে সংযোগকে উৎপন্ন করে। এই সংযোগ তথা বিভাগের সমবায়ি কারণ দ্রব্য এবং অসমবায়ী কারণ হল কর্ম।

চরকসংহিতায় বিভিন্ন স্থানে কর্মের বিভিন্ন লক্ষণ পাওয়া যায়। সেগুলি হল দ্রব্যতে আশ্রিত ক্রিয়াই কর্ম,[১] চরকসংহিতায় সূত্র স্থানে আবার বলা হয়েছে "সংযোগ চ বিভাগে চ কারণং দ্রব্যাশ্রিতং। কর্ত্তব্যশ্চ ক্রিয়া কর্ম কর্মনান্যদপেক্ষতে।"[২] অর্থাৎ যা এক দ্রব্যাশ্রিত, গুণ রহিত, সংযোগ তথা বিভাগ উৎপন্ন করতে অন্য

কোন পদার্থকে অপেক্ষা করে না তাকে কর্ম বলা হয়। আবার সূত্র স্থানের প্রথম অধ্যায়ে "প্রযত্নাদি কর্ম চেষ্ঠিতমুচ্যতে"[৩] এইরূপ কর্মের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রযত্ন পূর্বক কিছু করার চেষ্টাকে কর্ম বলা হয়েছে। চরকসংহিতার বিমান স্থানে কর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "প্রবৃত্তিস্তু চেষ্টা কার্যার্থা সৈব ক্রিয়া প্রযত্ন কার্য সমারম্ভশ্চ।।"[৪] অর্থাৎ কার্যের জন্য যে চেষ্টা করা হয় তার নামই প্রবৃত্তি। তাকে ক্রিয়া, কর্ম, প্রযত্ন আর কার্য আরম্ভও বলা হয়।

এখন আমরা এই প্রত্যেকটি লক্ষণ সবিস্তারে আলোচনা করব। সংযোগ, বিভাগ, ক্রিয়া দ্রব্যতেই থাকে। অতএব দ্রব্য এই সংযোগ এবং বিভাগের সমবায়িকারণ। কেননা দ্রব্য ছাড়া সংযোগ, বিভাগ হওয়া সম্ভব নয়। সংযোগ বিভাগে কারোর সহায়তা না নিয়েই কর্ম সংযোগ বিভাগ করে। অতএব কর্ম কোন কারণকে অপেক্ষা করে না। কর্ম সংযোগ ও বিভাগের স্বতন্ত্র কারণ এবং তা মূর্ত দ্রব্য বৃত্তি। অমূর্ত দ্রব্যে কর্ম বৃত্তি হয় না। গুণ এবং কর্ম দুটিই একই দ্রব্যে থাকা সত্ত্বেও গুণ নিশ্চেষ্ট। কিন্তু কর্ম চেষ্টাবান। অনেক ক্ষেত্রে গুণ এবং কর্মের মধ্যে ভিন্নতা প্রকট হয় না। প্রায়শই লোক ব্যবহারে গুণ ও কর্মের মধ্যে ভেদ জ্ঞাত হয় না। কিন্তু গুণ এবং কর্ম ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। যেমন পতন হল কর্ম এবং গুরুত্বকে পতনের হেতু বলা হয়। তাই মনে হতে পারে যে পতন কর্মের কারণ গুরু গুণ। অতএব এটা স্বাভাবিক রূপে জ্ঞাত হয় যে পতন কর্ম গুরুত্ব বা গুরু গুণকে অপেক্ষা করে। যেখানে গুরু গুণ পতন কর্মের কারণ বলা হয়েছে সেখানে প্রকৃত

পক্ষে সংযোগাভাবই কারণ হয়। এর তাৎপর্য এই যে পতনের কারণ সংযোগের অভাব। যতক্ষণ ক্রিয়া না হয় ততক্ষণ তার বিভাগ হয় না। গুরুত্ব গুণ নিশ্চেষ্ট অতএব গুরুত্ব গুণের কোন ক্রিয়া নেই। যখন গুরুত্ব বাড়ে তখন ঐ দ্রব্যে আশ্রিত কর্মের ক্রিয়া হয় এবং বিভাগ হয়। একে সংযোগ অভাব বলা হয়। এই সংযোগের অভাবকে পতনের কারণ মানা হয়। কারণ সংযোগ পতনের প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধক থাকলে গুরুত্ব বিশিষ্ট দ্রব্যের পতন হয় না। শাখার সঙ্গে পত্রের সংযোগ তার পতনের প্রতিবন্ধক। পত্রের সংযোগ নষ্ট হলে পত্রের পতন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রতিবন্ধকাভাব সহযোগে কারণ সমূহই কার্য্যজনক হয়। অতএব পতন কর্মের দ্বারাই হয়।

'ক্রিয়া' ধাতুর সঙ্গে মনিন্ প্রত্যয় যোগ করে 'কর্মন্' শব্দের উৎপত্তি। যার প্রথম বচনের রূপ হল কর্ম। এই প্রকার কর্ম শব্দ ক্রিয়ার অর্থবহ। এই প্রকার নিরুক্তির দ্বারা কর্মের অর্থ যে ক্রিয়া তা বোঝা যায়। চরকসংহিতার সূত্র স্থানে বলা হয়েছে "যত্ কুর্বন্তি তৎ কর্ম"[৫] অর্থাৎ যা করে তাই কর্ম। চরকসংহিতার সূত্র স্থানে বলা হয়েছে "প্রযত্নাদি কর্মচেষ্টিতমুচ্যতে"[৬] অর্থাৎ প্রযত্ন পূর্বক করার চেষ্টাও কর্ম। এখানে 'প্রযত্ন' শব্দের অর্থ যা বিশেষ যত্নের দ্বারা করা হয় তাই প্রযত্ন। ক্রিয়া, চেষ্টা, প্রযত্ন, প্রবৃত্তি, দ্রব্যারম্ভ প্রভৃতিকে কর্মের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।[৭]

কর্ম শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে চেষ্টা শব্দের ব্যবহার করা হয় কিন্তু যেকোন চেষ্টাকে কর্ম বলা হয় না। সেই চেষ্টাকেই কেবলমাত্র কর্ম বলা হবে যে চেষ্টা

প্রযত্ন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ হয়। প্রবৃত্তি বলতে বোঝায় যা শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে ক্রিয়া সম্পাদন করে। শরীরের সাথে প্রবৃত্তির একটি বিধিবদ্ধ সম্বন্ধ থাকে। কারণ শরীর না থাকলে প্রবৃত্তি হয় না।

প্রযত্ন পূর্বক কৃত চেষ্টাকে কর্ম বলা হয়েছে, এবং আয়াস পূর্বক যা করা হয় তাকে প্রযত্ন বলা হয়েছে। যদিও চেষ্টাকে প্রাণীর কার্য বলা হয় তবুও এখানে চেষ্টা শব্দটি ক্রিয়াবোধক। প্রযত্নাদি শব্দে 'আদি' শব্দটি প্রকারসূচক। উক্ত লক্ষণে 'আদি' শব্দের প্রয়োগের অভিপ্রায় হল সংস্কার, গুরুত্বাদি গুণকে গুণ থেকে উৎপন্ন সকল ক্রিয়ার অন্তর্গত করা। সংযোগে তথা বিভাগে যা এক সাথে কারণ এবং যা দ্রব্যের আশ্রয়ভূত তাই হল কর্ম্ম। কর্তার দ্বারা কর্তব্য মূলক যে ক্রিয়া করা হয় সেই ক্রিয়াও কর্ম। উৎপন্ন হওয়া কর্ম অন্য কারণকে অপেক্ষা করে না। অর্থাৎ একবার প্রারম্ভ হওয়া কর্ম যতক্ষণ প্রবর্তমান থাকে ততক্ষণ সেই কর্মকে অন্য কারণ বা কারাণান্তরের অপেক্ষা করতে হয় না।

বৈশেষিক দর্শনেও এই প্রকার কর্মের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কোন দ্রব্য বা বস্তুর অন্য কোন দ্রব্য বা বস্তুর থেকে সংযোগ অথবা বিভাগ কর্ম ছাড়া হতে পারে না। এই প্রকার দ্রব্যের সংযোগ ও বিভাগ কর্মের দ্বারা হলেও দ্রব্যাশ্রয় ছাড়া কর্মের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। বৈশেষিক দর্শনে কর্ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে পদার্থ সংযোগ এবং বিভাগের অসমবায়ী কারণ হয় তাকে কর্ম বলা হয়।[৮] প্রথম ক্ষণে ঘটাদি মূর্ত দ্রব্যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় ক্ষণে ঐ ক্রিয়ার দ্বারা পূর্ব দেশ হতে

বিভাগ উৎপন্ন হয়। ঐ বিভাগের প্রতি ঘটনিষ্ঠ কর্মই কারণ হয়ে থাকে। তৃতীয় ক্ষণে কর্মজন্য বিভাগ থেকে পূর্বদেশ সংযোগ বিনষ্ট হয় এবং চতুর্থ ক্ষণে উত্তরদেশ সংযোগ হয়। কর্মের এই লক্ষণে 'বিভাগ' শব্দের দ্বারা লক্ষণে সংযোগের অতিব্যাপ্তি বারিত হয়। কেননা হস্তবৃক্ষ সংযোগের দ্বারা শরীর বৃক্ষ সংযোগ স্বীকার করা হয়। এই শরীর বৃক্ষ সংযোগের অসমবায়িকারণ হয় হস্তবৃক্ষ সংযোগ কিন্তু 'বিভাগ' শব্দ প্রযুক্ত হলে এই অতিব্যাপ্তি আর হয় না, কারণ হস্তবৃক্ষ সংযোগ শরীর বৃক্ষ সংযোগের অসমবায়িকারণ হলেও বিভাগের অসমবায়িকারণ হয় না। একইভাবে লক্ষণে যদি সংযোগ পদ প্রযুক্ত না হত তাহলে লক্ষণটি বিভাগে অতিব্যাপ্তি হত। কারণ হস্তবৃক্ষ বিভাগ থেকে শরীর বিভাগ স্বীকার করা হয় বলে শরীর বিভাগের অসমবায়ী কারণ হয় হস্তবৃক্ষ বিভাগ। লক্ষণে এই সংযোগ পদ প্রযুক্ত হওয়ার ফলে হস্তবৃক্ষ বিভাগ শরীর বৃক্ষ বিভাগের অসমবায়িকারণ হলেও যেহেতু সংযোগের অসমবায়িকারণ নয় তাই লক্ষণে অতিব্যাপ্তি বারিত হয়। কর্মের লক্ষণে 'অসমবায়ী' পদ প্রযুক্ত না হলে ঘটাদি দ্রব্যে অতিব্যাপ্তি হত যেহেতু কর্ম জন্য সংযোগ, বিভাগ ঘটাদি দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হওয়ায় কর্মের ন্যায় ঘটাদি দ্রব্যও ঐ সংযোগ বিভাগের কারণ হয়। 'অসমবায়ী' শব্দের দ্বারা ঘটে ঘটাদি দ্রব্যের সংযোগ বিভাগের সমবায়িকারণতা থাকলেও অসমবায়ী কারণতা না থাকায় অতিব্যাপ্তি বারিত হয়। বৈশেষিক দর্শনে কর্মের লক্ষণে যে 'একদ্রব্য' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে তার তাৎপর্য এই যে সংযোগ এবং বিভাগ দুটি দ্রব্যে আশ্রিত না হয়ে একই দ্রব্যে আশ্রিত হয়ে থাকে। 'একদ্রব্যম্' বলে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে একই দ্রব্যে সংযোগ এবং

বিভাগ রূপ কর্ম আশ্রিত থাকে। 'একদ্রব্যম্' এই শব্দের অর্থ হল অনেক দ্রব্য ভিন্ন। পরমাণু নিরাবয়ব বলে অনেক দ্রব্য ভিন্ন। সুতরাং পরমাণুতে কর্মের লক্ষণ প্রযুক্ত হয়ে যায় এবং অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য কর্মের লক্ষণে 'অগুণস্' শব্দের প্রয়োগ করা হয়। অগুণ মানে গুণ রহিত। গুণগুলি অগুণ, কিন্তু সকল গুণ এক দ্রব্যমাত্র বৃত্তি নয়। এই কারণে গুণমাত্রে অতিব্যাপ্তি হয় না। আবার রূপ প্রভৃতি যে গুণগুলি আছে তারা একদ্রব্য মাত্র বৃত্তি। সেই সকল গুণে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণমিতি" শব্দের ব্যবহার করা হল। একদ্রব্য মাত্র বৃত্তি রূপাদি সংযোগ বা বিভাগের কারণ নয় এবং সংযোগ বিভাগের অনপেক্ষ কারণও নয়। অতএব সেই রূপাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণ হল। পরমাণু-পরমাণু-দ্বয় সংযোগের প্রতি এবং পরমাণুদ্বয় বিভাগের প্রতি অনপেক্ষ কারণ বললে পরমাণুতে কর্মের লক্ষণ অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'অগুণম্' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ পরমাণু সগুণ নির্গুণ নয়।

মহর্ষি চরকের মতানুসারে কার্যের নিমিত্ত চেষ্টাকে প্রবৃত্তি বলা হয়েছে। তার পর্যায় বাচক শব্দরূপে ক্রিয়া, কর্ম, যত্ন তথা কার্য আরম্ভ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এই প্রকার আয়ুর্বেদে কর্ম শব্দের নামান্তর প্রবৃত্তিকে স্বীকার করা হয়েছে। প্রবৃত্তি বলতে বোঝানো হয়েছে যা শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে ক্রিয়াকে উৎপন্ন করে। চিকিৎসা আরম্ভ করাকেও প্রবৃত্তি বলা হয়েছে এখানে যোগ্য চিকিৎসক, যোগ্য ঔষধি, যোগ্য রোগী, যোগ্য পরিচালক সকলের ক্রিয়ার সমাবেশ করা হয়েছে। আবার 'গতি' শব্দের দ্বারাও কর্মের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে।[৯] 'গতি'কে প্রবৃত্তি বলা হয়। যেখান

থেকে গতি আরম্ভ হয় সেখান থেকে ঐ পদার্থের বিভাগ উৎপন্ন হয়। কোন বস্তুকে ক্রিয়াশীল তখনই বলা হয় যখন স্থান বিশেষে ঐ পদার্থের বিভাগ এবং সংযোগ উৎপন্ন হয়। যদি কোন ব্যক্তি নিজের হাত মাথায় রাখে তাহলেও তাকে ক্রিয়া বলা হয়। কেননা তার হাত পূর্ব স্থানের সাথে বিভাগ এবং মস্তকের সাথে সংযোগ উৎপন্ন করে। অতএব বলা হয় ক্রিয়া বা কর্ম সংযোগও বিভাগের কারণ।

গুণ যেমন নিমিত্ত কারণ হয় কর্ম তেমন নিমিত্ত কারণ হয় না। কিন্তু অসমবায়ি কারণ হয়। যেমন ক্রিয়া জন্য যে ক্রিয়ার আশ্রয়ীভূত দ্রব্যের পূর্ব সংযুক্ত দ্রব্যে থেকে বিভাগ হয় বা উত্তরবর্তী দ্রব্যের সঙ্গে সংযোগ হয় সেই দ্রব্যের সমবায়িকারণ দ্রব্য আর অসমবায়িকারণ হল কর্ম। যেহেতু সংযোগের সমবায়িকারণ বা বিভাগের সমবায়িকারণ যে দ্রব্য তাতে ক্রিয়া সমবেত থেকে সংযোগ বা বিভাগের প্রতি কারণ হয়।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে পাঁচ প্রকার কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন।[১০]

উৎক্ষেপণ:

ন্যায় মতে যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় যে দ্রব্য সেই দ্রব্যের উর্ধ্ব দেশের সঙ্গে সংযোগ হয় সেই ক্রিয়া বা কর্মকে উৎক্ষেপণ বলে। যেমন একটি বল উপর দিকে ছুড়ে দিলে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হল তার দ্বারা বলটির সঙ্গে তার উর্ধ্ব দেশের সংযোগ ঘটে।[১১]

অবক্ষেপণ :

যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যটি অধঃদেশের সাথে যুক্ত হয় তাকে বলে অবক্ষেপণ। যেমন—এক খণ্ড পাথর পাহাড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে দিলে ঐ পাথরে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হল তা পাথরটিকে অধঃদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করল, পাথরটির এই ক্রিয়াই হল অবক্ষেপণ।[১২]

আকুঞ্চন:

যে ক্রিয়ার দ্বারা অধিক দেশ বিস্তৃত দ্রব্যের অবয়ব ক্ষয় না হয়েও তার অল্পদেশ বিস্তৃতি ঘটে তাকে আকুঞ্চন বলে, যেমন—গাছের একটি শাখা টেনে ধরলে গাছের কোন ক্ষয় হয় না, কিন্তু গাছটি অল্পদেশ বিস্তৃতি ঘটে অর্থাৎ তা আকুঞ্চিত হয়।[১৩]

প্রসারণ:

আকুঞ্চনের ঠিক বিপরীত হল প্রসারণ। যে ক্রিয়ার দ্বারা অল্প দেশ বিস্তৃত দ্রব্যের অবয়ব বৃদ্ধি না ঘটলেও দ্রব্যটি অধিক দেশ বিস্তৃত হয় সেই ক্রিয়ার নাম প্রসারণ। যেমন—আকুঞ্চিত শাখাটিকে ছেড়ে দিলে তা প্রসারিত হয়। কচ্ছপ তার দেহকে প্রসারিত করে।[১৪]

গমন:

যে ক্রিয়ার দ্বারা তার আশ্রয় দ্রব্যটি অনিয়ত দেশের সঙ্গে সংযোগ হয় তাকে বলে গমন।[১৫] ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উর্দ্ধ্ব জ্বলন ও তীর্যক গমন এর অন্তর্ভুক্ত। কুম্ভকারের

চক্রে ঘূর্ণন, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণন, মাথার উপর বিদ্যুৎ চালিত পাখার ঘূর্ণন ইত্যাদিকে গমন বলে। ভিতরের তরল বস্তু বাইরে নিঃসৃত হওয়াকে রেচন বলে। যেমন—পিচকারি থেকে জলের নিঃসরণ। স্যন্দনের অর্থ তরল দ্রব্যের প্রবহন। যেমন জলের ক্ষরণ। দীপ যে উপরে শিখা বিস্তার করে তাকে ঊর্ধ্ব জ্বলন বলে। আঁকাবাকা গতিকে তীর্যক গমন বলা হয়। যেমন বিদ্যুতের গতি।

দার্শনিক গণ পাঁচ প্রকার যে কর্মের উল্লেখ করেছেন সেটাই আয়ুর্বেদে পঞ্চ চেষ্টা নামে বিবেচনা করা হয়। যেমন—প্রসরণ, আকুঞ্চন, বিনমন, উন্নমন তীর্যকগমন ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রসারণ, আকুঞ্চন এবং তীর্যকগমন এই তিনটি কর্ম স্পষ্ট রূপে ন্যায় বৈশেষিক দর্শন সম্মত কর্মের অনুরূপ। আয়ুর্বেদে বর্নিত বিনমন, অবক্ষেপণের ভাগকে ব্যক্ত করে। আর উন্নমন উৎক্ষেপণের ভাগকে প্রকট করে।

চিকিৎসায় উপযোগী দ্রব্যের বিবেচনা তার গুণ, রস, বীর্য, বিপাক প্রভাব বা কর্মের দ্বারা করা হয়ে থাকে। কর্ম তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। দ্রব্যের কার্যকারী শক্তি, রোগ নিবারণ শক্তি কর্মের দ্বারাই প্রদর্শিত হয়। আয়ুর্বেদে কর্মকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাণী দ্বারা কৃত কর্ম এবং অন্যটি হল দ্রব্য দ্বারা কৃত কর্ম।[১৬] প্রাণী দ্বারা কৃত কর্মকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—লৌকিক কর্ম এবং অলৌকিক কর্ম। লৌকিক কর্মে উপরিউক্ত পাঁচ প্রকার চেষ্টার কথা বলা হয়েছে এবং আধ্যাত্মিক কর্মে মঙ্গল কর্ম, ব্রত ইত্যাদি চেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্রব্যের দ্বারা উৎপন্ন কর্মের উল্লেখ চিকিৎসা দ্রব্য, গুণ, স্বাস্থ্যবৃত্ত, শল্য, শালাক্য ইত্যাদি বিভাগে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও বমন, বিরেচন, লাঘন, বৃংহন, বাজিকরণ, রাসায়ণ ইত্যাদি কর্মেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাণীর দ্বারা উৎপন্ন কর্মকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। শারীরিক, মানসিক এবং বাচিক।[১৭]

শারীরিক কর্ম

শরীরের যে লৌকিক প্রক্রিয়া গুলি কর্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত হয় এগুলিকে শারীরিক কর্ম বলে। যেমন—চলাফেরা, ভ্রমণ, আদান-প্রদান ইত্যাদি। শারীরিক ক্রিয়া গুলি ঐচ্ছিক ক্রিয়া এবং অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ভেদে দুই প্রকার। যেমন—পান করা, খাওয়া, ঘুমানো, জেগে থাকা, ওঠা, বসা এবং মল মূত্রাদি ত্যাগও ঐচ্ছিক শারীরিক ক্রিয়ার অন্তর্গত। অনৈচ্ছিক কর্ম হল পাকজক্রিয়া, শ্বাস প্রক্রিয়া, রক্ত পরিভ্রমণ প্রক্রিয়া এবং প্রতিদিন শরীরের দোষ ধাতুর ক্ষয়বৃদ্ধির ক্রমের সাথে ঐভাবে উত্তর ধাতুর নির্মাণ ক্রিয়াও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তর্গত।

মানসিক কর্ম :

মনন চিন্তন, ধারনা, ধ্যান, সংকল্পাদি হল মানসিক কর্ম। বিষয়ের সাথে মনের অযোগ এবং অতিযোগের ফলে ভয়, ক্রোধ, শোক, লোভ, মোহ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

বাচিক কর্ম :

কথা বলা, ভাষণ দেওয়া, উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি কর্মকে বাচিক কর্ম বলা হয়। বাক্যের অযোগ এবং অতিযোগের ফলে মিথ্যা, কলহ, অভদ্র এবং অপ্রিয় ভাষণ ইত্যাদির উৎপত্তি হয়ে থাকে।

কর্মকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয় লৌকিক কর্ম এবং আধ্যাত্মিক কর্ম। যদিও লৌকিক উৎক্ষেপানাদি পাঁচটি কর্মের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি তথাপি অন্যত্র লৌকিক কর্মের আরো তিনটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল সত্ প্রত্যয়, অসত্ প্রত্যয়, এবং অপ্রত্যয়।[১৮]

সৎ প্রত্যয় :

যে কর্ম বিবেক পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করা হয় তাকে সৎ প্রত্যয় বলা হয়। দৈনিক ব্যবহারে ব্যক্তি জ্ঞান পূর্বক লোক ব্যবহারকে মাথায় রেখে যে সকল কর্ম করে সে সকল কর্ম সৎ প্রত্যয় কর্মের অন্তর্গত।

অসৎ প্রত্যয় :

অজ্ঞান পূর্বক যে কর্ম সম্পন্ন করা হয় সেই কর্মকে অসৎ প্রত্যয় বলা হয়। ব্যক্তি বিবেকহীন হয়ে যে সকল কর্ম করে তাকে অসৎ প্রত্যয় বলা হয়। যেমন অতিসার রোগে রোগগ্রস্থ রোগী মূত্র ত্যাগ করার সময় অজ্ঞানবশত মলত্যাগও করে ফেলে এটি অসৎপ্রত্যয় কর্ম। এখানে ব্যক্তি মূলত বিবেকহীন হয়েই এই কর্ম করে।

অপ্রত্যয় কর্ম:

যে কর্ম কেবলমাত্র অচেতনের মধ্যে দেখা যায় তাকে অপ্রত্যয় কর্ম বলা হয়। এটির মুখ্যত তিনটি রূপ আছে, যথা—নোদন, গুরুত্ব এবং বেগ। মাটিতে পা দিলে মাটিতে যে গতির সৃষ্টি হয় তাকে নোদন বলা হয়ে থাকে। বস্তু যে আশ্রয়ে থাকে সেই আশ্রয়কে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বস্তুটি নিচের দিকে পরে যায় তা কেবলমাত্র গুরুত্বের জন্যই। ধনুক থেকে ছিটকে যাওয়া বান বেগের কারণেই গতি প্রাপ্ত হয়।

আধ্যাত্মিক কর্ম:

আধ্যাত্মিক কর্মকে অলৌকিক কর্মও বলা হয়ে থাকে। এর অন্তর্গত সেই সকল কর্মের বিবরণ দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা পরলৌকিক সুখ প্রাপ্তি হয়। এজন্য আয়ুর্বেদে লোক কল্যাণের ভাবনা হেতু পুণ্য কর্মের কথা বলা হয়েছে। প্রাণী মাত্রের জন্য করা সৎকর্ম এবং সকল শাস্ত্র সম্মত কর্ম এই কর্মের অন্তর্গত। এই কর্মের দ্বারা আরোগ্য লাভের সাথে ইন্দ্রিয়ের বশিত্ব প্রাপ্তি হয়ে থাকে। আয়ুর্বেদে আচার আচরণের কথাও বলা হয়েছে সেগুলিকে আবার পারলৌকিক কর্মও বলা হয়, যার জন্য প্রাণীমাত্রের প্রতি মিত্রভাব, দীনদরিদ্রের প্রতি দয়া, বৃদ্ধের সেবা, আজ্ঞাপালন, অতিথি সৎকার এবং সকল প্রকারের অশুভ কর্মের পরিহার এবং শুভ করা হয়ে থাকে।

আয়ুর্বেদে যেমন লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক কর্মের ভেদের কথা স্বীকার করা হয়েছে তার সাথে আমরা মীমাংসা দর্শনের মিল লক্ষ্য করতে পারি। কারণ

মীমাংসা দর্শনে কর্মের যে শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে তাহল কাম্যকর্ম, নিত্যকর্ম এবং নৈমিত্তিক কর্ম।

আয়ুর্বেদে সংশোমন, সংশোধন এবং শাস্ত্রপ্রণিধান ভেদে কর্মের অন্য একটি প্রকারভেদের কথা স্বীকার করা হয়েছে।[১৯] সংশোমন বলতে বোঝানো হয়েছে আহার এবং ঔষধি দ্রব্যের যোজনা এবং আহার বিহারে প্রয়োগ দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করা। সংশোধন কর্মের অন্তর্গত পাঁচ প্রকার কর্ম আছে যা চিকিৎসা কাজে লাগে এবং এর দ্বারা রোগের স্বমূল নাশও করা হয়ে থাকে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র হওয়ায় এই পঞ্চবিধ কর্মের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই পঞ্চবিধ কর্ম হল—বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন, শিরোবিরেচন।[২০] যেখানে মুখের দ্বারা দোষকে বাইরে বার করা হয় তাকে বমন বলা হয়। বিরেচন—মলত্যাগের দ্বারা সেখানে দোষকে বাইরে বার করা হয়। আস্থাপন—রুক্ষ দ্রব্যের দ্বারা রোগের নাশ করা হয়। অনুবাসন—স্নেহ দ্রব্যের দ্বারা রোগ নিবৃত্তি করা। শিরোবিরেচন—শিরগত দোষকে স্নায়ুর দ্বারা বাইরে বার করাকে শিরোবিরচন বলা হয়। যন্ত্রের সাহায্যে বা শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর শরীর থেকে দোষকে বাইরে বার করাকে শাস্ত্রপ্রণিধান বলা হয়।

চরকসংহিতায় শুভ, অশুভ কর্ম ভেদে কর্মকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই শুভ ও অশুভ কর্মের প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির হেতু হল মন, মনের বিষয়, বুদ্ধি ও আত্মা। এদের আধ্যাত্ম দ্রব্য, গুণ সংগ্রহের মধ্যে ধরা হয়েছে।[২১]

এছাড়াও চরক সংহিতায় অন্যত্র ধর্মশাস্ত্র সম্মত পূর্ব জন্মের কর্ম এবং ইহজন্মের কর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বজন্মের যে সকল কর্ম করা হয় তাকে দৈব এবং ইহ জন্মে যে সকল কর্ম করা হয় তাকে পুরুষকার বলে।[২২] দৈব ও পুরুষকার উভয় প্রকার কর্মকে আবার বলাবলের পার্থক্য অনুসারে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—হীন কর্ম, মধ্যমকর্ম এবং উত্তম কর্ম। এর মধ্যে উত্তম দৈবের সঙ্গে উত্তম পুরুষকার যোগ হয় এই যোগ সুখান্বিত ও নিয়ত দীর্ঘায়ু কারণ হয়। হীন দৈবের সঙ্গে হীন পুরুষকারের যোগ হলে সেই সংযোগ দুঃখান্বিত ও অল্প আয়ুর কারণ হয়। মধ্য দৈব ও মধ্যম পুরুষকার সংযোগ মধ্যম আয়ুর কারণ হয়। চরকসংহিতায় আরো বলা হয়েছে যে পুরুষকার প্রবল হলে এটি দুর্বল দৈবকে বিনষ্ট করে। উত্তম দৈবের সাহায্যে দুর্বল পুরুষকারেরও বিনষ্ট হয়।[২৩]

এটা দেখেই কেউ কেউ বলতে পারেন যে আয়ুর পরিমাণ নিয়ত। কিন্তু উপদেশ, প্রত্যক্ষ এবং যুক্তি বিজ্ঞানের দ্বারাও এটি পতিত হয়ে থাকে। কাল পরিমাণে কোন মহৎ কর্ম নিয়ত, আবার কোন মহৎ কর্ম অনিয়ত হয়। চরকসংহিতায় এই দৈবকে কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ উৎপত্তির কারণ রূপে স্বীকার করা হয়। পূর্বজন্ম এবং ইহ জন্ম এই উভয় জন্মের কৃতকর্ম যদি অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ যুক্ত হয় তাহলে তা রোগ উৎপত্তি করে, দৈব ও পুরুষকার যদি সমযোগ যুক্ত হয় তাহলে রোগের নিবৃত্তি হয়ে থাকে। [২৪]

আয়ুর্বেদে কর্মকে দুটি রূপে পরিভাষিত করা হয়েছে। একটি প্রযত্ন বা চিকিৎসার দ্বারা উৎপন্ন কর্ম এবং অন্যটি সংযোগ বিভাগের কারণ রূপ কর্ম। আয়ুর্বেদে বিশেষতঃ চরকসংহিতায় যেভাবে সংযোগ এবং বিভাগের কারণ রূপে কর্মের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যখন কর্তা বা করণের সংযোগ হয় তখনই ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। যখন কর্তা আত্মার সংযোগ রজঃ বা তমঃ গুণের সঙ্গে হয় তখন সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রারম্ভ হয়, এখানে প্রবৃত্তি বা ক্রিয়ার কারণ রজঃ গুণ হয়ে থাকে। শরীরের সঙ্গে আহারের সংযোগ, আহারের সঙ্গে অগ্নির সংযোগ এবং পাচনাদির বিভাগ হয়। পাচনাদির দ্বারা ধাতুর সংযোগ হলে ধাতব অগ্নির দ্বারা পাক হয়ে উপধাতু তথা মলের বিভগাদি হয়ে থাকে। এই প্রকার শরীর ক্রিয়ায় সংযোগ এবং বিভাগ হয় যা কর্মের লক্ষণের ব্যবহারিক স্বরূপ। জীবনের লক্ষণ রূপে ক্রিয়ার সংযোগ ও বিভাগ হয়। যখন আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় সংযুক্ত হয় তখন বিষয় উপলব্ধি হয়। শরীরের মূল হিসাবে হৃদয়কে স্বীকার করা হয়েছে। কেননা শরীরে সমস্ত ক্রিয়া বা গতি মূল হল হৃদয়। বৈশেষিক দর্শনে যে পাঁচ প্রকার কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই পাঁচ প্রকার কর্ম বা ক্রিয়া হৃদপিণ্ডকে কেন্দ্র করেও হয়ে থাকে। অতএব একে ক্রিয়ামূল বলা হয়ে থাকে। যেমন হৃদয় থেকে রক্ত শিরোগত ইন্দ্রিয় পর্যন্ত যায় তাহল উৎক্ষেপণ। আবার শরীরের অগ্রভাগ থেকে রস, রক্তাদি হৃদপিণ্ডে আসাও উৎক্ষেপণ। হৃদয়ের দ্বারা রক্ত নিম্নভাগে যাওয়া অথবা শির আদি অঙ্গ থেকে রক্ত হৃদপিণ্ডে আসাকে অবক্ষেপণ বল হয়।

হৃদপিণ্ডগত আকুঞ্চন, প্রসারণ তো আমাদের সকলের কাছেই স্পষ্ট। লাগাতার হৃদপিণ্ডের গতিশীল হওয়াকে গমন বলা হয়।

রোগের নিরাময় প্রারম্ভকেই প্রবৃত্তি বলা হয়। যার মধ্যে চিকিৎসক, ঔষধ, রোগী তথা পরিচায়ক সকলের ক্রিয়ার সমাবেশ হয়। আয়ুর্বেদে যেখানে কর্মকে প্রবৃত্তি বলা হয়েছে সেখানে চিকিৎসা, ওষুধ, রোগী তথা পরিচায়ক এই চারটির সংযোগে প্রবৃত্তি তথা চিকিৎসা কর্মের সিদ্ধি হয়ে থাকে।

চিকিৎসা কর্মকে ক্রিয়া বলা হয়। এর দ্বারা জীবিত শরীরকে কর্ম পুরুষ বলা হয়। কেননা এই পুরুষ হল ক্রিয়ার অধিষ্ঠান। আয়ুর্বেদে দুই প্রকার চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। সংশোধন চিকিৎসার দ্বারা পঞ্চ উৎক্ষেপনাদি কর্মের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা চিকিৎসা হেতু পঞ্চ কর্মের ব্যবস্থা করা হয়। বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন এবং শিরোবিরেচন এই কর্ম গুলিকে পঞ্চকর্ম বলা হয়। শরীরের উর্দ্ধগত দোষকে বাইরে বার করার জন্য বমন করা হয়। বমন, উৎক্ষেপণ কর্ম স্থলে নিজে থেকে দোষকে উপরে উৎক্ষেপিত করে বার করা হয়। বিরেচন অবক্ষেপণ এখানে দোষকে উপর থেকে নীচে অবক্ষেপিত করা হয়। যখন যন্ত্রের দ্বারা ঔষধ দ্রব্য পাকস্থলিতে পৌঁছে দেওয়া হয় তখন উৎক্ষেপণ হয় এবং যখন ঔষধি দ্রব্য দোষের সাথে পায়ু দ্বারা বাইরে বার করে দেওয়া হয় তখন অবক্ষেপণ হয়। অনুবাসনে উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন এবং প্রসারণ ক্রিয়া হয়। সর্বপ্রথম স্নেহকে যন্ত্রের দ্বারা পাকস্থলিতে পৌঁছে দেওয়া হয় সেটা উৎক্ষেপণ। যখন ঔষধি

দ্রব্য পাকস্থলিতে পৌঁছে যায় তখন তার প্রসারণ হয় অর্থাৎ স্নেহ পুরো পাকস্থলিতে প্রসারিত হয়ে যায়। তার পর তার আকুঞ্চন হয় অর্থাৎ দোষের শোধন করে স্নেহ পাকস্থলির বাইরে চলে আসে তখন মলদ্বারের দ্বারা তাকে অবক্ষেপিত করা হয়। শিরোবিরেচনের আধার হল গমন। স্নেহম্ এবং স্বেদনেও এই ক্রিয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। নিরগ্নি স্বেদে ব্যায়ামাদিতে আকুঞ্চন, প্রসারণ ক্রিয়া হয়, তথা আয়ুর্বেদে গমনকে একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসা হিসাবে মানা হয়েছে। শল্য চিকিৎসাতেও এই কর্মের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ভেদন, বেদন ক্রিয়া গমন কর্মের অন্তর্গত। আকুঞ্চনের দ্বারা ব্রনের শোধন করা হয়। ছেদন করে ধাতুকে নিচে স্থিত করা হয়। রোপণ কর্মের দ্বারা ধাতুকে নীচে থেকে উপরে উৎক্ষেপিত করা হয় এবং প্রসারিত করা হয়।

আয়ুর্বেদে কর্ম শব্দকে চেষ্টা অর্থেও ব্যবহার করা হয়। এই কর্মের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে বাক্, মন এবং শরীরের প্রবৃত্তি বা চেষ্টাকে কর্ম বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রযত্নমূলক কায়িক-বাচনিক ও মানসিক চেষ্টাই কর্ম। এই ত্রিবিধ কর্মের অতিযোগ, হীনযোগ ও মিথ্যাযোগের দ্বারা রোগোৎপত্তি হয়ে থাকে।

বাক্, মন এবং শরীরের অতি প্রবৃত্তিকে অতিযোগ বলা হয়। বাক্, মন এবং শরীরের দ্বারা না করা কর্মকে এবং বিষম চেষ্টাদিকে শারীরিক মিথ্যা যোগ বলে। কলহ প্রিয় বচনাদি বলা হল বাচিক মিথ্যাযোগ। ভয়, শোকাদি প্রভৃতি কর্ম হল মানসিক মিথ্যাযোগ। অতিযোগ এবং অযোগের অতিরিক্ত কায়িক, বাচিক

এবং মানসিক যত প্রকার অহিতকর চেষ্টা বা কর্ম করা হয় এই সকলই কর্মকে মিথ্যাযোগ বলা হয়। কায়িক, বাচিক বা মানসিক কাজ কর্ম যদি পাপ রহিত হয় তাহলে তাকে মানুষের পুণ্য কর্ম বলা হয়। তার দ্বারা মানুষ সুখী হয় এবং সুখী হয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থের সাধন করতে পারে। সুতরাং সুস্থ না থাকলে ত্রিবর্গ সাধনও সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. "দ্রব্যাশ্রিতং চ কর্ম্ম, যদুচ্যতে ক্রিয়োতি", মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* প্রথম খণ্ড বঙ্গানুবাদ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৭৮।

২. "সংযোগ চ বিভাগে চ যত কারণমন্যৎ কর্ম্ম স্বভিন্নং কর্ম্মান্তরং নাপেক্ষতে তদ্ দ্রব্যমাশ্রিতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যস্য তস্য কার্য্যস্য কর্ম্মণঃ সমবায়িকারণং কর্ম্মাচ্যতে" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদদীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকা সহ, প্রথম খণ্ড, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও সংশোধিত, বারাণসী, চৌখাম্বা অরিয়েন্টলিয়া, ১৯৯১, পৃ. ১১১।

৩. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* প্রথম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৭।

৪. তদেব, পৃ. ১৭৭।

৫. তদেব, পৃ. ২৬৮।

৬. তদেব, পৃ. ৭।

৭. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* দ্বিতীয় খণ্ড, চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা সহ, ইংরাজী অনুবাদ, আর. কে. শর্মা ও ভগবান দাস, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০১৩, পৃ. ২৩৪।

৮. *প্রশস্তপাদভাষ্যম,* ন্যায়ফন্দলী অনুবাদ সহ, দ্বিতীয় ভাগ, অনুবাদক ও প্রকাশক দামোদয়াশ্রম, ২০০০, পৃ. ৪৭৪।

৯. ডঃ বি. কে. দ্বিবেদী, *পদার্থবিজ্ঞান,* চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস অকাদেমী বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ৩০৮।

১০. “উৎক্ষেপণাপক্ষেপণাকুঞ্চনপ্রসারণগমনানি পঞ্চ কর্মাণি” শ্রীমদন্নং ভট্ট বিরচিত, *তর্কসংগ্রহ* সটীকঃ অধ্যাপনা সহিতঃ, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা, বঙ্গাব্দ-১৪১৩, পৃ. ৪৮।

১১. তদেব, পৃ. ৪৯

১২. তদেব, পৃ. ৫০

১৩. তদেব।

১৪. তদেব।

১৫. তদেব।

১৬. শর্মা বৈদ্য তারাচন্দ্র, *আয়ুর্বেদীয় পদার্থদর্শন*, নাথ পুস্তক ভাণ্ডার হরিয়ানা, ২০০৬, পৃ. ২১৭।

১৭. জৈস্বাল ডঃ রামনিহোর তপসী, *পদার্থ বিজ্ঞান এবং আয়ুর্বেদ ইতিহাস, মৌলিক সিদ্ধান্ত*, চৌখাম্বা ওরিয়েন্টলিয়া বারাণসী, পৃ. ২৯৮।

১৮. দ্বিবেদী ডঃ বি. কে., *পদার্থ বিজ্ঞান*, চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস একাডেমি বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ৩১৩।

১৯. শর্মা বৈদ্য তারাচন্দ্র, *আয়ুর্বেদীয় পদার্থ দর্শন*, নাথ পুস্তক ভাণ্ডার, হরিয়ানা, ২০০৬, পৃ. ২১৯।

২০. “বমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসনশিরোবিরেচনানি” *চরকসংহিতা*, মহর্ষি চরক, বঙ্গানুবাদ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, প্রথম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৭৭

২১. “মনো মনোর্থোবুদ্ধিরাত্মা চেত্যধ্যাত্মদ্রব্যগুণসংগ্রহঃ শুভাশুভপ্রবৃত্তিনিবৃত্তি-হেতুশ্চ”, মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা সহ, ইংরেজী অনুবাদ আর. কে. শর্মা, ভগবান দাস, প্রথম খণ্ড, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস বারাণসী, ২০২০। পৃ. ১৬৮।

২২. “দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদৈহিকম্ স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্” মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদদীপিকাসহ ইংরাজী অনুবাদ, আর. কে. শর্মা, ভগবান দাস, দ্বিতীয় খণ্ড, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস বারাণসী ২০২০, পৃ. ১৫১।

২৩. তদেব।

২৪. তদেব, পৃ. ৩৬৩।

পঞ্চম অধ্যায়

আয়ুর্বেদে আলোচিত সমবায় ও অভাব পদার্থ

আয়ুর্বেদে সমবায়কে ষষ্ঠ পদার্থ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। চরকসংহিতায় দ্রব্যের সঙ্গে গুণের অপৃথক ভাবরূপ যে সম্বন্ধ তাকে সমবায় সম্বন্ধ বলা হয়। যেমন— মাটির সঙ্গে তার গুণের যে সম্বন্ধ তা সমবায় সম্বন্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ মাটি ও তার গুণের মধ্যে সম্বন্ধ অপৃথক ভাবরূপ। সমবায় সম্বন্ধকে নিত্য বলা হয়। কেননা এর ক্ষয় বৃদ্ধি বা উৎপত্তি, বিনাশ নেই।[১]

আচার্য চক্রপাণি দত্তের মতে অপৃথকভাব শব্দের অর্থ হল অযুতসিদ্ধ। অযুতসিদ্ধ বলতে বোঝায় একই সঙ্গে অবস্থান করা। স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে দুটি পদার্থ একটির অবিনশ্যদ্ অবস্থায় অপরটির মধ্যে আশ্রিত হয়ে থাকা। যেমন— অবয়ব অবয়বী, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান, সামান্য ও সামান্যবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ। কেননা অবয়বীকে বাদ দিয়ে অবয়বের উপলব্ধি সম্ভব নয়।[২]

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সমবায়কে একটি পৃথক পদার্থরূপে স্বীকার করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার জন্য যে বনস্পতি জাত, খনিজ বা অন্য দ্রব্যজাত ঔষধির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তাতে অবস্থিত গুণগুলি লক্ষ্য করেই চিকিৎসক এটা নির্ণয় করতে সমর্থ হন যে কোন দ্রব্য অর্থাৎ কোন ঔষধি কোন রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। দ্রব্যের মধ্যে গুণগুলি কোন্ সম্বন্ধে থাকে সে বিষয়ে সম্যক বিবেচনা চক্রপাণী দত্ত তাঁর টীকায় করেছেন। 'ভূম্যাদীনাং গুণৈঃ" এই উদ্ধৃতির দ্বারা ভূমি

এবং তার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত গুণের অপৃথগ্‌ভাবকে বুঝিয়েছেন। ‘ভূম্যাদীনাং’-এর দ্বারা ভূম আদিতে আছে যা অর্থাৎ ভূমি ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। আধার অপেক্ষা আধেয় সর্ব্বত্র অপ্রধান। আধার ও আধেয়ের মধ্যে যে অপৃথগ্‌ভাবরূপ সম্বন্ধ, তাই সমবায় সম্বন্ধ। পৃথিবীত্ব এবং গন্ধবত্ব যদি অপৃথগ্‌সিদ্ধ না হয় তাহলে আধার ও আধেয় ভাবের অভাব দেখা দেওয়ায় সমবায় মানা সম্ভব হয় না।[৩]

সমবায় সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ। এই নিত্যতার কারণে যেখানে দ্রব্য থাকে সেখানে গুণ ঐ দ্রব্যে নিশ্চিত রূপে বিদ্যমান থাকে। এর দ্বারা যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ শরীরসত্তায় আত্মা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে থাকে। এই তত্ত্বের দ্বারা সুশ্রুত সংহিতায় কর্ম পুরুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[৪] এখানে বলা হয়েছে যে পঞ্চমহাভূতোর সাথে আত্মার সমবায় সম্বন্ধই পুরুষ যার চিকিৎসা হওয়ার কারণে তাকে কর্ম পুরুষও বলা হয়। এই প্রকার ত্রিদোষের সাথে শরীরের সমবায় সম্বন্ধ বর্তমান। কারণ দ্রব্যে গুণ এবং কর্ম সমবায় সম্বন্ধে থাকে।

আয়ুর্বেদের জ্ঞানের জন্য সমবায় একটি অতি আবশ্যক পদার্থ। চরকসংহিতার সূত্রস্থানে ৩০ নং অধ্যায়ে আয়ুর্বেদের লক্ষণে বলা হয়েছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধিকারক যা আয়ুর জন্য হিতকর এবং আয়ু হ্রাসকারী যা আয়ুর জন্য অহিতকর এমন দ্রব্য গুণ এবং কর্মের জ্ঞান হয়। এই প্রকার এখানে আয়ুর্বেদের

লক্ষণে আয়ু বৃদ্ধি কারক ও আয়ু হ্রাস কারক দ্রব্য ও তার গুণ কর্মের জ্ঞান হয় তা বলা হয়েছে।

সমবায় একটি সম্বন্ধস্বরূপ পদার্থ। সুতরাং সমবায় উভয়বৃত্তি। এখানে উভয় শব্দের দ্বারা অবয়ব-অবয়বী, দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-কর্ম, দ্রব্য, গুণ, কর্ম-জাতি, নিত্য-দ্রব্য বিশেষ এই যুগ্মগুলি বোধ্য। অবয়বে অবয়বী, দ্রব্যে গুণ, দ্রব্যে কর্ম, দ্রব্যে জাতি এবং নিত্য দ্রব্যে বিশেষ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এজন্যেই সমবায় ঐ যুগ্ম পদার্থে বৃত্তি হয়। সমবায়ের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না। উৎপত্তি বিনাশ শূন্য পদার্থকে নিত্য বলা হয়। নিত্যসম্বন্ধই সমবায়। "নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বম্"—এই লক্ষণে যদি 'নিত্যত্বে সতি' এই অংশটি যোজিত না হয়, তাহলে সংযোগাদিসম্বন্ধে অতিব্যাপ্তি হয়। সংযোগাদি সম্বন্ধ নিত্য নয়। 'নিত্যত্বেসতি' বলাতে সংযোগাদিতে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে না। এই লক্ষণে যদি 'সম্বন্ধতম্' এই অংশটি সন্নিবিষ্ট না হয়, কেবল 'নিত্যত্বম্' এইরূপ লক্ষণ করা হয়, তাহলে আত্মাদি নিত্যপদার্থে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। 'সম্বন্ধত্বম্' এই অংশটির নিবেশে ঐ অতিব্যাপ্তি হবে না, যেহেতু আত্মাদি পদার্থ নিত্য হলেও সম্বন্ধস্বরূপ নয়।

'নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বম্' এইরূপ লক্ষণ নির্দোষ নয়। সমবায়ের নির্দোষ লক্ষণ হল 'সম্বদ্ধিভিন্নত্বে সতি নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বম্।' 'সম্বন্ধিভিন্নত্বে সতি' এই অংশের দ্বারা বলা হল যে, সম্বন্ধের অনুযোগী ও প্রতিযোগী হতে ভিন্ন। যে পদার্থটি স্বয়ং সম্বন্ধের অনুযোগী ও প্রতিযোগী হতে ভিন্ন অর্থাৎ যে পদার্থটি স্বয়ং

সম্বন্ধ এবং স্বয়ং অনুযোগী ও প্রতিযোগী হতে ভিন্ন ও নিত্য তাকে সমবায় বলা হয়।[৫]

সংযোগের মতোই সমবায়েরও অনুযোগী, প্রতিযোগী স্বীকার করতে হয়। ঘটে রূপ সমবায় সম্বন্ধে থাকে, ঐ সমবায়ের অনুযোগী ঘট এবং প্রতিযোগী রূপ। ঘটানুযোগিক রূপ প্রতিযোগিক সমবায় উক্ত স্থলে প্রতীত হয়। রূপে রূপত্ব জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এই সমবায়ের অনুযোগী রূপ এবং প্রতিযোগী রূপত্বজাতি। রূপানুযোগিক রূপত্বজাতি প্রতিযোগিক সমবায় উক্ত স্থলে প্রতীত হয়। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকৃত হয়েছে। স্বরূপসম্বন্ধেরও অনুযোগী, প্রতিযোগী থাকে। কিন্তু স্বরূপসম্বন্ধটি সংযোগ ও সমবায়সম্বন্ধ হতে ভিন্ন প্রকারের হয়। সংযোগের ও সমবায়ের অনুযোগী, প্রতিযোগী থাকলেও সংযোগ ও সমবায় স্ব স্ব অনুযোগী ও প্রতিযোগী হতে ভিন্ন পদার্থ। স্বরূপ সম্বন্ধ কিন্তু ঐরূপ নয়। স্বরূপ সম্বন্ধ তার অনুযোগী কিংবা প্রতিযোগী হতে ভিন্ন নয়। স্বরূপ সম্বন্ধকে কখনো প্রতিযোগীর স্বরূপ কখনো বা অনুযোগীর স্বরূপ বলা হয়।

স্বরূপ সম্বন্ধ অনুযোগীর স্বরূপ অথবা প্রতিযোগীর স্বরূপ। স্বরূপ একটি সম্বন্ধ অথচ তা নিত্য। সমবায় সম্বন্ধকে যদি কেবল নিত্য সম্বন্ধ বলা হয় তবে স্বরূপ সম্বন্ধে ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়ে যাবে। অর্থাৎ 'নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বম্' —এই লক্ষণ স্বরূপ সম্বন্ধে সমন্বয় হয়ে যাবে। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'সম্বন্ধ ভিন্নত্বে সতি' এই অংশটির যোজনা করতে হবে। যে সম্বন্ধটি নিত্য এবং সম্বন্ধী হতে ভিন্ন

তাকে সমবায় বলা হয়। স্বরূপ একটি নিত্য সম্বন্ধ হলেও সম্বন্ধী হতে ভিন্ন হয় না, এজন্য স্বরূপ সম্বন্ধে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে না।

সংযোগ দুটি দ্রব্যের মধ্যস্থ সম্বন্ধ। সমবায় অযুতসিদ্ধ পদার্থ অতিরিক্ত হয় না। অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধ সবসময় অযুত সিদ্ধ পদার্থের মধ্যেই হয়ে থাকে। অবয়ব ও অবয়বী, গুণী ও গুণ, ক্রিয়াবান ও ক্রিয়া, ব্যক্তি ও জাতি, নিত্য দ্রব্য ও বিশেষ এই পাঁচটি যুগল পদার্থ অযুতসিদ্ধ। উক্ত প্রত্যেক যুগলের প্রথমটি অনুযোগী ও দ্বিতীয়টি প্রতিযোগী। এদের পারস্পরিক সম্বন্ধই সমবায়। অযুতসিদ্ধ শব্দের অর্থ কি? তার উত্তর এমনভাবে দেওয়া যায়। যে দুটি পদার্থের মধ্যে কোনো একটি অবিনশ্যদ্ অবস্থায় অর্থাৎ স্ববিনাশ কারণের অসন্নিধানকালে অপরটির আশ্রিত হয়েই থাকে, সেই পদার্থদ্বয়কে অযুতসিদ্ধ বলা হয়। ন, যুত, সিদ্ধ তিনটি শব্দের দ্বারা অযুতসিদ্ধ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ব্যাকরণের নির্দেশে 'ন' শব্দটি 'অ' থেকে পাই। 'যু' ধাতুর উত্তরে 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা 'যুত' শব্দ হয়। 'যুত' শব্দটি যু ধাতু থেকে এসেছে। 'যু' ধাতুর দুটি অর্থ একটি অর্থ হল মিশ্রণ এবং অপর অর্থটি হল অমিশ্রণ। একই ধাতু বিরুদ্ধ দুটি অর্থকে বোঝায়। এখানে অমিশ্রণ অর্থই অভিপ্রেত। অমিশ্রণার্থক 'যু' ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করলে 'যুত' শব্দটি হয়। যুত শব্দের অর্থ হবে অমিশ্রিত। অমিশ্রিত শব্দের অর্থ হল অসম্বন্ধ। যে দুটি পদার্থ পরস্পর যুত হলে (অসম্বন্ধ হয়ে) সিদ্ধ হয়, পরস্পরের সম্বন্ধ নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে, সেই দুটি পদার্থকে 'যুতসিদ্ধ' বলা হয়। হস্ত-পুস্তক, দন্ত-পুরুষ, বৃক্ষ-

পক্ষী প্রভৃতি যুগ্ম পদার্থ পরস্পর যুত-অসম্বন্ধ হয়ে সিদ্ধ হয়। হস্ত পুস্তকের সঙ্গে অসম্বন্ধ হয়ে এবং পুস্তক হস্তের সঙ্গে অসম্বন্ধ হয়ে থাকতে পারে। এইভাবে দন্ত ও পুরুষ, বৃক্ষ ও পক্ষী প্রভৃতি পরস্পরের সম্বন্ধ নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে, এইজন্য ঐ যুগ্ম পদার্থগুলি যুতসিদ্ধ। যুতসিদ্ধ ভিন্ন পদার্থকেই অযুতসিদ্ধ বলা হয়েছে। যে দুটি পদার্থের একটি অপরটির সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে থাকে, অসম্বন্ধ হয়ে থাকতেই পারে না, সে দুটি পদার্থকে অযুতসিদ্ধ বলা হয়। কখনও এমন হবে না যে, ঐ দুটি পদার্থ বিদ্যমান আছে, অথচ তাদের সম্বন্ধ নেই। যারা প্রথমে অসম্বন্ধ থেকে পরে সম্বন্ধ হয়, তারা অযুতসিদ্ধ নয়। দন্ড ও পুরুষ প্রথমে অসম্বন্ধ থাকে, পরে সম্বন্ধ হয়, এইজন্য দন্ড ও পুরুষ অযুতসিদ্ধ নয়। কিন্তু ঘট ও তার রূপ, ঘট ও ঘটত্ব প্রভৃতি কখনো অসম্বন্ধ হয়ে থাকতেই পারে না। ঘট উৎপত্তি সময় হতে ঘটত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েই থাকে। ঘট ও ঘটত্ব প্রথমে অসম্বন্ধ থেকে পরে সম্বন্ধ হয় না। ঘটত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ না হয়ে ঘট থাকতে পারে না। এইজন্য এইরূপ পদার্থদ্বয়কে অযুতসিদ্ধ বলা হয়। যে দুটি পদার্থের একটি অবিনশ্যদ্ অবস্থায় অপরটির আশ্রিত হয়েই থাকে, সেই দুটি পদার্থকে অযুতসিদ্ধ বলা হয়। যে দুটি পদার্থের একটি অবিনশ্যদ্ অবস্থায় অপরাশ্রিত হয়েই থাকে সেই দুটি পদার্থকে অযুতসিদ্ধ বলা হয়। দুটির মধ্যে একটি অপরটির আশ্রিত হয়েই থাকে। এই রূপ না বললে তন্তু ও পট অর্থাৎ অবয়ব ও অবয়বী অযুতসিদ্ধ হবে না।

নিত্যদ্রব্য ও নিত্যগুণ, নিত্যদ্রব্য ও তদাশ্রিতজাতি, নিত্যগুণ ও তদাশ্রিতজাতি এদের কোনটিরই বিনশ্যদ অবস্থা হয় না। এই সকল পদার্থ নিত্য হওয়ায় এদের

বিনাশের কারণ সন্নিধান হতেই পারে না। সুতরাং এই পদার্থগুলির একটি অপরটির আশ্রিত হয়েই থাকে, এইটুকু বললেই এদের অযুতসিদ্ধত্ব অব্যাহত হয়। 'অবিনশ্যৎ' পদটি উক্ত পরিভাষায় না থাকলেও নিত্য দ্রব্য ও তদাশ্রিত নিত্যগুণ, জাতি ও বিশেষ এবং নিত্য গুণ ও নিত্য গুণগত জাতি সমূহকে অযুতসিদ্ধ বলতে কোন বাধা হবে না।

অনিত্য পদার্থের মধ্যে অর্থাৎ অনিত্য দ্রব্য, অনিত্য গুণ ও কর্ম এই পদার্থ গুলির মধ্যে আশ্রয়াশ্রিত ভাবাপন্ন যে দুটি পদার্থ একই সময়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তারাও 'অবিনশ্যৎ' পদবর্জিত পরিভাষানুসারেই অযুতসিদ্ধ হয়ে যাবে। নিত্যদ্রব্য-নিত্যগুণ, নিত্যদ্রব্য-নিত্যজাতি, নিত্যদ্রব্য বিশেষ এবং নিত্যগুণ ও জাতি এই যুগ্মগুলির একটি অর্থাৎ নিত্যগুণ, জাতি, বিশেষ নিত্যদ্রব্যে এবং নিত্যগুণজাতি নিত্যগুণে আশ্রিত হয়েই থাকে, কখনো অনাশ্রিত থাকে না, যেহেতু আশ্রয় ও আশ্রিত উভয়ই নিত্য। যে দুটি পদার্থ অনিত্য, তাদের মধ্যে যদি একটি অপরটিতে আশ্রিত হয়েই থাকে এবং বিনাশকালে যদি একই সময়ে উভয়েরই বিনাশ হয়, তাহলে ঐ দুটি পদার্থ অনিত্য পদার্থও অযুতসিদ্ধরূপে জানা যাবে।

যেখানে আশ্রয় ও আশ্রিত উভয়ই বিনাশশূন্য, যেখানে আশ্রয় ও আশ্রিত উভয়ই যুগপদবিনাশী এবং যেখানে আশ্রয় বিনষ্ট হয় না অথচ আশ্রিত বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেই সকল স্থানে ঐ সকল যুগ্ম পদার্থের অযুতসিদ্ধত্ব সাধনে অবিনশ্যৎ পদের প্রয়োজন নেই। নিত্যদ্রব্য ও তদাশ্রিত নিত্যগুণ, জাতি, বিশেষ এবং নিত্য গুণ

ও তদাশ্রিত জাতি এই সকল যুগ্ম পদার্থ বিনাশহীন। উক্ত প্রক্রিয়ায় যুগপদ বিনাশী কপাল ও ঘট অবিনশ্যৎ পদের অভাবেও অযুতসিদ্ধ হবে।

কিন্তু যে পদার্থের মধ্যে আশ্রয়ের নাশে আশ্রিতের নাশ হয়, কপালের নাশে তৎ সমবেত বা আশ্রিত ঘটের নাশ হয়, অবয়বের নাশে অবয়বীর নাশ হয়, তাদৃশ কপাল ও তদাশ্রিত ঘট অর্থাৎ তাদৃশ অবয়ব ও তদাশ্রিত অবয়বী অযুতসিদ্ধ হবে না। যদি উক্ত পরিভাষায় অবিনশ্যৎ পদটি না থাকে। যদি এইভাবেই আশ্রয় ঘটের নাশে তদাশ্রিত গুণ ও কর্মের নাশ হয়, তাহলে ঘট ও তদ্‌গত গুণ, কর্ম এই অযুতসিদ্ধ পদার্থ যুগ্মের সংগ্রহ হবে না, যেহেতু আশ্রয়ের নাশ সময়ে তদাশ্রিত গুণ ও কর্ম অপরটির আশ্রিত হয়েই থাকে না। প্রথমক্ষণে ঘট নষ্ট হয়, এইরূপ স্বীকার করলে ঘট নাশক্ষণে তদ্‌গত গুণ এবং কপালনাশ ক্ষণে ঘট অনাশ্রিত হয়ে যাবে। ঘট গুণ ও ঘট অপরটির আশ্রিত হয়েই থাকবে না। সুতরাং অযুতসিদ্ধ হবে না। যে সকল গুণ স্ব-স্ব আশ্রয়ের নাশে বিনষ্ট হয়, সেই সকল গুণ স্ব-স্ব আশ্রয়নাশ ক্ষণে অনাশ্রিত হয়েই থাকবে, আশ্রিত হয়ে থাকবে না। সেই সকল গুণ ও তদাশ্রয় দ্রব্যের অযুতসিদ্ধত্বের উৎপত্তির জন্য ‘অবিনশ্যৎ’ পদ অবশ্যই অপেক্ষিত হবে। সেই সকল গুণ আশ্রয়নাশ ক্ষণে বিনশ্যদ্‌ অবস্থায় থাকে বলেই অনাশ্রিত থাকে। অবিনশ্যদ্‌ অবস্থায় অপরাশ্রিতই থাকে। এইভাবে ‘অবিনশ্যৎ’ পদের সার্থকতা স্বীকৃত হয়েছে।

'অপারশ্রিত' পদের সন্নিবেশ কেন করা হয়েছে, তার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন। যদি উক্ত পরিভাষায় 'অপরাশ্রিত' পদটি সন্নিবিষ্ট না হত, তাহলে বলতে হত যে দুটি পদার্থের মধ্যে একটি অবিনশ্যদ্ অবস্থায় থাকে, সেই দুটি পদার্থকে অযুতসিদ্ধ বলা হয়, এইরূপ বললে অর্থাৎ অবিনশ্যদ্ অবস্থায় অপরাশ্রিত হয়েই থাকে এইরূপ না বললে ঘট ও ঘট ধ্বংস এই যুগ্ম পদার্থ অযুতসিদ্ধ হয়ে যাবে যেহেতু ঐ দুটি পদার্থের মধ্যে অর্থাৎ ঘট ও ঘট ধ্বংসের মধ্যে একটি সর্বদাই অবিনশ্যৎ থাকে। কিন্তু ঘট ও ঘট ধ্বংস অযুতসিদ্ধ নয়। এই জন্য 'অপরাশ্রিত' শব্দটির সন্নিবেশ আবশ্যক। 'এব' শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে যে, এই দুটি ভাব পদার্থের মধ্যে একটিকে অপরটিতে আশ্রিত হয়েই থাকতে হবে, বিনশ্যদ্ অবস্থা ভিন্ন সর্বদাই আশ্রিত হয়ে থাকতে হবে। পক্ষী অবিনশ্যদ্ অবস্থাতেও আকাশে ভ্রমণ সময়ে বৃক্ষে আশ্রিত হয়ে থাকে না। সুতরাং বৃক্ষ ও পক্ষী অযুতসিদ্ধ হবে না।

সমবায়ের আশ্রয় ভিন্ন ভিন্ন হলেও সমবায় ভিন্ন ভিন্ন হয় না, বিভিন্ন ঘট থাকলেও ঘটত্ব যেমন এক, বিভিন্ন অধিকরণে থাকলেও সমবায়ও এক। ঘটত্ব ও সমবায়ে এইরূপ সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও সুস্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়। ঘট ভিন্ন হলেও ঘটত্বের ভেদ ব্যবহার হয় না, কিন্তু সমবায় এক হলেও অযুতসিদ্ধ পদার্থের ভেদে সমবায়ের ভেদ ব্যবহার হয়। বৈশেষিক দর্শনে সমবায়ের অনুযোগী ও প্রতিযোগী সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ আপেক্ষিক হয়। বৈশেষিক দর্শনে অনুমানের সাহায্যে সমবায়ের অস্তিত্ব ও সম্বন্ধ রূপও প্রতিপাদিত হয়েছে।

আয়ুর্বেদের বিষয়বস্তু রূপে দ্রব্য, গুণ ও কর্মকে স্বীকার করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে দ্রব্যের হিতকর বা অহিতকর গুণ কর্মের উপদেশ সমবায় সম্বন্ধের আধারেই দেওয়া হয়েছে। কারণ দ্রব্যের মধ্যে তার গুণ এবং কর্ম সমবায় সম্বন্ধেই থাকে। যেমন বলা হয় রাত্রিতে দধি সেবন অহিতকর। আয়ুর্বেদের এই উপদেশ সমবায় সম্বন্ধ আধারিত। আবার যখন বলা হয় পিত্তজ প্রকৃতির ব্যক্তির জন্য আমলকি হিতকর তখন সেই উপদেশও সমবায় সম্বন্ধের দ্বারাই করা হয়ে থাকে। কেননা আমলকির শীত গুণ আমলকিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এই কারণের জন্যই বলা হয় আমলকি পিত্তনাশক। যদি আমলকিতে শীত গুণ সমবায় সম্বন্ধ না থাকত তাহলে কখনই এই উপদেশ দেওয়া সম্ভব হত না। অতএব আয়ুর্বেদীয় বিষয় বস্তু অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম সমবায় সম্বন্ধ যুক্ত হওয়ায় সমবায়কে পদার্থ রূপে স্বীকার করা হয়েছে।

বিভিন্ন দ্রব্যের প্রয়োগ যার উপরে হয় সে কর্ম পুরুষ। এই কর্ম পুরুষ এর সাথে পঞ্চমহাভূতও সমবায় সম্বন্ধ যুক্ত।[৬] আয়ুর্বেদে জ্ঞেয় বস্তু শরীরে ত্রিদোষ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এটি শরীরের জন্য অপরিহার্য্য এবং এই ত্রিদোষের সাম্যাবস্থা রক্ষা করা আবশ্যক। জীবিত শরীরে ত্রিদোষের স্থিতি সমবায় সম্বন্ধের দ্বারাই হয়। অতএব ত্রিদোষের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। 'দোষধাতুমলমুলং হি শরীরং' বলা হয়েছে কেননা জীবিত শরীরে তা সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত থাকে যেমন দোষ সাম্য অনিবার্য্য তেমন ধাতু সাম্য বা সম্যক রূপে মল নিষ্ক্রমণ স্বাস্থ্য রক্ষার হেতু অতি আবশ্যক।

হেতু জ্ঞান বা লিঙ্গ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও সমবায় সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক। যেমন—কোন রোগীর শরীরে কম্পন, রুক্ষতাদি হেতু পাওয়া যায় তাহলে রুগীটি যে বাত দোষের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তা জানা যায়। কেননা রুক্ষতাদি গুণ বায়ুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। যদি সমবায় সম্বন্ধে না থাকত তাহলে রুগীটি যে বাত দোষের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তা জানা সম্ভব হত না। এই প্রকার বাত-প্রকোপ হেতুর জ্ঞানও সমবায়ের দ্বারা হয়ে থাকে।

নিঃশেষ দুঃখ নিবৃত্তি বা মোক্ষের ক্ষেত্রেও সমবায় সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়েছে। লিঙ্গ শরীরের আত্মা, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিত্যরূপে অর্থাৎ সমবায় রূপে রাগ, দোষ যুক্ত হয়। এই প্রকার রাগ, দোষ অথবা রজ ও তমঃ রাশি পুরুষ বা জীবাত্মায় সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত থাকে। সমবায় সম্বন্ধ অনুসারে যদি আশ্রয় বা আশ্রিত দুটির মধ্যে কোন একটির বিনাশ হয় তাহলে অন্যটির অস্তিত্ব অথবা সত্তা সমাপ্ত হয়ে যায়। আত্মা বা জীবাত্মার সঙ্গে রাগ, দ্বেষ বা রজ, তমঃ সমবায় সম্বন্ধ যুক্ত। যখন রজ, তমঃ বা রাগ দোষকে তার আশ্রয় থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় তখন রাগ, দ্বেষ বা রজঃ, তম, এদের অস্তিত্ব সমাপ্ত হয়ে যায়। মোক্ষ বলা হয়।[৭]

ন্যায় দর্শনে যেমন সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে তেমনি চরকসংহিতাকেও সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ দুটি পদার্থের মাঝে সমবায় সম্বন্ধ থাকলে তারা আধার আধেয় ভাবে প্রতীত

হয়। এটি চরকসংহিতায় বলা হয়েছে। সংযোগ সম্বন্ধ থাকলেও দুটি বস্তু অনেক ক্ষেত্রে আধার আধেয় ভাবে জ্ঞাত হয় যেমন—গাছে পাখি বসে থাকলে, গাছটি এবং পাখিটির মধ্যে আধার আধেয় ভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সংযোগ সর্বদায় যে বৃত্তি নিয়ামক হবে এমন নয়। দুটি পরমাণুর সংযোগ হতে পারে কিন্তু সেখানে একটি পরমাণু আধার অন্যটি আধেয় এমনভাবে প্রতীত হয় না। আমরা দুটি হাত যখন সংযুক্ত করি তখন কিন্তু তারা আধার আধেয়ভাবে প্রতীত হয় না। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ সর্বদায় আধার আধেয় ভাবে প্রতীতির নিয়ামক। সংযোগ সম্বন্ধ সব সময় দুটি দ্রব্যের মধ্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ দ্রব্য, গুণ, কর্ম ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। যেমন—পট ও পট রূপ এদের মধ্যে সম্বন্ধও সমবায়। কিন্তু এদের প্রথমটি দ্রব্য এবং দ্বিতীয়টি গুণ। সংযোগ সম্বন্ধ দুটি যুতসিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে হয় কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ সব সময় দুটি অযুতসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে হয়। সংযোগ বহু ও অনিত্য কিন্তু সমবায় নিত্য ও এক। সংযোগ সম্বন্ধ একটি বিশেষ সময় উৎপন্ন হয় এবং বিশেষ সময় বিনষ্টও হয়ে যায়। ন্যায় বৈশেষিক মতে এবং চরক সংহিতাতেও আমরা দেখি সংযোগ একটি গুণ পদার্থ কিন্তু সমবায় একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। সংযোগ সম্বন্ধ যুক্ত দ্রব্যদ্বয় পরস্পরের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে, কারণ সংযোগ গুণ বলে সংযোগী দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু সমবায় তার অনুযোগী ও প্রতিযোগীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য অন্য সম্বন্ধের অপেক্ষা করে না। সমবায় নিজের স্বরূপের দ্বারাই অনুযোগী ও প্রতিযোগীর সঙ্গে যুক্ত হয়।[৮]

অভাব পদার্থ:

আয়ুর্বেদে অভাব পদার্থের পৃথক উল্লেখ না থাকলেও তাকে একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। যারা অভাবকে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকার করেননি তাদের মতে অভাবের দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন হয় না। এবং অভাবের প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই অভাবকে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকার করার কোন যুক্তি নেই।

চরকসংহিতায় অভাবকে পৃথক পদার্থরূপে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু জগতের সমস্ত বস্তুকে সৎ অসৎ এই দুই প্রকারে ভাগ করা হয়েছে।[৯] এই অসতের প্রমাণ হিসাবে অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অতএব অভাব পদার্থ যে একেবারেই অস্বীকৃত হয়েছে তা বলা যায় না। চক্রপাণী দত্ত বলেছেন সকলেই জানে যে যা কিছু প্রমাণ করা হয় তা সৎ ও অসৎ এই দুই প্রকার। সৎ বলতে বিধি বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ ভাব পদার্থ বোঝায়। অসৎ বলতে নিষেধ বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ অভাব পদার্থকে বোঝায়।[১০]

আয়ুর্বেদে রোগ শূন্য, রোগহীন অবস্থাকে আরোগ্য বলা হয়েছে। এখানে হীন, শূন্য শব্দ অভাবেরই সূচক। আবার চরকসংহিতায় শরীর স্থানে মনের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে জ্ঞানের অভাব ও ভাবই হচ্ছে মনের লক্ষণ।[১১] সুতরাং আমরা এখান থেকে অভাবের ধারণা লাভ করতে পারি। আবার নিজ রোগের কারণ রূপে বায়ু, পিত্ত ও কফের সাম্যাবস্থার অভাবকে স্বীকার করা হয়েছে। এখান থেকেও আমরা অভাবের ধারণা লাভ করতে পারি।

উৎপত্তিকে ভাব স্বরূপ এবং বিনাশকে অভাব স্বরূপ বলা হয়েছে। যখন বিষম ধাতুর সেবন করা হয় তখন ধাতুর বিষমতা উৎপন্ন হয় এবং যখন সমধাতু সেবন করা হয় তখন ধাতুর সমতা উৎপন্ন হয়।[১২]

ন্যায় বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে পদার্থ দুই রকম ভাব এবং অভাব।[১৩] চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ভাব পদার্থ। টেবিল না থাকা, চেয়ার না থাকা ইত্যাদি অভাব পদার্থ। থাকা যেমন জ্ঞানের বিষয় হয়, না থাকাও তেমনি জ্ঞানের বিষয় হয়। নিষেধ বুদ্ধির বিষয় যা তাই অভাব যেকোন জ্ঞানের বিষয় অবশ্যই ঐ জ্ঞানের থেকে অতিরিক্ত কোন পদার্থ হবে। সামনে যে টেবিলটি আমরা প্রত্যক্ষ করছি সেটি যেমন আমাদের জ্ঞানের থেকে ভিন্ন একটি পদার্থ তেমনি ঐ টেবিলে বই না থাকা বা বই এর অভাবও প্রত্যক্ষ করেছি, সেটাও আমাদের জ্ঞান থেকে ভিন্ন একটি পদার্থ। ভাবের নিষেধই অভাব, ভাব বস্তুরই অভাব সম্ভব হয়। আগে যাকে আছে বলে জানিনি তাকে নেই বলা সম্ভব নয়। যার অভাব তাকে বলা হয় ঐ অভাবের প্রতিযোগী, ঘটের অভাবের প্রতিযোগী হল ঘট, টেবিলের অভাবের প্রতিযোগী হল টেবিল। ঘট, টেবিল এই দুটি বাস্তব বস্তু। কিন্তু শশ-শৃঙ্গ বলে কোন বস্তু বাস্তব নয় বা প্রসিদ্ধ নয়, কাজেই শশ-শৃঙ্গের অভাব বলে কোন পদার্থ স্বীকৃত হতে পারে না। কারণ অলীক প্রতিযোগিক অভাব স্বীকৃত নয়।

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে দু প্রকার অভাবের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এগুলি হল—অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব। সংসর্গাভাবকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় প্রাগ্‌ভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব।

আয়ুর্বেদে ভাব পদার্থ যেমন স্বীকার করা হয়েছে অভাব পদার্থও তেমন স্বীকার করা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে অভাব নির্ণয় এবং তার পূরণের চেষ্টার দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মার প্রসন্নতা রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। আয়ুর্বেদে পৃথক পৃথক ভাবে ভাব এবং অভাব পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাণ বায়ুর প্রধ্বংসাভাবের জন্য মৃত্যু অবশ্যই স্বীকার করা হয়েছে।[১৪]

তথ্যসূত্র:

১. "সমবায়ো অপৃথগ্‌ভাবো ভূম্যাদীনাং গুনৈর্ম্মতঃ। স নিত্যো যত্র হি দ্রব্যং ন তত্রানিয়তো গুণঃ।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* হিন্দি অনুবাদ ব্যাখ্যাকার কাশীনাথ পাণ্ডে এবং গোরখনাথ চতুর্বেদী সম্পাদক, রাজেশ্বর দত্ত শাস্ত্রী, চৌখাম্বা, বিদ্যাভবন বারাণসী-১, ১৯৬১, পৃ. ২৩।

২. "অপৃথগভাবোঅযুতসিদ্ধিঃ সহৈবাবস্থানমিতি যাবৎ, যথা—অবয়বাবয়বিনোঃ গুণগুণিনোঃ কর্ম্মকর্ম্মবতোঃ সামান্যসামান্যবতোঃ নহ্যবয়বাদীন্ বিরহয্যাবয়ব্যাদয় উপলভ্যন্তে।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকা সহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও সংশোধিত, বারাণসী, চৌখাম্বা অরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১, প্রথম খণ্ড, পৃ.৭২।

৩. "অপৃথগভাবমেব বিশেষয়ন্নাহ, ভূম্যাদীনাং গুণৈর্মত ইতি। ভূম্যাদীনাং ভূমি প্রকারাণাং ভূমিশ্চ ভুয়সামাধেয়ানামাধারা, তেনাধারত্বোদাহরণার্থমুক্তা, যতো ভূমেরার্থাঃ সর্ব্বে গুর্ব্বাদিপরাদ্যাশ্চ গুণাস্তথা চাবয়বিসামান্যকর্ম্মার্ণ্যপ্যাধেয়ানি, নেতরদ্রব্যে যথোক্তসর্ব্বাধেয়সম্পত্তিঃ। এতেন ভূম্যাদীনামিত্যাধারাণাং, গুণৈরিত্যপ্রধানৈরাধেয়ৈঃ, আধেয়ো হ্যাধারাপেক্ষয়াপ্রধানম্, অপ্রধানে চ গুণশব্দো যথা—"গুণীভূতোয়ম্" ইত্যপ্রধানথিত্যর্থঃ তেনাধারাণামাধেয়ৈর্যোপৃথগভাবঃ স সমবায়ঃ সম্বন্ধ ইহেতি, তেন পৃথিবীত্বগন্ধবত্ত্বয়োরপৃথবাসিদ্ধয়োরপধ্যারাধেয়ভাবাভাব্যা ন সমবায় ইত্যুক্তং ভবতি।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকা সহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও সংশোধিত, বারাণসী চৌখাম্বা অরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১, প্রথম খণ্ড। পৃ. ৭৫।

৪. “পঞ্চমহাভূত শরীরি সমবায় পুরুষ ইতি, স্ব এষ কর্মপুরুষ চিকিৎসাধিকৃত।” মহর্ষি সুশ্রুত, *সুশ্রুত সংহিতা,* অনুবাদক অত্রিদেব, মতিলাল বানারসী দাস, বারাণসী, ২০১৫, পৃ. ২৯৬।

৫. শ্রীমদন্নংভট্ট বিরচিত, *তর্কসংগ্রহ,* নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৪১৩, পৃ. ৭৪।

৬. “পঞ্চমহাভূত শরীরি সমবায়ঃ পুরুষঃ ইতি স্ব এষ কর্ম পুরুষঃ চিকিৎসাকৃত।” মহর্ষি সুশ্রুত, *সুশ্রুতসংহিতা,* অনুবাদ অত্রিদেব, মতিলাল বানারসী দাস, বারাণসী, ২০১৫, পৃ. ২৯৬।

৭. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* দ্বিতীয় খণ্ড, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ২০০৮, পৃ. ২০৯।

৮. শ্রীমদন্নংভট্ট বিরচিত *তর্কসংগ্রহ* সটীক: অধ্যাপনা সহিত: শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, পৃ. ৭৫।

৯. ‘দ্বিবিধমেব খলু সর্ব্বৎ সচ্চাসচ্চ।’, মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ কবিরাজ প্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ সম্পাদিত, কলকাতা নবপত্র প্রকাশন, ২০০৩, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০৪।

১০. “সর্ব্বমিতি যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণপ্রতীয়মনং, তদ্ দ্বিবিধম্। তদদ্বৈবিধ্যমহসচ্চাসচ্চ। সদিতি বিধিবিষয় প্রমাণগম্যং ভাবরূপম্, অসদিতি নিষেধ- বিষয়-প্রমাণগম্যম্ অভাবরূপম।” মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকা সহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও সংশোধিত, বারাণসী চৌখাম্বা অরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৯০।

১১. “লক্ষণং মনসো জ্ঞানাস্যাভাবো ভাব এব চ।” মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা ব্যাখ্যা সহ হিন্দি ব্যাখ্যা কাশীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত গঙ্গা সহায় পান্ডে, প্রিয়ব্রত শর্মা, প্রথম ভাগ, চৌখাম্বা সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৬৯।

১২. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* শ্রী জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, পূর্বভাগ, মতিলাল বারাণসী দাস, বারাণসী, ২০১৮, পৃ. ১৩৬।

১৩. শ্রীমদন্নভট্ট বিরচিত *তর্কসংগ্রহঃ* সটীকঃ অধ্যাপনা সহিতঃ, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, পৃ. ৯২।

১৪. মল্লিক আশীষকুমার, *আয়ুর্বেদ সিদ্ধান্ত দর্শন ও পদার্থ সূত্র,* দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০১, পৃ. ১৭৮।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পর্যালোচিত অন্যান্য পদার্থ

চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসকের আলোচনার উপর চরক অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসককে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য যে যে বিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলেছেন তারা সংখ্যায় ৪৪টি। কেবলমাত্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পাঠই নয়, চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসকের আলোচনাকেও আয়ুর্বেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। সেই আলোচনাকে সম্ভাষা বলা হয়েছে। সম্ভাষা দ্বিবিধ সন্ধ্যায় সম্ভাষা এবং বিগৃহ্য সম্ভাষা। চরক সংহিতায় কেবলমাত্র সম্ভাষাবিষয়ক আলোচনাই করা হয়নি। এই আলোচনার জন্য যে যে পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষিত তাদের সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এরাও চরক সংহিতার আলোচ্য বিষয় এবং এই অর্থে পদার্থ পদবাচ্য।

চিকিৎসকদের জ্ঞানানুশীলনের জন্য বাদ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রয়োজন। সেই জন্য চরকসংহিতায় চুয়াল্লিশটি পদার্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল—বাদ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিষ্ঠাপনা, হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয়, নিগমন, উত্তর, সিদ্ধান্ত, শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য, ঔপম্য, সংশয়, প্রয়োজন, সব্যভিচার, জিজ্ঞাসা, ব্যবসায়, অর্থ প্রাপ্তি, সম্ভব, অনুযোজ্য, অননুযোজ্য, অনুযোগ, প্রত্যনুযোগ, বাক্যদোষ, বাক্যপ্রশংসা, ছল, অহেতু, অতীতকাল, উপালম্ভ পরিহার, প্রতিজ্ঞাহানি, অভ্যনুজ্ঞা, হেত্বান্তর, অর্থান্তর,

নিগ্রহস্থান।[১]

পূর্বেই যেহেতু দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই ছয়টি পদার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাই এখানে এই পদার্থ গুলি ছাড়া আর যে সকল পদার্থ রয়েছে সেই সকল পদার্থ গুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

বাদঃ

শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের জন্য বাদী এবং প্রতিবাদী যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তাকে বাদ বলা হয়। চরকসংহিতায় তাই সর্বপ্রথম বাদকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এখানে বাদ কথাটা বিগৃহ্যসম্ভাষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সমশাস্ত্র ব্যবসায়ী বা তদ্বিদ্য সম্ভাষা চরকের মতে মূলতঃ দুপ্রকার সন্ধ্যায় সম্ভষা এবং বিগৃহ্যসম্ভষ। পরস্পর সন্ধিপূর্বক যে শাস্ত্রালোচনা করা হয় তাকে সন্ধ্যার সম্ভাষা বলা হয়। বাদ হল দুই প্রকার জল্প ও বিতন্ডা।[২]

ন্যায় দর্শনের ষোলটি পদার্থের কথা স্বীকার করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল বাদ। সেখানে বলা হয়েছে প্রমাণ ও তর্কের সাহায্যে স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করা হয় এবং যা সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধ নয় এবং যা প্রতিজ্ঞা, হেতু ইত্যাদি পক্ষ অবয়বযুক্ত বাদী ও প্রতিবাদী বাক্যসমূহ তাহল বাদ।[৩] আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকায় চক্রপাণি দত্ত বাদ শব্দের দ্বারা পক্ষ ও প্রতিপক্ষের বচনকে বুঝিয়েছে।[৪]

ন্যায় দর্শনে ও চরকসংহিতায় বাদ শব্দটি অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। আমরা দেখতে পাচ্ছি চরকসংহিতায় বিচার বা আলোচনার উদ্দেশ্য উল্লেখ পূর্বক বাদের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ন্যায়দর্শনে কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হয়নি বরঞ্চ এখানে বাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তথা বাদ বিচার যাদের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে তাদের নির্দেশ করে বাদের স্বরূপ ব্যাখাত হয়েছে।

জল্প :

বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই এক একটা পক্ষকে অবলম্বন করে যখন জয় পরাজয়ের উদ্দেশ্য বিচারে অংশগ্রহণ করে তখন তাকে জল্প বলা হয়। যেমন—পুনর্জন্ম আছে কি নেই। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে এক্ষেত্রে বাদী প্রতিবাদী উভয়েই নিজের পক্ষ স্থাপন করতে চায় এবং অন্যের পক্ষ নিরস্ত করতে চায় একেই জল্প বলা হয়।[৫]

ন্যায় দর্শনেও আমরা জল্পের কথা পাই সেখানে জল্পকে একটি পৃথক পদার্থ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন ভাষ্যে বলা হয়েছে বাদের লক্ষণে যে সকল বিশেষণের কথা বলা হয়েছে সেই সম্ভব্য বিশেষণ বিশিষ্ট হয়ে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের দ্বারা সাধন করাকে জল্প বলা হয়।[৬] অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাদ স্থলে ন্যায় বিচার প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র প্রমাণ তর্ক নয় ছল, জাতি, নিগ্রহস্থানের প্রয়োগের অবকাশ আছে।

বিতন্ডা:

জল্পের বিপরীত স্বভাব হল বিতন্ডা অন্যভাবে বলা যায় জল্পের বিপর্যয় হয় বিতন্ডা। যদি কেউ নিজের পক্ষ স্থাপন না করে কেবলমাত্র পর পক্ষের দোষকেই দেখায় তাহলে তা হবে বিতন্ডা।[৭]

চরকসংহিতায় বিতন্ডার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে ন্যায় দর্শনের বিতন্ডার স্বরূপ বিষয়ক মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ ন্যায় দর্শনে বিতন্ডা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে বিচারে বা আলোচনায় প্রতিবাদী নিজ পক্ষ স্থাপন না করে কেবল অপর পক্ষ খণ্ডনই করে থাকেন সেই আলোচনাকে বিতন্ডা বলা হয়।[৮]

প্রতিজ্ঞা:

বিচারে নিজ পক্ষ স্থাপনার অভিপ্রায়ে নিজ পক্ষের উপস্থাপক বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলে। সাধ্য বচনকে প্রতিজ্ঞা বলা হয় অর্থাৎ যে বিষয়কে স্থাপন করতে হবে সেই সাধ্য বিষয়কে নির্দেশ করার নামই হচ্ছে প্রতিজ্ঞা। যেমন—'পুরুষ নিত্য' এই বাক্যটি হল প্রতিজ্ঞা। এখানে পুরুষ যে নিত্য এটাই সাধন করতে হবে।[৯] এখানে আমরা ন্যায় দর্শনের সাথে চরক সংহিতার মত পার্থক্য লক্ষ্য করি। কারণ ন্যায় দর্শনে প্রতিজ্ঞাকে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকার করা হয় না। প্রতিজ্ঞাকে পঞ্চ অবয়বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ন্যায় দর্শনে যা সাধন করতে হবে এই রূপ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর বোধক যে বাক্য তাকে প্রতিজ্ঞা বলা হয়।[১০]

স্থাপনা :

হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমনের সাহায্যে প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা উপস্থাপিত পক্ষকে প্রমাণার্থে নিজ পক্ষ রূপে স্থাপন করাকে স্থাপনা বলা হয়। যেমন—

প্রতিজ্ঞা—পুরুষ নিত্য।

হেতু—অকৃতকত্ত্বাৎ।

দৃষ্টান্ত—যেমন—আকাশ অকৃতক।

উপনয়—আকাশ যেমন অকৃত তেমনী পুরুষও অকৃতক।

নিগমন—অতএব পুরুষ নিত্য।[১১]

বিচারে নিজ পক্ষ স্থাপনার নিমিত্ত পঞ্চাবয়ব বাক্যের উপস্থাপনার কথা স্বীকার করা হয়েছে। ন্যায় দর্শনে বিচারে নিজ পক্ষ স্থাপনার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বাক্যকে অবয়ব রূপে স্বীকার করা হয়েছে। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন এই পাঁচটি বাক্যকেও অবয়ব বাক্য বলা হয়েছে। তার মাধ্যমেই কীরূপে নিজ পক্ষ স্থাপনার কাজ সুসম্পন্ন হয় তা বোঝানো হয়েছে।

প্রতিস্থাপনা:

প্রতিজ্ঞার বিপরীত যা স্থাপন করা হয় তাই হল প্রতিস্থাপনা। অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর মতের বিরুদ্ধ পক্ষকে নিজের পক্ষ রূপে স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। তাকে প্রতিস্থাপনা বলে। আমাদের পূর্বে উল্লিখিত দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রতিস্থাপন হবে নিম্নরূপ। যেমন—

প্রতিজ্ঞা—পুরুষ অনিত্য।

হেতু—ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ।

দৃষ্টান্ত—ঘট।

উপনয়—ঘট যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অনিত্য তেমনি পুরুষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায় অনিত্য।

নিগমন—অতএব পুরুষ অনিত্য।[১২]

হেতু:

যার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে হেতু বলা হয়। হেতুর সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করা যায় সেই জ্ঞানকে তত্ত্ব বলা হয়। আমরা জানি হেতু বলতে উপলব্ধির কারণকে বোঝায়। সেই উপলব্ধি বলতে তত্ত্বের উপলব্ধি বললে উপলব্ধির সাধন বলতে প্রমাণকে বোঝায়। কিন্তু বিচার স্থলে প্রস্তাবিক পক্ষের সাধক যে তাকেও ‘হেতু’ শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে।[১৩] ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে কিন্তু হেতুকে পৃথক পদার্থ রূপে স্বীকার করা হয়নি। ন্যায় দর্শনে যে পঞ্চঅবয়বী ন্যায়ের কথা বলা হয়েছে সেই পঞ্চ অবয়বের মধ্যে দ্বিতীয় অবয়ব হল হেতু। ন্যায় দর্শনে হেতুর যে লক্ষণের কথা বলা হয়েছে তাহল যার সাহায্যে সাধ্যের সাধন হয়ে তাকে হেতু বলা হয়। [১৪] সেই হেতুর উপস্থাপক বাক্যও হেতু বাক্য নামে পরিচিত।

দৃষ্টান্ত:

যে তুলনা দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়কে মূর্খ ও পন্ডিত উভয় ব্যক্তিই সমানভাবে বুঝতে পারে তাকে দৃষ্টান্ত বলা হয়। সূর্য যেমন প্রকাশ। তেমনি জ্ঞানও প্রকাশক। এইরূপ তুলনামূলক বর্ণনাই হল দৃষ্টান্ত।

টীকাকার চক্রপাণি দত্ত আয়ুর্বেদ দীপিকায় বলেছেন যে বিষয় লৌকিক অর্থাৎ সাধারণ মানুষ এবং পন্ডিত ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে কোন বিবাদ না করেই সাধ্যের সিদ্ধি হয় তাকে দৃষ্টান্ত বলা হয়। যে তুলনার দ্বারা বর্ণনীয় বিষয় সাধারণ মানুষ বোঝেন না কেবল পন্ডিতরা বোঝেন এমন তুলনাকে দৃষ্টান্ত বলা যাবে না।[১৫] ন্যায় দর্শনে ও বোধ্যা ও বোধরিতা উভয়ের বুদ্ধি সাম্য যে বিষয়ে হয় তাকে বলা হয়েছে দৃষ্টান্ত। সেই দৃষ্টান্তের উপস্থাপক বাক্যকে উদাহরণ বাক্য বলা হয়েছে।

উপনয়:

চরক সংহিতার উপনয়-এর কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষণ দেওয়া হয়নি। তবে উদাহরণের সাহায্যে উপনয়ের স্বরূপ বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন—উল্লিখিত উদাহরণে স্থাপনার দ্বারা ‘আকাশ অকৃতক’ এটা বলা হল সেই রূপ পুরুষও হল অকৃতক। আবার যখন আমরা প্রতিস্থাপনার আলোচনা করলাম তখন সেখানে বলা হল ঘট ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সেই জন্য ঘট অনিত্য, তেমনি পুরুষ ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ফলে তা অনিত্য। এই দুটি উপনয়ের উদাহরণ।[১৬]

ন্যায় দর্শনে উপনয়কে পৃথক পদার্থ রূপে স্বীকার করা হয় না তাকে বিচারে নিজ পক্ষ প্রতিষ্ঠার্থে প্রযুক্ত চতুর্থ অবয়ব হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। সাধ্যধর্মীতে উদাহরণের বাক্যানুসারী 'তথা' অথবা 'ন তথা' এই রকম যে বাক্যের ব্যবহার করা হয় তাকে উপনয় বলা হয়।[১৭]

নিগমন :

চরক সংহিতায় উপনয়ের মত নিগমনেরও কোন পৃথক লক্ষণের কথা বলা হয়নি। নিগমনকেও উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন—যখন স্থাপনার ক্ষেত্রে বলা হল সুতরাং 'পুরুষ নিত্য' এবং প্রতিস্থাপনার ক্ষেত্রে বলা হয় সুতরাং 'পুরুষ অনিত্য' এইগুলি নিগমনের উদাহরণ।

ন্যায় দর্শনে পঞ্চম অবয়ব রূপে নিগমনকে স্বীকার করা হয়েছে। চরকসংহিতায় নিগমনের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষণের কথা উল্লেখ পাওয়া যায় না কিন্তু ন্যায় দর্শনে নিগমনের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে প্রতিজ্ঞা বাক্যের পরে যে হেতু বাক্য বলা হয় তার উল্লেখ করে, সেই প্রতিজ্ঞা বাক্যের যে পুনর্বচন তাকে নিগমন বলা হয়।[১৮] প্রতিজ্ঞা বাক্যের মাধ্যমে যে পক্ষ স্থাপনার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই স্থাপিত হয়েছে বলে নিগমন বাক্যে ঘোষিত হয়।

উত্তর:

সাধর্ম্যের দ্বারা যদি হেতু প্রদর্শিত হয় তাহলে তার বিপরীত বৈধর্ম্য প্রদর্শন করাকে বা যদি বৈধর্ম্যের দ্বারা হেতু প্রদর্শিত হয় তাহলে তার বিপরীত সার্ধম্য প্রদর্শন করাকে উত্তর বলা হয়। যেমন—যদি একপক্ষ এমন কথা বলে যে বিকার গুলি হেতুর সমানধর্মী তার কারণ শীত জনিত ব্যাধি শীতল হেতুর সমান ধর্ম বিশিষ্ট এই জন্য হিম, শিশির ও বাত সংস্পর্শ শীতজনিত ব্যাধির বৃদ্ধির কারণ হবে। এর প্রত্যুত্তরে অপর পক্ষ যদি বলে যে বিকারসমূহ হেতুর বিপরীত ধর্মী, কেননা শরীরের অবয়ব সমূহের দাহ, উষ্ণতা, কোথ ও পচন বিষয়ে হেতুর বিপরীতধর্মী যে হিম, শিশির ও বাত সংস্পর্শ, তাদের দ্বারা ঐ সকল ব্যাধির উপশম হয়ে থাকে। এই ধরনের জবাবকে উত্তর বলা হয়।[১৯]

সিদ্ধান্ত:

পরীক্ষকগণ নানান পরীক্ষা করে অথবা বিভিন্ন হেতুর দ্বারা সাধন করে যে নির্ণয়ের স্থাপনা করেন তাকে সিদ্ধান্ত বলা হয়েছে।[২০]

ন্যায় সূত্রে গৌতম বলেছেন যে সকল পদার্থ কোন শাস্ত্র বোধিত, সেই সকল পদার্থের স্বীকার রূপ যে নিশ্চয় তাকে সিদ্ধান্ত বলা হয়। চরকসংহিতায় নির্ণয়কে সিদ্ধান্ত বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য গঙ্গাধর তার জল্পকল্পতরু টীকায় বলেছেন যে—গৌতম যাকে নির্ণয় বলেছেন তাই চরকসংহিতার সিদ্ধান্ত। এই কারণে চরকসংহিতায় অতিরিক্ত পদার্থ রূপে নির্ণয়ের আলোচনা করা হয়নি।[২১]

চরকসংহিতায় সিদ্ধান্তের চারটি প্রকার ভেদের কথা স্বীকার করা হয়েছে। সেগুলি হল—সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত, অধিকরণ সিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত।[২২] উক্ত প্রকার ভেদ ন্যায় দর্শনের মত সাথে মিল পাওয়া যায় কারণ ন্যায় দর্শনেও এই প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয়েছে।[২৩]

সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত: যে তত্ত্ব সকল শাস্ত্রে সমানভাবে স্বীকার করা হয় তাকে সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলা হয়। যেমন—রোগ সমূহের কোন না কোন কারণ আছে এবং রোগ সারানোর কোন না কোন উপায়ও আছে। এটি যেহেতু সকল শাস্ত্রে স্বীকৃত তাই একে সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলা হয়।[২৪]

ন্যায় দর্শনে যে সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে সেখানে বলা হয় যা সকল শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ হয়ে যা কোনও শাস্ত্রে মেনে নেওয়া হয়েছে তাকে সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলে। যেমন ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়, গন্ধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের অর্থ, পৃথিবী প্রভৃতি ভূত, পদার্থের প্রমাণের দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হয়।[২৫]

প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত: যে বিষয় এক একটি শাস্ত্রে পৃথক পৃথক ভাবে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকল শাস্ত্রে সমানভাবে স্বীকৃত নয় তাকে প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলে। যেমন—চরকসংহিতার ছয় প্রকার রসের কথা বলা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে আট প্রকার রসের কথা বলা হয়েছে। কোন কোন শাস্ত্রে রোগের কারণ রূপে কেবলমাত্র বায়ু, পিত্ত, কফের কথা স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু চরকসংহিতায় বায়ু, পিত্ত, কফ এদের সাথেও পঞ্চমহাভূত গুলিকেও কারণ রূপে স্বীকার করা হয়েছে।[২৬]

ন্যায় দর্শন অনুসারে যে বিষয় নিজের শাস্ত্রে সিদ্ধ কিন্তু অপর শাস্ত্রে অসিদ্ধ তাকে প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলা হয়েছে।[২৭]

অধিকরণ সিদ্ধান্ত: যে অধিকরণটি উপস্থাপিত হলে অন্যান্য অধিকরণ স্বভাবতই সিদ্ধ হয় তাকে অধিকরণ সিদ্ধান্ত বলা হয়। যেমন—"জীবন্মুক্ত পুরুষ সব কিছুতে নিঃস্পৃহ হওয়ার কারণে আনুবন্ধিক কর্ম করে না" এই সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত হলে এর দ্বারা কর্মফল, মোক্ষ, পুরুষ ও প্রেত্যভাবের অস্তিত্বও সিদ্ধ হয়ে যায়।[২৮]

ন্যায় দর্শনেও বলা হয়েছে যে পদার্থের সিদ্ধি হলে অন্য সাধ্য পদার্থের সিদ্ধি হয়ে যায় তাকে অধিকরণ সিদ্ধান্ত বলা হয়।[২৯] যেমন—আত্মা ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা এক পদার্থের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ যদি প্রথমে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ করা হয় এবং তার পরে যদি ত্বগিন্দ্রিয়ে দ্বারা ওই পদার্থের প্রত্যক্ষ করা হয় তাহলে আত্মাতে একই রকমের জ্ঞান উৎপন্ন হবে। অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয়ে দ্বারা ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা একই বস্তুর একই রকম জ্ঞান থেকে বোঝা যায় যে আত্মা ইন্দ্রিয় থেকে পৃথক।

অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত: চিকিৎসকগণ যখন পরস্পর আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে যে বিষয় গুলি তাদের মত সিদ্ধ নয়, পরীক্ষিত নয়, তার উপদেশ তারা করেনি বা সে গুলিকে অহেতুক বলে প্রতিপন্ন করেছেন, সেই সকল বিষয়ে তারা

আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তখন তাকে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত বলা হয়। যেমন—যখন তারা বলেন আমরা এখন গুণকে প্রধান করে ব্যাখ্যা করব, বা এখন আমরা কর্মকে প্রধান করে ব্যাখ্যা করব।[৩০] ন্যায় মতে যেখানে প্রতিবাদী কোন পদার্থে তাঁর অপরীক্ষিত ধর্ম বা অসম্মত অপর বিশেষ ধর্মের পরীক্ষা করেন, সেখানে প্রতিবাদীর স্বীকৃত সেই অপরসিদ্ধান্তকে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত বলে।[৩১] যেমন কোন বাদী শব্দকে নিত্য এবং দ্রব্য পদার্থ বলে স্বীকার করেন এবং প্রতিবাদী যদি শব্দের দ্রব্যত্ব স্বীকার করে তা নিত্য না অনিত্য তা বিচার করে তাহলে এই স্থলে সিদ্ধান্ত স্বীকারই অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত।

শব্দ:

চরকসংহিতায় শব্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে শব্দ হল বর্ণের সমন্বয়।[৩২]

এখানে আমরা ন্যায় দর্শনের সঙ্গে অমিল লক্ষ্য করি। কারণ ন্যায় দর্শনে শব্দকে গুণ পদার্থ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। শব্দকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। সেখানে আপ্তব্যাক্তির উপদেশকে শব্দ বলা হয়েছে।[৩৩] ।

শব্দকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন—দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ, সত্য ও অনৃত।[৩৪] ন্যায় দর্শনের সঙ্গে চরকসংহিতা এই বিষয়ে মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ ন্যায় দর্শনে দুই প্রকার শব্দের কথা স্বীকার করা হয়েছে—দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টার্থ।[৩৫] শব্দ প্রমাণ বলতে আপ্ত ব্যক্তির উপদেশকেই বোঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ তা তত্ত্বজ্ঞানেরই জনক যা শাব্দ বোধ নামে পরিচিত। আপ্ত হতে গেলে বক্তার যে যে গুণবিশিষ্ট হওয়া দরকার বলে বাৎস্যায়ন নির্দিষ্ট করেছেন তার দ্বারা যে শব্দ প্রমাণ নয় তার থেকে শব্দ প্রমাণকে পৃথক করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ:

আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সকলের পরস্পরের সন্নিকর্ষের ফলে যে নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান জন্মায় তাকে প্রত্যক্ষ বলা হয়।[৩৬] চরকসংহিতার বিমান স্থানে প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে আত্মার মনের মাধ্যমে এবং ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে যে উপলব্ধি তাকেই প্রত্যক্ষ বলা হয়।[৩৭]

আত্মা নিজের দ্বারা বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে উপলব্ধি করে, সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি বা জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলা হয়। কেবলমাত্র আত্মার দ্বারা সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি যে প্রত্যক্ষ গুলি হয় তাকে আত্মার প্রত্যক্ষ এবং ইন্দ্রিয় গুলির সাহায্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি যে প্রত্যক্ষ গুলি হয় তাকে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বলা হয়। চরকসংহিতায় প্রত্যক্ষকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিছু প্রত্যক্ষকে আত্মার প্রত্যক্ষ বলা হয়েছে এবং কিছু প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বলা হয়েছে।[৩৮] চরকসংহিতায় মনের প্রত্যক্ষের কথা স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু টীকাকার চক্রপাণি দত্ত প্রত্যক্ষের বিভাগ প্রসঙ্গে বাহ্যপ্রত্যক্ষ ও মানসপ্রত্যক্ষ এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। মনের দ্বারা সুখ, দুঃখ প্রভৃতির মানস প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য প্রত্যক্ষ হয়।[৩৯]

অনুমান:

চরকসংহিতায় অনুমান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যুক্তি দ্বারা উপস্থাপিত তর্ককেই অনুমান বলা হয়েছে।[৪০] সুশ্রুতসংহিতার অনুমানের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে অণু অর্থাৎ পশ্চাৎ অব্যাভিচারী লিঙ্গলিঙ্গীর জ্ঞান হয় যার দ্বারা তাকে অনুমান বলা হয়। প্রশ্ন হয় কার পশ্চাৎ জ্ঞান? উত্তরে বলা হয় প্রত্যক্ষের পশ্চাৎ। যে বিষয়টি প্রত্যক্ষ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যে জ্ঞান পরবর্তীকালে হয় তাকেই অনুমান বলা হয়। এই কারণে চরকসংহিতায় অনুমানের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'প্রত্যক্ষপূর্বম্।'[৪১]

চরকসংহিতায় কালভেদে অনুমানকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ।[৪২]

ঐতিহ্য:

পদার্থের উপলব্ধি কোন কোন প্রমাণের সাহায্যে হয়ে থাকে তা বলতে গিয়ে চরকসংহিতার বিমান স্থানে ঐতিহ্যর কথা স্বীকার করেছেন। ঐতিহ্য বলতে বেদ প্রভৃতি আপ্তোপদেশকেই স্বীকার করা হয়েছে। আপ্তোপদেশের লক্ষণ প্রসঙ্গে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে যাদের জ্ঞান তপশ্চর্য্যার দ্বারা রজগুণ ও তমোগুণ থেকে বিমুক্ত, যারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষৎ বিষয়ে বিশদভাবে জানতে পারেন, সব সময়ে সকল বিষয়ে যাদের জ্ঞান ব্যাহত হয় না তাদের আপ্ত ব্যক্তি বলা হয়। তাই এদের বাক্যে কোন রকমের সংশয় থাকে না। তারা রজ ও তম গুণের দ্বারা প্রভাবিত

হয় না, কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। এই সকল আপ্ত পুরুষের বাক্যকে আপ্তোপদেশ বলা হয়েছে।[৪৩] টীকার চক্রপাণি দত্ত একমাত্র অলৌকিক আপ্তোপদেশকেই ঐতিহ্য পদের দ্বারা গ্রহণ করেছেন।

ঔপম্য:

কোন কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য দ্বারা অন্য বিষয়ের জ্ঞান লাভকে ঔপম্য বলা হয়েছে। যেমন দণ্ডের সাদৃশ্য দেখে দণ্ডকের জ্ঞান, ধনুর সাদৃশ্য দেখে ধনু স্তম্ভের জ্ঞান এবং বাণ ক্ষেপীর সাদৃশ্যবশতঃ চিকিৎসকের জ্ঞান হয়।[৪৪]

সংশয়:

কোন বিষয় নির্ণয়ের যে অনিশ্চয়তা দেখা যায় তাকে সংশয় বলা হয়। যেমন— কোন ব্যক্তির দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার সমস্ত লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও যদি সেই ব্যক্তি বেশীদিন বেঁচে না থাকেন, আবার কোন একজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার কোন লক্ষণ না থাকা বা যথাযথ ভাবে চিকিৎসা না করেও যদি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে তাহলে সংশয় উৎপন্ন হয় যে অকাল মৃত্যু আছে কি নেই।[৪৫]

ন্যায় দর্শনের মতে—সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য, অসাধারণধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞান জন্য, অর্থাৎ কোন একটি পদার্থে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের যে জ্ঞান, তাকে সংশয় বলা হয়।[৪৬]

প্রয়োজন :

যে ফল লাভ করার জন্য কোন কাজ আরম্ভ করা হয় তাকে সেই কাজের প্রয়োজন বলা হয়। যেমন—আয়ুর হিতকর সকল দ্রব্য সেবন করলে এবং আয়ুর অহিতকর সকল বিষয়কে পরিত্যাগ করলে আর অকাল মৃত্যু হবে না এখানে সেই অকাল মৃত্যুর নিবারণকেই প্রয়োজন বলা হয়।[৪৭] ন্যায় মতে যাকে প্রাপ্য বা ত্যাজ্য রূপে নিশ্চয় করে জীব সেটা প্রাপ্তি বা ত্যাগে প্রবৃত্ত হয় তাকে প্রয়োজন বলে।[৪৮]

সব্যভিচার:

ব্যভিচার অর্থাৎ যা কোথাও সিদ্ধ হয় এবং কোথাও সিদ্ধ হয় না তাকে সব্যভিচার বলা হয়েছে। যেমন এই ওষুধ এই রোগের উপযুক্ত হবে অথবা উপযুক্ত হবে না।[৪৯] ন্যায় দর্শনে সব্যভিচার হেত্বাভামরূপে গণ্য হয়েছে। অতএব চরকসংহিতার সঙ্গে ন্যায় দর্শনে সব্যভিচার বিষয় মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

জিজ্ঞাসা :

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কোন বিষয়কে পরীক্ষা করে দেখার আগ্রহকে জিজ্ঞাসা বলা হয়। জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ হল কোন কিছু জানার ইচ্ছা। এই জিজ্ঞাসাই প্রমাণ প্রভৃতির সাহায্যে পরীক্ষা করে জানার ইচ্ছার উদ্রেক করে এবং সেই ইচ্ছাকে তৃপ্ত করে।[৫০]

ব্যবসায় :

নিশ্চয়কে ব্যবসায় বলা হয়। চরকসংহিতায় রোগের দৃষ্টান্ত দিয়ে একে ব্যাখ্যার চেষ্টা

করা হয়েছে। যেমন বায়ু ঘটিত এই রোগ এবং এটাই এর ঔষধ, এই রকম নিশ্চয়কে ব্যবসায় বলা হয়।[৫১]

অর্থপ্রাপ্তি:

চরকসংহিতায় অর্থপ্রাপ্তিকে পৃথক পদার্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে এক বিষয়ের উক্তির সাহায্যে অপর অনুক্ত বিষয়ের সিদ্ধ হয় তাকে অর্থপ্রাপ্তি বলে। যেমন—"এই রোগ সন্তর্পণসাধ্য নয়।" এই উক্তির সাহায্যে যে অর্থের প্রাপ্তি হবে তা হল—"এই ব্যাধি অপতর্পণের দ্বারা সাধ্য।"[৫২] একইভাবে যদি কেউ বলে যে এই ব্যক্তির দিনেরবেলায় ভোজন করা কর্তব্য নয় তাহলে এর সাহায্যে এই অর্থপ্রাপ্তি হয় যে—"তার রাত্রিভোজন কর্তব্য।"

সম্ভব:

চরকসংহিতায় বলা হয়েছে যে, যে বস্তু যার থেকে উদ্ভূত হয় তাকে সম্ভব বলা হয়। যেমন—ষড় ধাতুর সম্মূর্চ্ছন থেকে গর্ভের সম্ভাবনা তেমনি অহিত আহার বিহার থেকে ব্যধির এবং হিত আহার বিহার দ্বারা আরোগ্যের সম্ভাবনাও দেখা যায়।[৫৩]

অনুযোজ্য:

যে বাক্য বাক্যদোষ যুক্ত তাকে অনুযোজ্য বলা হয়। অর্থাৎ কোন বিষয় সাধারণ ভাবে বলে তাতে বিশেষ অর্থ গ্রহণের জন্য যদি অন্য বাক্য বলা হয় তাকে

অনুযোজ্য বলে। যেমন বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম সাধ্য, সংশোধন প্রক্রিয়ার দ্বারা সাধ্য এই রোগ একথা বললে সেখানে যদি অনুযোগ করা হয় তাহলে এই রোগটি কেবলমাত্র বমনসাধ্য অথবা কেবলমাত্র বিরেচনসাধ্য এমন বলাকে অনুযোজ্য বলা হয়।[৫৪]

অননুযোজ্য :

অনুযোজ্যের বিপরীত বাক্যকেই অননুযোজ্য বলা হয়।[৫৫]

অনুযোগ:

পণ্ডিতগণ যখন পরস্পর জ্ঞান-বিজ্ঞান বচন, প্রতিবচন ও পরীক্ষা করার জন্য শাস্ত্রের কোন একটি অংশে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাকে অনুযোগ বলা হয়। যেমন— ধরা যাক কোন বক্তা বললেন 'পুরুষ নিত্য'। এই প্রতিজ্ঞা বাক্য শুনে অন্য কেউ যদি প্রশ্ন করে পুরুষ নিত্য তার হেতু কি? তাহলে তাকে অনুযোগ বলা হয়।[৫৬]

প্রত্যনুযোগ:

অনুযোগের উত্তরে অনুযোগ করাকে প্রত্যনুযোগ বলা হয়। যেমন কারোর যদি এটা অনুযোগ হয় যে "পুরুষ নিত্য তার হেতু কি?" এরপর ঘুরিয়ে প্রশ্ন কর্তাকে প্রশ্ন করা হল—"তোমার এই অনুযোগের হেতু কি?" তাহলে এটা হচ্ছে প্রত্যনুযোগ।[৫৭]

বাক্য দোষ:

ন্যূন, অধিক, অনর্থক, অপার্থক এবং বিরুদ্ধ এদেরকে বাক্যদোষ বলা হয়। বাক্যের

মধ্যে এই সকল দোষ না থাকলে বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ প্রতিপাদানের ক্ষমতা নষ্ট হয় না।[৫৮] সুতরাং কোনও বাক্যকে প্রশংসিত হতে গেলে তাকে বাক্য দোষ মুক্ত হতে হবে।

ন্যূন: বাক্যে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন এদের যেকোন একটির ন্যূনতা ঘটলে বা এদের কোন একটির উল্লেখ না করলে বাক্যটি ন্যূন বলে গন্য হবে। যেমন বহু হেতুর দ্বারা উপদিষ্ট যে বাক্য যদি সেই বাক্য কেবলমাত্র একটি হেতুর দ্বারা প্রতিপাদন করা হয় তাহলে তাকে ন্যূন বলা হয়।[৫৯] দ্বিতীয় যে পরিস্থিতিতে ন্যূন নামক বাক্য দোষের উদ্ভব হয় যেমন—ধরা যাক বহুহেতুর দ্বারা কোন পক্ষ স্থাপিত হতে পারে। কিন্তু বস্তুত পক্ষে সেই স্থাপনার্থে একটি হেতুর উপস্থাপনা করা হলে এই স্থলেও কিন্তু ন্যূন নামক বাক্য দোষের উদ্ভব হবে।[৬০]

চরকসংহিতার মত ন্যায় দর্শনেও উক্ত মতের মিল লক্ষ্য করা যায় কারণ আমরা দেখি ন্যায়সূত্রেও বলা হয়েছে অবয়বগুলির মধ্যে যেকোন একটি অবয়ব প্রযুক্ত না হয় তাহলে তাকে নূন্য বলা হয়।[৬১] সুতরাং ন্যায় দর্শনে যা ন্যূন নামে পরিচিত তার সঙ্গে চরকসম্মত ন্যূনের মিল ও অমিল উভয়ই বর্তমান।

অধিক: ন্যূন বাক্যের বিপরীত বাক্যকে অধিকবাক্য বলা হয়। আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে যদি কেউ কোন মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোন অপ্রাসঙ্গির মতের উত্থাপন করে তাহলে তাকে অধিক বলা হয়। ন্যায় দর্শনে তা অর্থান্তর নামে

পরিচিত। কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়ও যদি কেউ দুবার উল্লেখ করে থাকে, সেই পুনরুক্তিকেও অধিক বলা হয়। একাধিক প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের প্রয়োগ জন্য অধিক নামক বাক্য দোষের উদ্ভব হয়। যে বিষয়ে আলোচনা চলছে সেই বিষয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ বিষয়ের অবতারণা করলে অধিকনামক বাক্য দোষের উদ্ভব ঘটে। যেমন চরকের মতে আয়ুর্বেদের আলোচনা করতে করতে কেউ যদি বার্হস্পত্য, ঔশনস প্রসঙ্গ অবতারণা করে তবে অধিক নামক বাক্য দোষের উদ্ভব ঘটে। অধিককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থের পুনরুক্তি এবং শব্দের পুনরুক্তি, অর্থের পুনরুক্তি হল—কেউ যদি একটি বাক্য মধ্যে ভেষজ, ঔষধ, সাধন ইত্যাদি একই অর্থর সূচক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার এই সাথে করে তাহল অর্থের পুনরুক্তি বলে। আবার কেউ যদি ভেষজ, ভেষজ ইত্যাদি একই শব্দ বারবার বলে তাহলে তাকে শব্দের পুনরুক্তি বলে।[৬২] পুনরুক্ত ন্যায় দর্শনে অতিরিক্ত নিগ্রহস্থান রূপে পরিচিত।

ন্যায় দর্শনেও আমরা অধিক নামক বাক্য দোষের কথা পেয়ে থাকি। ন্যায় সূত্রে বলা হয়েছে যে হেতু অথবা উদাহরণ অধিকবার বলা হয় তাকে অধিক বলা হয়।[৬৩] কিন্তু চরক পুনরুক্তি দোষকেও অধিকের জনক বলে মনে করেছেন।

অনর্থক : যে বাক্য কেবলমাত্র পঞ্চবর্ণের মত অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি মাত্র কিন্তু কোন অর্থের গ্রাহক নয় তাকে অনর্থক বাক্য বলা হয়। যেমন অর্থহীন বর্ণসমূহ।[৬৪] ন্যায়দর্শনেও কোনও বিশিষ্ট অর্থের উপস্থাপনে ব্যর্থ উক্তিকে অনর্থক বলা হয়েছে।

অপার্থক: যখন কোন বাক্যের ঘটক পদ গুলি পৃথক ভাবে অর্থবিশিষ্ট হলেও পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ যুক্ত নয়, অর্থাৎ তারা মিলিতভাবে কোন অর্থ প্রতিপাদনে ব্যর্থ তখন তাকে অপার্থক বলা হয়। যেমন—তক্র চক্র, বংশ ইত্যাদি।[৬৫]

বিরুদ্ধ : যে বাক্য দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত ও সময়ের বিরোধী তাকে বিরুদ্ধ বলা হয়। আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রসম্মত ও মোক্ষ শাস্ত্রসম্মত এই শাস্ত্রীয় রীতির বিপরীত কথা বলাকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলা হয়েছে।[৬৬]

চরকসংহিতার বিরুদ্ধকে বাক্যদোষের অংশ হিসাবে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু ন্যায় সূত্রে সব্যভিচারের মত বিরুদ্ধকেও হেত্বাভাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিরুদ্ধ প্রসঙ্গে ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে যে হেতুকে স্বীকার করলে সিদ্ধান্তে যাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই তার বিপরীত বিষয় সিদ্ধান্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাকে বিরুদ্ধ বলা হয়। ন্যায় দর্শনে হেত্বাভাস নিগ্রহ স্থানের অন্তর্গত।[৬৭]

'বিরুদ্ধ' নামক বাক্যদোষের আলোচনা করতে গিয়ে চরক উদাহরণের সাহায্যে দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ, সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ এবং সময় বিরুদ্ধ এই তিন প্রকার বিরুদ্ধ বাক্যদোষের উল্লেখ করেছেন।

দৃষ্টান্তের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। যে বিষয়ে সাধারণলোক ও পণ্ডিত উভয়ের বুদ্ধিসাম্য আছে, তাকে বলা হয় দৃষ্টান্ত। যার উদ্দেশ্যে বক্তব্য উপস্থাপিত হচ্ছে এবং যে বক্তব্য উপস্থাপনা করছে উভয়েই যে বিষয়ে একমত

তাই দৃষ্টান্ত। যেমন, ধরা যাক কেউ বললেন যে পর্বতে বহ্নি আছে, যেহেতু তাতে ধুম আছে যেমন, মহানস। বক্তব্য হচ্ছে মহানসে ধুম আছে বলে বহ্নি আছে, তেমনি পর্বতেও। সুতরাং কোনও বিষয়ে বক্তা শ্রোতার বোধ উৎপাদন করতে আগ্রহী। কিন্তু সেই বিষয়টি তিনি বোঝাতে চাইছেন অন্য বিষয়ের সাহায্যে, যে বিষয়টি বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েরই জ্ঞাত। উক্ত স্থলে মহানস হচ্ছে দৃষ্টান্ত। ন্যায় দর্শনে দৃষ্টান্ত ব্যাপ্তি গ্রহের স্থলরূপে স্বীকৃত।

মহর্ষি গৌতম-স্বীকৃত 'নির্ণয়' পদার্থের সঙ্গে চরক-স্বীকৃত 'সিদ্ধান্ত' পদার্থের সাদৃশ্য বর্তমান। কারণ ন্যায়সূত্রকার গৌতমের মতে, সংশয় পূর্বক সাধক বাধক যুক্তি পর্যালোচনা জন্য এই পদার্থ এই প্রকারই এরূপ যে নিশ্চয় তাই নির্ণয়। চরক বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত স্বীকার করেছেন।

দৃষ্টান্ত-বিরুদ্ধ বাক্যদোষের উদাহরণ-স্বরূপ মহর্ষি চরক বলেছেন যে, কেউ যদি বলেন যে ঠান্ডা জল যেমন উত্তাপের জনক, তেমনি জ্বরও। এখানে তিনি দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করেছেন ঠান্ডা জলকে। কিন্তু ঠান্ডা জল উত্তাপের জনক এই বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের ভিত্তিতে কোনও বিষয় প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এর দ্বারা চরক হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোনও ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপিত হলে তা অভিপ্রেত অর্থ প্রতিপাদন করতে পারে না। মহাবাক্যের অন্তর্গত খণ্ড বাক্যদ্বয়ের মধ্যেও পরস্পর বিরোধিতা থাকলে তারা মিলিত ভাবে কোনও অর্থের প্রতিপাদক হতে পারবে না।

কোনও শাস্ত্রে বিশেষ সিদ্ধান্ত স্বীকৃত সেই সিদ্ধান্তের বিরোধী বক্তব্য যদি সেই সম্প্রদায়ের কোনও মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে উপস্থাপন করা হয়, তবে বিরুদ্ধ বাক্যদোষ হবে। যেমন, যদি কেউ বলে যে মধুর, অম্ল এবং লবণ রস কফের হ্রাস ঘটায়, কটু, তিক্ত ও কষায় রস বাতের হ্রাস ঘটায়, তাহলে তা অবশ্যই আয়ুর্বেদের রস-দোষ সম্বন্ধে স্বীকৃত মূল সিদ্ধান্তের বিরোধী হবে।

'সময়' বলতে বোঝায় অনুশাসন, নিয়ম, যা পরম্পরায় স্বীকৃত হয়ে আসছে তাকে। সাধারণ জীবের প্রতি করুণাবান হয়ে প্রাচীন মুনিঋষিরা যে সমস্ত নিয়ম-অনুশাসনের কথা বলে গেছেন, তাদের বিরোধিতা করে বাক্য প্রয়োগ করলে চরকের মতে সময় বিরুদ্ধ বাক্যদোষের উদ্ভব হয়। আমরা বিভিন্ন স্থলে চরকের এই মতের সাক্ষাৎ পেয়েছি যে এই অনুশাসন বা নিয়ম গুলি মুনিঋষিদের আদেশ গুলি যথাসম্ভব মেনে চলা উচিত, তাদের লঙ্ঘন করা উচিত নয়। চরক ত্রিবিধ সময়ের কথা বলেছেন আয়ুর্বেদিক সময়, যাজ্ঞিক সময়, মোক্ষশাস্ত্রিক সময়। আয়ুর্বেদিক সময়ের উদাহরণ রূপে 'চতুষ্পাদ ভেষজ' এর উল্লেখ করা হয়েছে। 'যজমান কর্তৃক পশু মারণীয়' উল্লিখিত হয়েছে যাজ্ঞিক সময়ের উদাহরণরূপে। 'সর্বজীবে অহিংসা' চরক কর্তৃক মোক্ষশাস্ত্রিক সময়ের উদাহরণ। কোনও বাক্য যদি প্রাচীন ঋষি প্রমুখ স্বীকৃত কোনও নিয়ম বা বিধিনিষেধের বিরোধিতা করে অর্থাৎ প্রচলিত নিয়ম ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয় তাহলে সময় বিরুদ্ধ বাক্যদোষের উদ্ভব হয়।

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে চরকের মতে বাক্য উপরিউক্ত দোষ গুলি থেকে মুক্ত না হলে তাকে প্রশংসিত বাক্য বলা যাবে না।

এখন এই বাক্যদোষ গুলির স্বরূপ পর্যালোচনার পরে আমরা অনুসন্ধানের চেষ্টা করব যে কেন এদের 'বাক্যদোষ' বলা হবে। এই দোষগুলির প্রকৃত উৎস কী? প্রত্যেকটি বাক্যদোষকে পৃথকভাবে আলোচনা করে দেখা যাক। ধরা যাক, 'ন্যূন' নামক বাক্যদোষ স্থলে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যের অন্তর্গত কোনওটি প্রযুক্ত হয়নি। মহাবাক্যের অন্তর্গত খণ্ড বাক্যগুলির প্রত্যেকটিই একটি অপরটির ছাড়া অভিপ্রেত অর্থ প্রতিপালন করতে পারে না। বস্তুত পাঁচটি বাক্যের প্রত্যেকটিই হয় এমন আকাঙ্ক্ষার উত্থাপক যা নিবৃত্ত হয়েছে পরবর্তী বাক্য দ্বারা অথবা তা এমন আকাঙ্ক্ষার নিবর্তক যার উত্থাপক হচ্ছে পূর্ববর্তী বাক্যটি এমন স্থলে যে কোনও একটি বাক্য প্রয়োগ না করার অর্থ যার জন্য অপেক্ষা রয়েছে, আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তাকে প্রয়োগ না করা। ঠিক সেইভাবেই পূর্বচুক্তি অনুসারে কোনও পক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত হেতুর প্রয়োগের পরিবর্তে যদি কোনও হেতু বিশেষ প্রযুক্ত হয়, তবে যার জন্য আকাঙ্ক্ষা বর্তমান তার প্রয়োগ হচ্ছে না। যে স্থলে একাধিক প্রতিজ্ঞাদি বাক্য প্রয়োগ জন্য 'অধিক' নামক বাক্যদোষ উৎপন্ন হয় সে স্থলে যার জন্য আকাঙ্ক্ষা নেই, তা প্রযুক্ত হওয়াতেই 'অধিক' নামক দোষের উদ্ভব হয়েছে। যে ক্ষেত্রে মূল আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বিষয়ের অবতারণা করার দরুণ অধিক দোষের আপত্তি হচ্ছে, সে স্থলেও যা অনাকাঙ্ক্ষিত তার প্রয়োগ হওয়ায় 'অধিক' নামক

দোষের সূচনা হচ্ছে। পুনরুক্তির দরুণ যে স্থলে 'অধিক' নামক দোষের উদ্ভব হচ্ছে সেস্থলেও প্রকৃতপক্ষে দূষকতা বীজ বর্তমান রয়েছে যা অনাকাঙ্ক্ষিত তার প্রয়োগের মধ্যে।[৬৮]

অনর্থক স্থলে এমন বিষয় উপস্থাপিত হচ্ছে যা অর্থ বহন করে না, যা অর্থের সূচনা করতে ব্যর্থ। বক্তব্যের উপস্থাপনা করতে গিয়ে ধরা যাক এমন শব্দ বা শব্দসমূহ প্রযুক্ত হল যা কোনও অর্থের সূচক নয়, সেক্ষেত্রে উক্ত অন্যান্য অংশের সঙ্গে তার কোনও অর্থপূর্ণ সম্পর্ক থাকা সম্ভবই নয়। অর্থাৎ অন্য অঙ্গের সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সম্পর্ক থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সেই কারণেই তাদের মিলিত ভাবে কোনও অর্থের প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। অপার্থক স্থলে বাক্যের অংশগুলি পৃথক ভাবে অর্থবাহক হলেও তারা মিলিতভাবে কোনও অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। বিভিন্ন কারণে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। যেমন ধরা যাক যে পদদ্বয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট অর্থে আকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধ আছে তাদের এতই ব্যবধানে প্রয়োগ করা হতে পারে যার ফলে তারা মিলিতভাবে কোনও অর্থ প্রতিপাদনে ব্যর্থ হতে পারে। এমন হতেই পারে যে এমন পদদ্বয় সন্নিহিত ভাবে উপস্থাপনা করা হল যাদের মধ্যে কোনও আকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধ নেই। এক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষার শর্ত লঙ্ঘিত হল। যদি পদদ্বয় ভিন্ন ভিন্নভাবে অর্থবহ হওয়া সত্ত্বেও তাদের দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থ পরস্পর-বিরুদ্ধ হলে তারা মিলিতভাবে কোনও অর্থ প্রতিপাদনে ব্যর্থ হবে। কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে যোগ্যতার অভাব। এভাবে মহাবাক্যের ঘটক খণ্ডবাক্যগুলিও

অনাসন্ন, অনাকাঙ্ক্ষও অযোগ্য হলে কোনও বিশিষ্ট অর্থ প্রতিপাদন করতে ব্যর্থ হতে পারে।[৬৯]

সুতরাং অপার্থককে অনাকাঙ্ক্ষ, অনাসন্ন, অযোগ্য এই কয়েক প্রকারেরই বলতে পারি অবশ্যই যথাক্রমে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতার শর্ত লঙ্ঘিত হওয়ার জন্য। 'বিরুদ্ধ' নামক বাক্যদোষ স্থলে দৃষ্টান্ত বিরোধ, সিদ্ধান্ত বিরোধ, স্থলে পরিষ্কারভাবেই যোগ্যতার শর্ত লঙ্ঘিত হয় কোনও না কোনও অর্থে। সময় বিরুদ্ধ স্থলেও লোকব্যবহার, পরম্পরায় স্বীকৃত পক্ষের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তাকেও আমরা একপ্রকার যোগ্যতার লঙ্ঘন স্থল বলেই মনে করতে পারি।[৭০]

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অত্যন্ত সাধারণ ভাবে বলতে গেলে একটি পদ পদান্তরের অভাববশত যদি অন্বয়ানুভবের জনক না হয় তবে পদদ্বয়ের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আছে বলে স্বীকার করতে হবে। পদগুলি অযথা বিলম্ব না করে যথোচিত রীতিতে উচ্চারিত হলে তাদের আসত্তি বা সন্নিধি আছে বলে বুঝতে হবে। বাক্যস্থ পদগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক না হয়, অন্বয়যোগ্য অর্থের প্রতিপাদক হয় তবে তাদের মধ্যে যোগাত্য আছে বলে বুঝতে হবে।

উপরি উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে বাক্যদোষগুলি 'বাক্যদোষ' হওয়ার পশ্চাতে যে কারণ বর্তমান তা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা,আসত্তি ও যোগ্যতার শর্তগুলির মধ্যে কোনও না কোনওটি লঙ্ঘিত হওয়া।[৭১]

বাক্য প্রশংসা :

বক্তব্য বিষয়ে নূন্য নয়, অধিকও নয় অর্থবিশিষ্ট এবং অপার্থক নয় অবিরুদ্ধ ও অধিগত পদার্থ বিশিষ্ট এরূপ বাক্যকে বাক্য প্রশংসা বলা হয়। এই বাক্য প্রশস্ত বাক্য বলে এটি অনুযোজ্য নয়।

ছল :

চাতূরীপূর্ণভাবে অর্থের বিকৃতি করে বাক্য প্রতিপাদিত বস্তুটি অর্থহীন এটা প্রতিপাদ করাকেই ছল বলা হয়।[৭২] ছল বিষয়ক আলোচনায় আমরা চরকসংহিতার সঙ্গে ন্যায় দর্শনের মিল লক্ষ্য করতে পারি কারণ ন্যায় দর্শনেও বলা হয়েছে বাদীর অভিমত শব্দার্থ ও বাক্যার্থ থেকে ভিন্ন অর্থের কল্পনা করে বাদীর বচন বিঘাতক যে বাক্য তার নাম হল ছল।[৭৩]

ছলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—বাক্ ছল এবং সামান্য ছল। বিভাগ বিষয়ে ন্যায় দর্শনের সাথে অমিল লক্ষ্য করা যায় কারণ ন্যায় দর্শনে তিন প্রকার ছলের কথা স্বীকার করা হয়েছে বাক্ ছল, সামান্য ছল ও উপচার ছল। চরকসংহিতায় দুই প্রকার ছলের কথা স্বীকার করা হয়েছে বাক্ছল এবং সামান্যছল।[৭৪]

অহেতু :

যে হেতুর দ্বারা উপস্থাপ্য বিষয়ের সাধন করা যায় না সেই হেতুকে অহেতু বলা হয়। অহেতু তিন প্রকার—প্রকরণসম্ সংশয়সম ও বর্ণ্যসম। চক্রপাণি দত্ত অসাধকহেতু কে অহেতু বলেছে।[৭৫]

ন্যায় দর্শনেও অহেতুর কথা স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু অহেতুকে বাৎস্যায়নভাষ্যে হেত্বাভাস বলা হয়েছে। যা হেতু মত প্রতীত হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেতু নয় তাকে হেত্বাভাস বলা হয়। পঞ্চবিধ হেত্বাভাস স্বীকার করা হয়েছে ন্যায় দর্শনে।

প্রকরণসম : প্রকরণসম অহেতু প্রসঙ্গে আচার্য চক্রপাণি দত্ত বলেছেন পক্ষ এবং হেতু যদি সমান হয় তাহলে সেই হেতু হবে প্রকরণসম অহেতু। কারণ পক্ষ এবং হেতু এক হতে পারে না। যেমন বাদী বলেন—আত্মা শরীর থেকে ভিন্ন এবং নিত্য, এর উত্তরে প্রতিবাদী বলেন যেহেতু শরীর থেকে আত্মা ভিন্ন সেই কারণে নিত্য, কারণ শরীর হচ্ছে অনিত্য পদার্থ।[৭৬]

সংশয়সম : যা সংশয়ের হেতু তাকে যদি সংশয় বিনাশের হেতুরূপে দেখানো হয় তাহলে তাকে সংশয়সম হেতু বলা হয়। যেমন কোন ব্যক্তি আয়ুর্বেদশাস্ত্র থেকে একটি অংশ বললেন, এখানে সংশয় দেখা দিল যে তিনি চিকিৎসক কিনা? কেউ মনে করতে পারে যে সেই ব্যক্তি আয়ুর্বেদের অংশ জানেন তাই তিনি চিকিৎসক। আবার কেউ সংশয় করতে পারেন যে তিনিতো কেবলমাত্র একটি অংশ সম্পর্কে বলেছেন তাহলো তিনি কি সত্যিই চিকিৎসক? এখানে যে হেতুটা সংশয় উৎপন্ন করছে সেই হেতু টাই সংশয় বিনাশও করছে। অতএব এই হেতুকে সংশয়সম অহেতু বলা হয় তা প্রকৃত পক্ষে হেতু নয়।[৭৭]

বর্ণ্যসম : যে হেতুর বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে কোন বিশেষত্ব নেই তাকে বর্ণ্যসম অহেতু বলা হয়। যেমন কেউ বলতে পারেন অস্পর্শ হেতু জন্য বুদ্ধি অনিত্য, শব্দকে স্পর্শ করা যায় না বলে শব্দও অনিত্য। এর থেকে বোঝা যায় শব্দ ও বুদ্ধি উভয়েই অনিত্য। কিন্তু উভয় বিষয়ে মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই বলে একে বর্ণ্যসম অহেতু বলা হল।[৭৮]

অতীতকাল:

যা আগে বলা উচিত ছিল কিন্তু বলা হয়নি, যদি তা পরে বলা হয় তাহলে তাকে অতীতকাল বলে। কাল অতীত হয়ে গেল এই বাক্য গ্রাহ্য হয় না।[৭৯]

উপালম্ভঃ

হেতুর দোষ প্রদর্শন করাকে উপালম্ভ বলা হয়। যেমন অহেতুগুলিকে হেত্বাভাস রূপে ব্যাখ্যা করা।[৮০]

পরিহার :

পূর্বে যে সকল দোষের কথা বলা হয়েছে সেই সকল দোষ উদ্ধারকে পরিহার বলা হয়েছে। যেমন—শরীরের মধ্যে আত্মা থাকলে জীবের লক্ষণ সমূহ যে নিত্য, তার উপলব্ধি হয়ে থাকে এবং আত্মা শরীর থেকে চলে গেলে সেই লক্ষণ গুলির উপলব্ধি হবে না। অতএব বলা যায় আত্মা শরীর থেকে ভিন্ন ও নিত্য পদার্থ।[৮১] আচার্য গঙ্গাধর তার গল্পজল্পতরু টীকায় উপালম্ভ পরিহারকে জাতি বলে উল্লেখ করেছেন।[৮২]

প্রতিজ্ঞাহানি :

প্রতিজ্ঞাস্থাপন না করতে পেরে যদি পূর্বে গৃহীত প্রতিজ্ঞার পরিত্যাগ করা হয় তাহলে তাকে প্রতিজ্ঞাহানি বলা হয়। যেমন—ধরা যাক প্রতিজ্ঞা বাক্য 'পুরুষ নিত্য' কিন্তু পুরুষের নিত্যত্ব স্থাপন করতে না পেরে যদি প্রথমে 'পুরুষ অনিত্য' এমন বলা হয় তাহলে আগের প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করা হল একে প্রতিজ্ঞাহানি বলা হয়।[৮৩]

অভ্যনুজ্ঞা :

স্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ইষ্ট হলেও, অপর ব্যক্তির সাহায্যে দোষ প্রদর্শিত করা হলে যদি ইষ্টকে অনিষ্টরূপে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে অভ্যনুজ্ঞা বলা হয়।[৮৪]

হেত্বন্তর :

প্রকৃত হেতুর পরিবর্তে যদি বিকৃত হেতু প্রদর্শন করা হয় তাহলে তাকে হেত্বন্তর বলা হয়। [৮৫] কিন্তু ন্যায় দর্শনে প্রযুক্ত হেতুর ভিন্ন হেতু প্রয়োগের স্থলে হেত্বন্তর নামক দোষ স্বীকার করা হয়েছে।

অর্থান্তর :

এক বিষয় বলতে গিয়ে যদি অন্য বিষয়ে কথা বলা হয় তাহলে তাকে অর্থান্তর বলা হয়। যেমন—স্বরের লক্ষণ বলতে গিয়ে প্রমেহের লক্ষণ বলা হয় তাহলে তাকে অর্থান্তর বলা হবে।[৮৬]

নিগ্রহস্থান :

শাস্ত্রলোচনা যে ধরণেরই হোক না কেন তাতে অংশগ্রহণকারী পুরুষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই অগ্রসর হন কখনো তিনি সে উদ্দেশ্য লাভে সফল হন কখন বা ব্যর্থ হন। বিশেষ উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হওয়া তার কাছে পরাজয়। নিগ্রহস্থান বলতে মহর্ষি চরক পরাজয় প্রাপ্তিকেই বুঝিয়েছেন। জল্পকল্পতরু টীকাকার গঙ্গাধর এর মতে এই পরাজয়ের হেতু বস্তুত নিগ্রহস্থান এই প্রসঙ্গে চক্রপাণি দত্ত বলেছেন নিগ্রহ বা পরাজয়ের কারণ হল নিগ্রহস্থান। যে যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সম্ভাষায় অংশগ্রহণকারী পুরুষের পরাজয় হয় তাকে নিগ্রহস্থান বলা হয়।[৮৭]

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে পদার্থগুলির বিষয় আলোচিত হল তারা সকলেই সম্ভাষার সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। আর চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসকের সম্ভাষার অংশগ্রহণ করা জ্ঞান লাভের উপায় রূপে উল্লিখিত হয়েছে। আয়ুর্বেদে বিষয়েই চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসকের আলোচনার কথা চরক বলেছেন। ন্যায় দর্শনের সঙ্গে কোনও কোনও অংশে এই পদার্থগুলির মিল থাকলেও পার্থক্যও লক্ষ্য করার মতন। কিন্তু নিগ্রহস্থানের আলোচনা ন্যায় দর্শনেও নিগ্রহস্থানের যে আলোচনা করা হয়েছে তা অনেক বেশী সুসংহত এবং বিস্তৃত। নিগ্রহস্থানের লক্ষণ প্রদানের পূর্বেই কতগুলি নিগ্রহস্থানের স্থলের উল্লেখ করা হয়েছে যদিও তাদের নিগ্রহস্থান বলে উল্লেখ করা হয়নি।

তথ্যসূত্রঃ

১. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকা সহ, ইংরাজী অনুবাদ, আর. কে. শর্মা ও ভগমান দাস, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০১৯, পৃ. ২৩২।

২. "তত্র বাদো নাম স যৎ পরেণ সহ শাস্ত্রপূর্বকং বিগৃহ্য কথয়তি স চ দ্বিবিধঃ সংগ্রহেণ জল্পো বিতন্ডা চ।" তদেব পৃ. ২৩৩।

৩. "প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহোবাদঃ।" ন্যায় সূত্র - ১.২.১।

৪. "বাদশব্দেন চেহ বিগৃহ্য পক্ষ প্রতিপক্ষ বচন মাত্রমুচ্যতে।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকা সহ টীকা এবং জেজ্জট বিরচিত নিরন্তর পদ ব্যাখ্যাসহ হরিদত্ত শাস্ত্রী সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, বোম্বে, মোতিলাল, বারাণসী, ১৯৪৬, পৃ. ১৫৬৫।

৫. "তত্র পক্ষাশ্রিতয়োর্বচনং জল্পঃ। ... স্বস্বপক্ষং স্থাপয়তঃ পরপক্ষমুদ্ভাবয়তঃ এষ জল্পঃ।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* পূর্বভাগ, শ্রীজয়দেব বিদ্যালঙ্কার, মোতিলাল বনারসী দাস, বারাণসী, ২০১৮, পৃ. ৩৫৭।

৬. ন্যাঃ সু ১.২.২।

৭. "জল্প বিপর্য্যয়ো বিতন্ডা।" *চরকসংহিতা,* মহর্ষি চরক, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪৪

৮. "সপ্রতিপক্ষ স্থাপনাহীনো বিতন্ডা।" ন্যায় সূত্র ১২.৩।

৯. "প্রতিজ্ঞা নাম সাধ্যবচনং, যথা—নিত্যঃ পুরুষ ইতি।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গানুবাদ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৪৪।

১০. ন্যায় সূত্র ১.১.৩৩।

১১. "স্থাপনা নাম তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়া হেতুদৃষ্টান্তোপনয়নিগমনৈঃ স্থাপনা। পূর্ব্বং হি প্রতিজ্ঞা, পশ্চাৎ স্থাপনা কিং হ্যপ্রতিজ্ঞাতং স্থাপয়িষ্যতি যথা—নিত্যঃ পুরুষ ইতি প্রতিজ্ঞা, হেতুরকৃতকত্বাদিতি, দৃষ্টান্তো যথাহহুকাশমিতি, উপনয়ো যথা চাকৃতকমাকাশং, তচ্চ নিত্যং, তথা পুরুষ ইতি, নিগমনং তস্মান্নিত্য ইতি।" তদেব, পৃ. ১৪৫।

১২. "অর্থ প্রতিস্থাপনা। প্রতিস্থাপনা নাম যা তস্যা এব পরপ্রতিজ্ঞায়া বিপরীতার্থস্থাপনা। যথা—অনিত্যঃ পুরুষ ইতি প্রতিজ্ঞা, হেতুরৈন্দ্রিয়কত্বাদিতি, দৃষ্টান্তো-যথা ঘট ইতি, উপনয়ো-যথা ঘট ঐন্দ্রিয়কঃ স চানিত্যস্তথা চায়মিতি, নিগমনং-ত স্মাদনিত্য ইতি।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* পূর্বভাগ, জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, মোতিলাল বনারসী দাস, বারাণসী, ২০১৮, পৃ. ৩৫৮।

১৩. "হেতুর্নামোলব্ধিকারণং, তৎ প্রত্যক্ষ-মনুমানম্
ঐতিহ্যমৌপম্যমিত্যেভির্হেতুভির্যদুপলভ্যতে তৎ তত্ত্বম্।" (তদেব)।

১৪. "সাধ্য সাধনা, হেতুঃ ন্যায়ম্।" ১.১.৩৪।

১৫. "লৌকিকানাং পন্ডিতানাঞ্চ যোহুর্থোহিবিবাদসিদ্ধঃ, স দৃষ্টান্তো ভবতি ন পন্ডিত-মাত্রসিদ্ধঃ।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং জেজ্জট বিরচিত নিরন্তর পদ ব্যাখ্যা সহ হরিদত্ত শাস্ত্রী সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মোতিলাল বনারসী দাস, বোম্বে, ১৯৪৬, পৃ. ১৫৮।

১৬. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* পূর্বভাগ, শ্রীজয়দেব বিদ্যালঙ্কার, মোতিলাল বনারসী দাস, বারাণসী, ২০১৮, পৃ. ৩৫৮।

১৭. "উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ।" ন্যায় সূত্র ১.১.৩৮।

১৮. "হেতুপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুণর্ব্বচর্নং নিগমনম্।" ন্যায় ১.১.৩৯।

১৯. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* সম্পাদিত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০৪, পৃ. ১৪৬।

২০. "সিদ্ধান্তো নাম স যঃ পরীক্ষকৈর্বহুবিধং পরীক্ষ্য হেতুভিশ্চ সাধয়িত্বা স্থাপ্যতে নির্ণয়ঃ৩।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* দ্বিতীয় খণ্ড, ইংরাজী অনুবাদ, আর. কে. শর্মা ও ভগমান দাস, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০১৮, পৃ. ৩৬

২১. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকা সহ নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও পরিশোধিত, বারাণসী, চৌখাম্বা, ওরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৮৬।

২২. "স চতুবিধঃ সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তোঅধিকরণসিদ্ধান্তোঅভ্যুপগম-সিদ্ধান্তশ্চেতি।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* পূর্বভাগ, জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, মোতিলাল বনারসীদাস, বারাণসী, ২০১৮, পৃ. ৩৫৮।

২৩. "স চতুর্বিধঃ সর্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ।" ন্যায় সূত্র ১.১.২৭।

২৪. "তত্র সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্তো নাম - তস্মিংস্তস্মিন্ সর্ব্বস্মিংস্তন্ত্রে তত্তৎ প্রসিদ্ধম্। যথা—সন্তি নিদানানি, সন্তি ব্যাধয়ঃ, সন্তি সিদ্ধ্যুপায়াঃ সাধ্যানামিতি।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকা সহ, ইংরাজী অনুবাদ আর. কে. শর্মা ও ভগবান দাস, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০১৮, পৃ. ২৩৬।

২৫. ন্যায় সূত্র ১.১.২৮।

২৬. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* পূর্বভাগ, জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, মোতিলাল, বনারসী দাস, বারাণসী, ২০১৮, পৃ. ৩৫৮।

২৭. “সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ।” ন্যায় সূত্র ১.১.২৯।

২৮. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* পূর্বভাগ, জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, মোতিলাল বনারসী দাস, বারাণসী, ২০১৮, পৃ. ৩৫৮।

২৯. ন্যায় সূত্র ১.১.৩০।

৩০. তদেব।

৩১. ন্যায় সূত্র ১.১.৩১।

৩২. “অর্থ শব্দ শব্দো নাম বর্ণসমান্মায়।” তদেব।

৩৩. ন্যায় সূত্র ১.১.৭।

৩৪. তদেব।

৩৫. ন্যায় সূত্র - ১.১.৮।

৩৬. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকাসহ, আর. কে. শর্মা ও ভগবান দাস, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০১৮, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১১।

৩৭. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬১।

৩৮. তদেব, পৃ. ২৩৮।

৩৯. “আত্মনেতি মনস, তেন, অনেন মানসপ্রত্যক্ষ সুখাদ্যমবরধ্যতে, ইন্দ্রিয়ৈশ্চেত্যনেন বাহ্যং প্রত্যক্ষং গৃহ্যতে।” মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণিকৃত, আয়ুর্বেদ দীপিকাসহ, যাদবজী ত্রিকামজী আচার্য সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, বারাণসী, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৮৪, পৃ. ১৬১৫।

৪০. “অনুমানং খলু তর্কোযুক্ত্যপেক্ষঃ।” মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকাসহ, আর. কে. শর্মা ও ভগবান দাস, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০১৮, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬১।

৪১. তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ.২১১।

৪২. তদেব।

৪৩. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকাসহ, প্রথম খণ্ড, ইংরাজী অনুবাদ, আর. কে. শর্মা ও ভগবান দাস, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০২০, পৃ. ২১০।

৪৪. তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

৪৫. তদেব।

৪৬. ন্যায় সূত্র ১.১.২৩।

৪৭. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত, আয়ুবেদদীপিকাসহ, দ্বিতীয় খণ্ড, আর. কে শর্মা ও ভগবান দাস, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০২০, পৃ. ২১০।

৪৮. "যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্তবতে তৎ প্রয়োজনম।" ন্যায় সূত্র ১.১.২৪।

৪৯. তদেব।

৫০. "অথ জিজ্ঞাসা নাম পরীক্ষা, যথা ভেষজপরীক্ষাত্তোরকালসুপদেক্ষ্যতে।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গানুবাদ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৪৯।

৫১. "অথ ব্যবসায় ব্যবসায়ো নাম নিশ্চয়, যথা বাতিক এবায়ং ব্যাধিরিদমেকস্য ভেষজঞ্চ।" তদেব।

৫২. তদেব।

৫৩. "অথ সম্ভবঃ সম্ভবো নাম যো যতঃ সংভবতি, স তস্য সম্ভব। যথা যড় ধাতবো গর্ভস্য, ব্যাধেয়হিতং হিতমারোগ্যম্যেতি।"

৫৪. তদেব, পৃ. ১৫০।

৫৫. তদেব।

৫৬. তদেব।

৫৭. তদেব।

৫৮. তদেব, পৃ. ১৫১।

৫৯. তদেব।

৬০. মহর্ষি চরক, চরকসংহিতা, কবিরাজ, ব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৫১।

৬১. ন্যায় সূত্র-৫.২.১২।

৬২. মহর্ষি চরক, চরকসংহিতা, চক্রপাণি দত্ত প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকাসহ, দ্বিতীয় খণ্ড, আর. কে. শর্মা ও ভগবান দাস, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০১৯, পৃ. ২৪২।

৬৩. “হেতুদাহরণাধিকমধিকয়।” ন্যায় সূত্র ৫.২.১৩।

৬৪. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫১

৬৫. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, চক্রপাণি দত্ত প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকাসহ, ইংরাজী অনুবাদ, আর. কে. শর্মা ও ভগবান দাস, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০১৯, পৃ. ২৪২।

৬৬. তদেব।

৬৭. ন্যায় সূত্র-১.২৬।

৬৮. শর্মা রত্না দত্ত, ‘চরক সম্মত শব্দপ্রমাণ’, ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব পরিক্রমা, সম্পাদনা রঞ্জনা মুখার্জী, সর্বানী বন্দ্যোপাধ্যায়, কুন্তলা ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৭১।

৬৯. তদেব।

৭০. তদেব।

৭১. তদেব।

৭২. “ছলং নম পরিশঠমর্থাভাসননর্থকং বাগ্বস্তুস্মাত্রমেব।” মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, দ্বিতীয় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৫২।

৭৩. ন্যায় সূত্র, ১.২.১০।

৭৪. “চদ্ দ্বিবিধা, বাক্ছল সামান্যচ্ছলঞ্চ।” মহর্ষি চরক, *চরসংহিতা*, দ্বিতীয় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৫২।

৭৫. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা*, পূর্বভাগ, জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, মতিলাল বনারসী দাস, বারাণসী, ২০১৮, পৃ. ৩৬৩।

৭৬. তদেব, পৃ. ৩৬৩।

৭৭. তদেব।

৭৮. তদেব।

৭৯. তদেব, পৃ. ৩৬৩।

৮০. তদেব।

৮১. তদেব, পৃ. ৩৬৪।

৮২. "ইত্যপালম্বপরিহাবেী জাতিশব্দেন সৌতমেনোক্তো।" মহষী চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকাসহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত, বারাণসী, চৌখাম্বা, ওরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১, পৃ. ১৬৪৫।

৮৩. "অথ প্রতিজ্ঞাহানি:, প্রতিজ্ঞাহানির্নাম সা পূর্ব্বপরিগৃহীতাং প্রতিজ্ঞাং পর্য্যনুযুক্তোযৎ পরিত্যজাত, যথা প্রাক্ প্রতিজ্ঞং কৃত্বা নিত্যঃ পুরুষ ইতি, পয্যনুযুক্তস্ত্বাহানিত্যইতি", মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি প্রণীত, আয়ুর্বেদ দীপিকাসহ, ইংরাজী অনুবাদ, আর. কে. শর্মা, ভগবান দাস, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০১৯, পৃ. ২৪৮।

৮৪. "অথাভ্যনুজ্ঞা অভ্যনুজ্ঞা নাম সা য ইষ্টানিষ্টা ভ্যুপগমঃ।" তদেব।

৮৫. তদেব।

৮৬. অথার্থান্তরম্। অর্থান্তরং নাম একস্মিন্ বক্তব্যেহধারং যদাহ যথা - জ্বরলক্ষণে বাচ্যে প্রমেহলক্ষণমাহ।" তদেব।

৮৭. ন্যায় দর্শনে নিগ্রহস্থান, রত্নাদত্ত শর্মা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৪৭

উপসংহার

এই আলোচনার ভিত্তিতে আমরা একথা বলতে পারি সামান্য, বিশেষ ইত্যাদি যে পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের আয়ুর্বেদের মূল উদ্দেশ্য রোগ পরীক্ষা, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্ব বাকী পদার্থগুলি সম্ভাষা বা বিচার বা আলোচনার পক্ষে প্রয়োজন। বিচার বা আলোচনাকে আয়ুর্বেদ বিষয়ক তত্ত্ব জ্ঞান লাভের উপায় বলে মহর্ষি চরক স্বীকার করেছেন। সুতরাং সামান্যাদি পদার্থ এবং তদভিন্ন অন্য যে সকল পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে আয়ুর্বেদে তাদের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য বর্তমান।

সামান্যাদি যে সকল পদার্থের কথা বলা হয়েছে তাদের লক্ষণ এবং বিভাগ আলোচনা পূর্বক আমরা দেখছি যে, এই সকল পদার্থের স্বরূপ বিষয়ে নানান দার্শনিক সম্পদায়ের মিল এবং অমিল রয়েছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সাথে মূলত আস্তিকদর্শনের মিল লক্ষ্য করি কিন্তু অমিলও দৃষ্টি এড়ানোর মত নয়। আয়র্বেদে সামান্যাদি যে সকল পদার্থের আলোচনা করা হয় সেক্ষেত্রে মূলত আয়ুর্বেদের উপযোগিতার কথা মাথায় রাখা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। অলে ডঃ অযোধ্যা প্রসাদ, *প্রারম্ভিক পদার্থ বিজ্ঞান,* বারাণসী : চৌখাম্বা ওরিয়ান্টালিয়া, ২০০৪।

২। *উপনিষদ গ্রন্থাবলী,* স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, কোলকাতা : উদ্বোধন কার্যলয়, খণ্ড-১-৩, ১৯৮৬।

৩। গৌড়, ডি. এস, এবং গুপ্তা এন, পি. (১৯৭০), *দ্যা থিয়োরি অফ পঞ্চমহাভূত উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু আয়ুর্বেদ,* ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ হিস্ট্রি অফ সায়েন্স, এন-I, মে, পৃ. ৫৬-৬৭।

৪। জৈস্বাল ডঃ রামনিহোর তপসী, *পদার্থ বিজ্ঞান এবং আয়ুর্বেদ ইতিহাস মৌলিক সিদ্ধান্ত,* বারাণসী : চৌখাম্বা ওলিয়েন্টালিয়া, ২০১৬।

৫। ত্রিপাঠী রবিদত্ত, *পদার্থ বিজ্ঞান,* দিল্লী : চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০১৭।

৬। দ্বিবেদী ডঃ বি. কে., দ্বিবেদী ড. লক্ষ্মী ধর (সম্পাদক), *পদার্থ বিজ্ঞান,* বারাণসী : চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস অকাদমী, ২০১৬।

৭। দে ডঃ হরনারায়ণ, আয়ুর্বেদীয় সরল পদার্থ বিজ্ঞান, বারাণসী : আকাঙ্খা পাবলিকেশার্স, ২০০৯।

৮। *প্রশস্ত পাদভাষ্যম্ ভাষ্যানুবাদ,* বিবৃত্তি *ন্যায়কন্দলী,* তদনুবাদ সাহিত্যম্, অনুবাদকারক দন্ডি স্বামী দামোদয়াশ্রম, প্রথম ভাগ, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১০।

৯। পাত্র অদিতি, "আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে স্বীকৃত কর্মবাদ ও কিছু সমস্যা।" ধর্মনীতি ও শ্রুতি, সম্পাদনায় ইন্দ্রানী সান্যাল ও রত্না দত্ত শর্মা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০৯।

১০। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *ন্যায় পরিচয়,* কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬।

১১। বাচস্পতি মিশ্র কৃত, *ন্যায় ব্যার্তিক তাৎপর্য টীকা,* অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, নিউদিল্লী : ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ ফিলোসফি রিসার্চ, ১৯৩৬।

১২। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বিরচিত, *ভাষা পরিচ্ছেদ,* পঞ্চানন ভট্টাচার্য কৃত মুক্তাবলী সংগ্রহ সম্বলিত এবং সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী টীকা সহ, বিবৃত অনূদিত ও সম্পাদিত, কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭০।

১৩। ভাঁদুড়ী ডালিয়া, *চরক সংহিতার দার্শনিক ভাবনা সমীক্ষা,* কলকাতা : দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১, পার্ক স্ট্রীট, ২০০৬।

১৪। মহর্ষি চরক বিরচিত, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণিদত্তের আয়ুর্বেদ দীপিকা ব্যাখ্যা সহ, আয়ুর্বেদাচার্য যাদবজী-ত্রিকজী আচার্য (সম্পাদক), তৃতীয় সংস্করণ, বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৪১।

১৫। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ টীকা, (অনুবাদক) রামকরণ শর্মা এবং ভগবান দাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৮৩।

১৬। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা ব্যাখ্যা সহ হিন্দি ব্যাখ্যা কাশীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত গঙ্গাসহায় পান্ডে এবং প্রিয়ব্রত শর্মা, প্রথম ভাগ, বারাণসী : চৌখাম্বা সিরিজ অফিস, ১৯৬৯।

১৭। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণি প্রদত্ত আয়ুর্বেদ টীকা এবং জোজ্জেট বিরচিত নিরন্তর পদ ব্যাখ্যা সহ, হরি দত্ত শাস্ত্রী সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বম্বে : মতিলাল বারাণসী দাস, ১৯৪৬।

১৮। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণি প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকা সহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও সংশোধিত (খণ্ড ১-৫), বারাণসী : চৌখাম্বা অরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১।

১৯। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* বঙ্গানুবাদ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ সম্পাদিত, (খণ্ড ১-৫), কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯১।

২০। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* (হিন্দি অনুবাদ ব্যাখ্যাকার) কাশীনাথ পান্ডে এবং গোরখনাথ চতুর্বেদী, রাজেশ্বর দত্ত শাস্ত্রী (সম্পাদক), বারাণসী : চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬১।

২১। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* আয়ুর্বেদাচার্য শ্রী জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, প্রথম খণ্ড, বানারসী : প্রকাশক মতিলাল বানারসী দাস, সংস্কৃত হিন্দু পুস্তক বিক্রেতা, নেপালী খপরা, ১৯৫৪।

২২। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা* আরিজিনাল কমেন্টারি সংস্কৃত, পন্ডিত যোগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, কলকাতা : জে. এন. সেন, ৩২, প্রসন্ন কুমার টেগর স্ট্রীট, ১৯২২।

২৩। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণি দত্তের আয়ুর্বেদ দীপিকা ব্যাখ্যা সহ আয়ুর্বেদাচার্য শ্রী হরিদত্ত শাস্ত্রী, ২য় ভাগ, লাহোর : সুন্দরলাল জৈন, মতিলাল বনারসী দাস, ১৯৪১।

২৪। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* আয়ুর্বেদ দীপিকা এবং জল্পকল্পতরু টীকা ব্যাখ্যা এবং কবিরাজ বলাই চন্দ্র সেনগুপ্ত, ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা : সি. কে. সেন এন্ড কোম্পানী লিমিটেড, ২৯ নং কলুটৌলা স্ট্রীট, ১৯৪৪।

২৫। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* (প্রথম ভাগ), হিন্দি ব্যাখ্যা, কাশীনাথ শাস্ত্রী এবং গোরখনাথ চতুর্বেদী, বারাণসী : চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯।

২৬। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* (প্রমথ খণ্ড), পণ্ডিত যোগীন্দ্রনাথ সেন, কলকাতা : জেন. এ. সেন ৩১, প্রসন্ন কুমার টেগর স্ট্রীট, ১৯১৯।

২৭। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত কর্তৃক আয়ুর্বেদ দীপিকা সহ, হরিনাথ সরকার সম্পাদিত, কলকাতা : ৩১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ১৯০০।

২৮। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* সম্পাদক এবং ব্যাখ্যাকার ড. লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, সহ ব্যাখ্যাকার ড. বি. কে. দ্বিবেদী এবং পি. কে. গোস্বামী, বারাণসী : চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস অকাদেমী, ২০১৬।

২৯। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* পূর্বভাগ, শ্রী জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, বারাণসী : মতিলাল বনারসী দাস, ২০১৮।

৩০। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* উত্তরভাগ, শ্রী জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, বারাণসী : মতিলাল বনারসী দাস, ২০১৮।

৩১। মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* Vol-I-V, ইংরাজী অনুবাদ, আর. কে. শর্মা, ভগবান দাস, বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ২০২০।

৩২। মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি কর্তৃক আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা সহ কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন সম্পাদিত, কলকাতা : কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, ২০০ সংখ্যক ভবন, ১৮৮৩।

৩৩। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* পণ্ডিত তারা দত্ত পন্ডেন, জয়কৃষ্ণ দাস হরিদাস গ্রুপ, বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত পুস্তাকালয়, ১৯৩৭।

৩৪। মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা ব্যাখ্যা সম্বলিত, কবিরাজ নরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত ও সংশোদিত, লাহোর : পাঞ্জাব সংস্কৃত পুস্তকালয়, ১৯২৩।

৩৫। মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য, *সুশ্রুত সংহিতা,* বৈদ্যাচার্য্য কালীকিঙ্কর সেন শর্মা, সত্যশেখর ভট্টাচার্য, কলকাতা : প্রকাশ দীপায়ন, ২০ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, ২০১৩।

৩৬। মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য, *সুশ্রুত সংহিতা,* অনুবাদক অত্রিদেব, বারাণসী : মতিলাল বনারসী দাস, ২০১৫।

৩৭। মল্লিক আশীষ কুমার, *আয়ুর্বেদ সিদ্ধান্ত দর্শন ও পদার্থ সূত্র,* কলকাতা : দীপায়ন, ২০০১।

৩৮। মহামতি শ্রীমন্মিশ্রভাব বিরচিত, *ভাবপ্রকাশ,* কবিরাজ শ্রীকাশীচন্দ্র সেনগুপ্ত, কবিরত্ন অনুদিত ও সংশোধিত, কলকাতা : দীপায়ন, ২০০২।

৩৯। মাধবাচার্যকৃত *সর্বদর্শন সংগ্রহ,* হিন্দি ব্যাখ্যা উমা শঙ্কর শর্মা, বারাণসী : চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬৪।

৪০। মিত্র ড. জ্যোতি (সম্পাদক), *আয়ুর্বেদীপযোগী পদার্থ বিজ্ঞান,* বারাণসী : চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস অকাদমী, ২০০৩।

৪১। মিশ্র বৈদ্যশিবকুমার এবং শর্মা বৈদ্য তারাচন্দ্র, আয়ুর্বেদীয় পদার্থ দর্শন, হরিয়ানা : নাথ পুস্তক ভাণ্ডার, রেলবে রোড, ১৯৯৪।

৪২। লারসন, জেমস, (১৯৮৭), *আয়ুর্বেদ অ্যান্ড দ্যা হিন্দু ফিলোজফি সিস্টেম,* ফিলোজফি ইস্ট এ্যান্ড ওয়েস্ট ৩৭(৩), পৃ. ২৪৫-২৫৯, হনুলুলু।

৪৩। শর্মা রত্না দত্ত, 'চরক সম্মত শব্দপ্রমাণ', ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব পরিক্রমা, সম্পাদনা রঞ্জনা মুখার্জী, সর্বানী বন্দ্যোপাধ্যায়, কুন্তলা ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৭১-২৮৫।

৪৪। শর্মা বৈদ্য তারাচন্দ্র, *আয়ুর্বেদীয় ষোড়শঙ্গ চিকিৎসা বিজ্ঞান,* প্রথম ভাগ, বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০১৭।

৪৫। শর্মা রত্না দত্ত, *ন্যায় দর্শনে নিগ্রহস্থান,* কলকাতা : চরকসংহিতায় স্বীকৃত নিগ্রহ স্থানের স্বরূপ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সহযোগ মহাবোধি বুক এজেন্সী, বঙ্গাব্দ ১৪১৭।

৪৬। শর্মা রত্নাদত্ত, "শ্রুতি ও ধর্মনীতি : চরক প্রস্তাবিত সদ্‌বৃত্তি অবলম্বনে একটি বিশ্লেষণ।" *ধর্মনীতি ও শ্রুতি,* সম্পাদনায় ইন্দ্রানী সান্যাল ও রত্নাদত্ত শর্মা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০৯।

৪৭। শর্মা ড: শশী, *আয়ুর্বেদে মূল সিদ্ধান্ত এবং চিকিৎসা,* দিল্লী : ইষ্টান বুক লিংকর্স, ২০১৭।

৪৮। শ্রীবাস্তব ড: শৌলজা, *পদার্থ বিজ্ঞান,* বারাণসী : চৌখাম্বা ওঁরিয়ন্টলিয়া, ২০১৬।

৪৯। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদার্ত চুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য, *সাংখ্যকারিকা,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯০১।

৫০। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র বিরচিত, *সাংখ্য তত্ত্ব কৌমুদী,* শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, কলিকাতা, ১৯৮২।

৫১। শ্রী কেশব মিশ্র বিরচিত *তর্কভাষা,* বঙ্গানুবাদ বিবৃতি সাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়চার্য, কলকাতা : সেন্টার অফ এডভান্সড্ স্টাডি ইন ফিলসফি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী, ২০০৯।

৫২। শ্রীমদন্নংভট্ট বিরচিত, *তর্কসংগ্রহ,* শ্রী নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, বঙ্গাব্দ ১৪১৩।

৫৩। শিবহরে ড: হীরালাল আর, *পদার্থ বিজ্ঞান,* বারাণসী : চৌখাম্বা সুখ ভারতী প্রকাশন, ২০১৮।

৫৪। শুক্লা ড: বিদ্যাধর, *পদার্থ বিজ্ঞান দর্পণ,* বারাণসী : চৌখাম্বা সুখভারতী প্রকাশন, ২০১৫।

৫৫। *সচিত্র আয়ুর্বেদ, এ জার্নাল অন আয়ুর্বেদ এন্ড হেলথ,* জুলাই ১৯৮৯, খণ্ড-৪২, প্রকাশক শ্রী বৈদ্যনাথ, আয়ুর্বেদ ভবন প্রাইভেট লিমিটেড, পাটনা।

৫৬। সাহা বিশ্বরূপ, *মীমাংসা পরিচয়,* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২।

৫৭। সেনগুপ্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ, সেনগুপ্ত কবিরাজ, উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (সংগৃহীত ও অনুদিত), *আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ,* (খণ্ড ১-৪), কলকাতা : দীপায়ন, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৩।

৫৮। *সুশ্রুত সংহিতা মে শরীর রচনা,* ডঃ দিবাকর গোবিন্দ পাণ্ডে, সহলেখক ডঃ আর. বি. শুক্লা, বারাণসী : চৌখাম্বা ঔরিয়ন্টালিয়া, ২০১১।

৫৯। A Collection of Essays on Applied Ethics, The Department of Philosophy, Sree Chaitanya College, June 2004.

৬০। Devi Dr. Gayatri, *Padarth Vijnan,* Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, Delhi, 110007, 2014.

৬১। Matilal Bimal Krishan, *Logic Language and Relaity,* Matilal Banarasidass Publishers Pvt. Ltd., Second Edition, Delhi, 1990.

৬২। 'Sabdapramana in Indian Philosophy', edited by Ghosh Manjulike Chakraborti Bhaswati Bhattacharya , N.B.U., studies in Philosophy-7, Northern Book Centre, New Delhi, 2006.

৬৩। Sharma Ratna Dutta, *Theory of Argumentation : Traditional and Modern,* Kolkata : Jadavpur University, Incollabration with Maha Bodhi Book Agencey, 2015.

৬৪। Sharma Ratna Dutta, "Dos and Don'ts for the persons involved in the Health Care Domin" *Refugees, Marriage, asuras and varied, vol-2, Maralits for the Ailing and others :* Edited by Indrani Sanyal, Ratna Dutta Sharma, Department of Philosopy, Jadavpur University, Kolkata-700032, 2021.